সেবা
প্রকাশনী

ভলিউম ৪৮

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-1462-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫
প্রথম প্রকাশ ২০০৪

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Volume-48
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

চুয়াল্লিশ টাকা

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ৪০ (অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর) ৪২/-
তি. গো. ভ. ৪১ (নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪২ (এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৪৩ (আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৪ (প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৪৫ (বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৬ (আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৭ (নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৮ (হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর) ৪৪/-
তি. গো. ভ. ৪৯ (মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫০ (কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫১ (পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫২ (উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৩ (মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৪ (গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫৫ (রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫৬ (হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৭ (ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫৮ (মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৯ (চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬০ (শুঁটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, শুঁটকি শত্রু) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬১ (চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬২ (যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর) ৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬৩ (ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৬৪ (মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৬৫ (বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৬ (পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৭ (ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহার আতঙ্ক) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৮ (টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+শুঁটকি গোয়েন্দা) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৯ (পাগলের গুপ্তধন+দুখী মানুষ+মমির আর্তনাদ) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৭০ (পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৭১ (পিশাচবাহিনী+রত্নের সন্ধানে+পিশাচের থাবা) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৭২ (ভিনদেশী রাজকুমার+সাপের বাসা+রবিনের ডায়েরি) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৭৩ (পৃথিবীর বাইরে+ট্রেইন ডাকাতি+ভুতুড়ে ঘড়ি) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৭৪ (কাওয়াই দ্বীপের মুখোশ+মহাকাশের কিশোর+ব্রাউন্সভিলে গণ্ডগোল) ৪৪/-
তি. গো. ভ. ৭৫ (কালো ডাক+সিংহ নিরুদ্দেশ+ফ্যান্টাসিল্যান্ড) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৭৬ (মৃত্যুর মুখে তিন গোয়েন্দা+পোড়াবাড়ির রহস্য+লিলিপুট-রহস্য) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৭৭ (চ্যাম্পিয়ান গোয়েন্দা+ছায়াসঙ্গী+পাতাল ঘরে তিন গোয়েন্দা) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ৭৮ (চট্টগ্রামে তিন গোয়েন্দা+সিলেটে তিন গোয়েন্দা+মায়াশহর) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৭৯ (লুকানো সোনা+পিশাচের ঘাঁটি+তুষার মানব) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৮০ (মুখোশ পরা মানুষ+অদৃশ্য রশ্মি+গোপন ডায়েরি) ৪৩/-

হারানো জাহাজ

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

এক

'মুসা, নৌকার দড়ি খোলো। আমি ঠেলে নামিয়ে দেব। জিনা, রবিন, তোমরা আরেকবার দেখো জিনিসপত্র কিছু বাদ রয়ে গেল কিনা। রাফি, থামবি! লেজে কি হয়েছে। ওটার পেছনে লেগেছিস কেন?'

'ইয়েস, স্যার!' হেসে খটাস করে স্যালুট ঠুকল মুসা।

'আই, আই, ক্যাপ্টেন!' অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে জিনা বলল।

'যাচ্ছি, বাবা,' পায়ের কাছে পড়ে থাকা প্যাকেটগুলো তৃতীয় বারের মত দেখতে শুরু করল রবিন।

'ঘাউ!' করে ডাক ছেড়ে লেজের মাথায় বসা মাছিটাকে কামড়ানোর শেষ চেষ্টা করে বসে পড়ল রাফিয়ান।

ভুরু কোঁচকাল কিশোর। সঙ্গীদের এহেন আচরণ ভাল লাগল না। আদেশ দেয়ার বাতিক আছে তার ঠিক, কিন্তু তাই বলে ভুল কথা বলেছে কি? এত হাসির কি হলো? অন্য সময় হলে রেগে উঠত, এখন চেপে গেল। এ রকম একটা শুভক্ষণে ঝগড়াঝাঁটি করাটা উচিত হবে না। তার মনেও এখন ওদের মত বেজায় সুখ। গোবেল বীচে জিনাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে।

পরীক্ষা শেষ। লম্বা ছুটি। কাজেই কোন রকম দ্বিধা না করে ছুটি কাটাতে চলে এসেছে ওরা।

সাগরের পারে সুন্দর একটা গ্রাম গোবেল বীচ। কাছাকাছি অনেক দ্বীপ আছে। ও রকমই একটা দ্বীপে পিকনিক করতে চলেছে ওরা। জিনারাই দ্বীপটার মালিক। নাম গোবেল আইল্যান্ড।

ওখানে ক্যাম্প করবে খুদে গোয়েন্দারা। কয়েকটা দিন রবিনসন ক্রুসো হয়ে মহাসুখে কাটিয়ে দেয়ার ইচ্ছে। চমৎকার একটা অ্যাডভেঞ্চারও হয়ে যাবে।

সাগরের পারেই জিনাদের বাড়ি। সুন্দর বাগানটা নেমে গেছে একেবারে সৈকতের কিনারে। আরেকটু নিচে ছোট্ট একটা খাঁড়িমত জায়গায় বাঁধা রয়েছে জিনার নৌকাটা। ওটা তার জন্মদিনের উপহার, আম্মা দিয়েছেন–তিন গোয়েন্দার কেরি আন্টি।

'সাগরে যেতে তৈরি, ক্যাপ'এন!' টেলিভিশনে দেখা জাহাজীদের সংলাপ নকল করে ঘোষণা করল মুসা। 'আর একটু।' ইচ্ছে করে দড়ি

খুলতে দেরি করেছে সে। কিশোরকে রাগানোর জন্যে।

'আহ্হা, এত দেরি করাচ্ছ কেন ক্যাপ্টেন কিশোরকে,' মুখ টিপে হেসে বলল জিনা। 'জলদি খোলো, জলদি খোলো!'

'সবই নিয়েছি, ক্যাপ্টেন। কিছু বাকি নেই,' শান্তকণ্ঠে বলল রবিন। জিনিসপত্রের তালিকাটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল।

হাসতে লাগল কিশোর।

'বুঝতে পারছি, আমাকে নিয়ে মজা করা হচ্ছে,' বলল সে। 'মাফ করে দিলাম এখন, যাও। অযথা ঝগড়া করে আনন্দ নষ্ট করতে চাই না। তবে যত যা-ই বলো, সত্যিকারের একটা সাগরভ্রমণে যাচ্ছি বলেই মনে হচ্ছে। এসো, ধাক্কা লাগাও। ভেসে পড়ি সাগরে।'

এটাও টেলিভিশনে দেখা সিনেমার সংলাপের নকল। একটা জলদস্যু জাহাজের ক্যাপ্টেনের অনুকরণ করছে কিশোর।

'আরে রাখো রাখো,' বাধা দিল জিনা। 'আগে মালপত্র জাহাজে তুলতে দাও। দূর সাগরে গিয়ে নইলে খাব কি?'

লাল হয়ে গেল কিশোরের গাল। দূর, আজ হচ্ছে কি! ভুলভাল করে ফেলছে সব কিছু, কথা বলে লোক হাসাচ্ছে। উত্তেজনা, বুঝতে পারল সে। নৌকা নিয়ে সাগরে বেরোনোর উত্তেজনায় এ রকম করছে।

ঠেলে নৌকাটাকে নামানো হলো। উঠে বসল সবাই। দাঁড় তুলে নিয়ে ঝপাৎ করে পানিতে ফেলল মুসা আর জিনা। বেয়ে চলল দ্বীপের দিকে।

গোবেল আইল্যান্ড বেশি বড় না। হাজার হাজার বছর আগে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গেই যুক্ত ছিল, বাবার মুখে এর ইতিহাস শুনেছে জিনা। তারপর ভৌগোলিক কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, ঘিরে ফেলেছে পানিতে। হয়ে গেছে দ্বীপ প্রায়ই ওখানে যায় জিনা। তার মতে, এত সুন্দর দ্বীপ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। যেমন সুন্দর, তেমনি রহস্যময়। একটা দ্বীপে যা যা আশা করা যায়, সবই রয়েছে এটাতে। ছোট্ট একটা খাঁড়ি আছে, এমন জায়গায়, ঝড়ো হাওয়া বইলেও যেখানে তার ঝাপটা লাগে না। ওটাকে প্রাকৃতিক বন্দর হিসেবে ব্যবহার করে জেলেরা, তবে বিশেষ দায়ে না পড়লে ওখানটাতে বড় একটা আসে না কেউ। সাদা বালির সৈকত আছে দ্বীপে, মিষ্টি পানির ঝর্না আছে, প্রচুর ঘাস আছে, বড় বড় গাছ আছে, ভাঙা একটা পোড়া দুর্গও আছে। ওটার দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে এখনও। সাগরের ওপরে টাওয়ারের মত মাথা উঁচু করে।

দাঁড় বাইতে বাইতে এ সব গল্প আরেকবার শোনাল জিনা, এর আগেও অন্তত দশবার শুনিয়েছে যদিও। শোনাতে ভাল লাগে তার। এই দ্বীপ যেন তার অতি আপন, একেবারে নিজের মনে করে। এখানে এলে মনে হয় একেবারে অন্য জগতে চলে এসেছে, দুনিয়া থেকে আলাদা।

'সাবধান, জিনা পানিতে পড়ে যাবে কিন্তু।' হাসতে হাসতে বলল মুসা। 'যেভাবে স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছ, সবাইকেই ফেলবে দেখছি। সোজা করো সোজা করো, নৌকার মুখ সোজা করো।'

চোখের কোণ দিয়ে মুসার দিকে তাকাল জিনা। লজ্জা পেয়েছে। 'দাঁড়াও, ঠিক করছি।'

কাছে চলে এল দ্বীপ। খুব ভাল দাঁড় বায় জিনা, নৌকা চালানোর ওস্তাদ। কোন দিক দিয়ে খাঁড়িতে ঢুকতে হয় দেখাল সবাইকে। ছোট একটা প্রণালীমত রয়েছে। দক্ষ হাতে দাঁড়ের কয়েকটা টান মেরে নৌকার মুখ ঢুকিয়ে দিল প্রণালীতে। খানিকটা ঢুকে ঘ্যাঁচ করে নৌকার তলা লাগল নরম বালিতে। আর এগোবে না। হই-চই করতে করতে পানিতে নামল ছেলে-মেয়েরা। নৌকাটাকে টেনে তুলল আরেকটু। পাথরের গায়ে বসানো একটা লোহার আংটায় দড়ি বাঁধল নৌকার।

বালিতে নেমে পড়েছে রাফিও। মনের সুখে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল, 'ঘাউ ঘাউ! ঘাউ ঘাউ!'

'মালপত্রগুলো তাড়াতাড়ি নামিয়ে ফেলা দরকার,' আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল জিনা। 'তারপর ডাঙায় তুলে রাখতে হবে নৌকাটা। আবহাওয়ার মতিগতি এখানে বোঝার উপায় নেই। এই ভাল তো এই খারাপ। ঝড় এলে বড় বড় ঢেউ উঠবে। পানিতে থাকলে পাথরের সঙ্গে বাড়ি মেরে ছাতু করে দেবে নৌকাটাকে।'

আবহাওয়া এখন খুব ভাল। 'মুসা, তাঁবুগুলো নাও। জিনা, তাঁবুর খুঁটি নাও যে ক'টা পারো। আমি ম্যাট্রেসগুলো নিচ্ছি। রবিন, হাঁড়িপাতিল আর বাসনকোসন নাও। থাকলে পরে আবার এসে নেয়া যাবে।'

'আসতে হবে এমনিতেও,' মুসা বলল। 'স্টোভটা রয়েছে। অন্যান্য জিনিস তো বাকিই। এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই, জিনা। আস্তে আস্তে নাও।'

ছোট পাহাড় বেয়ে খাঁড়ি থেকে উঠে গেছে পথ। সাগরের দিকে ফেরানো। বেশ খাড়া। কিন্তু ওদের বয়েস কম, অফুরন্ত ক্ষমতা, মাল নিয়ে খাড়া পথ বেয়ে উঠতেও তেমন কষ্ট হলো না। আর রাফির তো কথাই নেই। চার পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে চলল, বিন্দুমাত্র জড়তা নেই। ওদের চেয়ে তার সুবিধেটাও অবশ্য বেশি, দুটোর জায়গায় চারটে পা রয়েছে, তা ছাড়া কিছু বইতেও হচ্ছে না।

উত্তেজনায় একনাগাড়ে বকবক করে চলেছে জিনা। এখানে এলেই মনটা অন্য রকম হয়ে যায় তার। জায়গাটাকে ভীষণ ভালবাসে বলেই। যত খুশি চেঁচামেচি করা যায়, গলা ছেড়ে গান গাওয়া যায়, কাউকে বিরক্ত করার ভয় নেই। তার বাবার বকা শোনার আশঙ্কা নেই। খুব ব্যস্ত বিজ্ঞানী প্রফেসর পারকার। নিরিবিলিতে কাজ করতে পছন্দ করেন। হৈ-হট্টগোলে কাজের অসুবিধে হয়। সেটা বোঝে জিনা।

'বুঝলে,' বলল সে, 'আমাদের মত ছোটদের জন্যে একেবারে ঠিক জায়গা এই গোবেল আইল্যান্ড। মানুষ থাকে না। বকা আর উপদেশ দেয়ার জন্যে সারাক্ষণ মুখিয়ে থাকে না বড়রা।'

পুরানো দুর্গটার কাছে এক টুকরো ঘাসে ছাওয়া জমি। সেখানেই ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। জিনিসপত্রগুলো সেখানে এনে নামিয়ে রেখে তাঁবু

খাটানোয় মন দিল। দুটো তাঁবু খাটাতে হবে। একটা ছেলেদের জন্যে অন্যটা মেয়েদের। আরও একটা ছোট তাঁবু লাগবে, নিয়ে এসেছে সাথে করে, খাবার আর স্টোভটা রাখবে সেখানে। খোলা জায়গায় খাবার রাখলে পোকা-মাকড়ে নষ্ট করতে পারে।

তাঁবু খাটানো শেষ করে আবার খাঁড়িতে ফিরে এল কিশোর। নৌকাটাকে ওপরে তুলে রাখতে। ঝর্না থেকে পানি আনতে গেল মুসা আর জিনা। রবিন বসল রান্না করতে। হাঁড়িপাতিল আর চুলা নিয়ে ব্যস্ত রইল সে, অন্য তিনজন যার যার কাজ শেষ করে বেরোল দ্বীপটা ঘুরে দেখতে। রাফিও চলল সঙ্গে।

আগের বছর এই সময়ে এসেছিল জিনা। তেমনি রয়েছে জায়গাটা, কিছুই বদলায়নি। কিছু ভাঙা ডাল পড়ে থাকতে দেখে অনুমান করল, শীতকালে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। গাছপালার অনেক ক্ষতি হয়েছে, তবে দুর্গের দেয়ালগুলো ঠিক তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা পাথরও খোয়া যায়নি।

অনেকক্ষণ ঘুরে ফিরে এক সময় পেটে হাত দিয়ে মুসা বলল, 'আর পারি না। খিদে পেয়ে গেছে। চলো, বাড়ি চলো।'

'ঘাউ' করে তার ভাষায় যেন 'ঠিক' বলল রাফি। লেজ দোলাতে লাগল ঘন ঘন।

'খিদে আমারও পেয়েছে,' জিনা বলল।

কিশোর কিছু বলল না। সবার পেছনে পা টেনে টেনে হাঁটছে। তাকিয়ে রয়েছে দিগন্তের দিকে। সাগর ভালবাসে সে, তবে তার চেয়ে বেশি ভালবাসে অ্যাডভেঞ্চার আর রহস্য।

বলেই ফেলল বিড়বিড় করে, 'ইস, যা জায়গা। একটা রহস্য যদি পেয়ে যেতাম এখানে। সাগরের সঙ্গে জড়িত...'

'ভাগ্য ভাল হলে পেয়েও যেতে পারো,' হেসে বলল মুসা, 'সাগরের পানিতে ভেসে ভেসে আসবে রহস্যটা। ডেকে বলবে, ও কিশোর গোয়েন্দা, আমি এসেছি। ধরে তোলো আমাকে। সমাধান করো।'

'দেখো মুসা, টিটকারি মেরো না! ভাল হবে না।'

'হয়েছে হয়েছে, ঝগড়া কোরো না তো আর,' বাধা দিয়ে বলল জিনা। 'মুসা যা বলল সেটা ঠিক হয়েও যেতে পারে। এখানে সবই সম্ভব।'

'মানে?'

'মানে, এখানে অনেক সময় অনেক রহস্যময় ব্যাপার ঘটেছে। কোনটার সমাধান হয়েছে, কোনটার হয়নি। জেলেরা অনেক গল্প বলে আশপাশের সাগর সম্পর্কে। ভেসে ভেসে সত্যিই কোন রহস্য এসে হাজির হয়ে যেতে পারে, কিছুই বলা যায় না।'

দুই

পাঁচটা দিন বেশ আরামেই কাটাল ওরা গোবেল আইল্যান্ডে। চমৎকার আবহাওয়া। সত্যি, দারুণ আনন্দে কাটছে চারটে ছেলেমেয়ে এবং একটা কুকুরের দিন।

সকালে উঠে পেট পুরে নাস্তা খায়। প্রচুর ডিম, গরুর মাংস ভাজা, আর মাখন মাখানো পাঁউরুটি দিয়ে। তারপর সাঁতার কাটতে যায় সাগরে। কখনও পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কখনও ঝিনুক কুড়ায়। পানির ধার দিয়ে ছুটাছুটি করে নানা রকম খেলা খেলে। যত খুশি হুল্লোড় করে। খিদে পেলেই খেতে বসে। বাধা দেয়ার, নিয়ম করে দেয়ার কেউ নেই। বিকেলে নৌকা নিয়ে বেরোয়, কিংবা আবার সাঁতার কাটে, অথবা অলস ভঙ্গিতে চিত হয়ে থাকে বালিতে। সন্ধ্যায় ফিরে এসে ক্যাম্পে আগুনের কুণ্ড জ্বালে। মাউথ অরগান বাজায় মুসা, গান গায় জিনা, গিটার বাজায় কিশোর। যখন গান বাজনা আর ভাল লাগে না, গল্প শোনাতে বসে রবিন। অনেক বই পড়া আছে তার। নানা রকম গল্প শুনিয়ে মুগ্ধ করে দেয় শ্রোতাদের।

মজা আরও আছে। লুকোচুরি খেলার প্রচুর জায়গা এখানে, সময়ের হিসেব না করে খেলতে থাকে ওরা। লুডু খেলে, নানা রকম ধাঁধার খেলা খেলে। যতটা সম্ভব আনন্দে সময় কাটানোর চেষ্টা করে। খাবার-দাবার ফুরিয়ে এলে নৌকা নিয়ে চলে আসে গোবেল বীচে, জিনাদের বাড়িতে। কিংবা বাজারে চলে যায় সাইকেলে চেপে। জিনার দুটো নতুন সাইকেল আছে। আরও দুটো সাইকেল ভাড়া নিতে কোন অসুবিধে হয় না।

হাটের দিন বাজারে ঘুরতে খুব ভাল লাগে ওদের। দোকানপাটগুলো জমজমাট হয়ে ওঠে সেদিন, লোক গমগম করে।

চোখের পলকে যেন উড়ে চলে গেল পাঁচটা দিন। ছয় দিনের দিন ঘটল নতুন ঘটনা।

'আরে দেখো দেখো!' সেদিন সকালে তাঁবু থেকে বেরিয়েই চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'আকাশের অবস্থা দেখো! এক রকম নেই আর!'

ঝর্না থেকে হাতমুখ ধুয়ে ফিরে আসছে জিনা। কিশোরের সঙ্গে একমত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। পশ্চিমের ওই কালো মেঘ দেখেছ? সূর্যের রঙও ভাল না, বেশি লাল।'

'রেড স্কাই ইন দা মরনিং, শেফার্ড'স ওয়ারনিং!' ছড়া কাটল রবিন। অর্থাৎ, মেষপালক হুঁশিয়ার করছে, সকালের লাল আকাশ ভাল লক্ষণ নয়।

'একদম খাঁটি কথা,' জিনা বলল। 'বাতাসও যে হারে বাড়ছে, বিকেলের দিকেই চমৎকার একখান ঝড় আসবে।'

গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'ঝড় কখনও চমৎকার হয় না! পোঁটলাপাটলি বেঁধে

চলো বাড়ি চলে যাই। বারবার করে সাবধান করে দিয়েছে কেরি আন্টি আর পারকার আঙ্কেল, মনে নেই? আবহাওয়া খারাপ দেখলেই যেন বাড়ি ফিরে যাই।'

'ওরা তো বলবেই, বড় মানুষ যে। ছোটরা কিছু করতে গেলেই আঁতকে ওঠে, কি যে ভাবে!'

দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে নেই জিনার। 'এখনই যাওয়ার এত তাড়া নেই। রোদ আছে। বৃষ্টি শুরু না হলে আর ঠাণ্ডা না পড়লে কিছু হবে না। যখন পড়ে তখন ভাবব। বাড়ি তো আর বেশি দূরে না, কি বলিস, রাফি?' কুকুরটাকেই সাক্ষী মানল সে।

'ঘাউ!' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল রাফি, লেজ নাড়ছে।

ঝড়ের সময় গোবেল বীচ কটেজে আটকে থাকার চেয়ে গোবেল আইল্যান্ডে থাকাটা অনেক বেশি পছন্দ জিনার। আব্বা ঘরের মধ্যে সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত, টুঁ শব্দ করার জো থাকবে না ওদের। হুমকি-ধামকি শুরু হয়ে যাবে। আব্বাকে দারুণ ভালবাসে সে, কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় বিজ্ঞানীর মেয়ে না হয়ে সাধারণ জেলের মেয়ে হলেও অনেক আরামে থাকা যেত।

'জিনা ঠিকই বলেছে,' তার পক্ষ নিল কিশোর। 'রোদ যতক্ষণ আছে, খেলা যাক। পানির নিচে সাঁতরে ছোঁয়ার খেলা খেললে কেমন হয়? যে জিতবে, সবচেয়ে ভাল ঝিনুকগুলো তার, যেগুলো কুড়িয়ে পেয়েছি আমরা।'

জিনা তো একপায়ে খাড়া। রবিনও না করল না। একটু চুপ করে থেকে মুসাও শেষে মেনে নিল প্রস্তাবটা।

সকাল শেষ হয়ে আসছে তখন। পানিতে নেমে অনেক দাপাদাপি করেছে ওরা। এতক্ষণে লক্ষ করল কালো মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে সূর্য। পানি থেকে ওঠারও সময় পেল না, ফাঁক হয়ে গেল যেন আকাশ, মুষলধারে নামল বৃষ্টি।

ছুটতে ছুটতে ক্যাম্পে ফিরল ওরা।

'জলদি!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। 'তাঁবুটাবু সব দুর্গের ভেতরে নিয়ে যেতে হবে। এখানে থাকা যাবে না।'

'আমার দোষ!' আকাশের অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেছে জিনা। বুঝতে পারছে ভীষণ ঝড় হবে। 'ফিরে যাওয়াই উচিত ছিল। আর সম্ভব না।'

'ওসব কথা বলে এখন লাভ নেই,' উপকূলের দিকে হাত তুলল মুসা। 'দেখো কাণ্ড! ওখানে যে মাটি আছে বোঝাই যায় না।'

আরও বাড়ল বৃষ্টির বেগ। গর্জন করে বয়ে যাচ্ছে বাতাস। ছোট তাঁবুগুলো উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে অনবরত। যত তাড়াতাড়ি পারছে জিনিসপত্র ব্যাগের মধ্যে ভরছে রবিন। অন্য তিনজন শক্ত ক্যানভাসের তাঁবুগুলো গোটাতে ব্যস্ত। বৃষ্টি, তার ওপর এই বাতাস, কাজটা কঠিন করে তুলেছে ওদের জন্যে। বারবার এসে পায়ে বাড়ি মারছে, জড়িয়ে যাচ্ছে তাঁবুর কানা।

'ভাগ্যিস বেদিং সুটগুলোই পরা আছে,' কিশোর বলল। 'মনে হচ্ছে

সাগর থেকে উঠে এসে শাওয়ার নিচ্ছি। ভালই হলো, লবণ ধুয়ে গেল। এই রাফি, ভেতরে যা, ভেতরে যা। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে অসুখ করবে।'

বৃষ্টি ভাল লাগে না রাফির। ভেতরে যাওয়ার জন্যে তৈরিই হয়ে ছিল সে, এই নির্দেশের পর আর একটা মুহূর্ত দেরি করল না। ঘেউ ঘেউ করে বার দুই হাঁক ছেড়ে, যেন ওদেরকে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে ভেতরে আসার অনুরোধ জানিয়ে, দৌড় দিল দুর্গের দিকে। কয়েকটা ঘরের ওপর এখনও ছাত রয়েছে। তারই একটাতে ঢুকে পড়ল সে।

'বাপরে বাপ, কী ঠাণ্ডা!' কাঁপুনি উঠে গেছে মুসার। 'জমে গেলাম! আগুন জ্বালানো যায় না?'

'যাবে না কেন? বলেছিলাম না, লাকড়ি দরকার হতে পারে?' জিনা বলল। 'এখন তো বুঝলে? এখানকার আবহাওয়া আমার চেনা।'

এ রকম বিপদের আশঙ্কা করেই শুকনো লাকড়ি জোগাড় করে দুর্গের ভেতর জমিয়ে রেখেছিল ওরা, অবশ্যই জিনার পরামর্শে। এখন সেগুলো কাজে লাগল। বাইরে যে সব লাকড়ি আছে, ভিজে গেছে।

গা-মাথা মুছে আগুনের সামনে বসে আগে শরীর শুকিয়ে নিল ওরা। ব্যাগ থেকে বের করে ভারী পশমী পুলওভার পরল। গনগন করে জ্বলছে আগুন। টিন থেকে মাংস বের করল রবিন। মসলা মাখানোই আছে, শুধু ঝলসে নিলেই কাবাব তৈরি হয়ে যায়। কাবাব, রুটি আর টমেটোর সস দিয়ে খাওয়া শেষ করার পর আর কোন কাজ থাকল না, বসে বসে ঝড় দেখা ছাড়া। তবে এই দেখার মধ্যেও একটা মজা আছে।

এত ভয়াবহ ঝড় খুব কমই দেখেছে ওরা। যে ঘরটায় বসেছে সেটা সাগরের দিকে ফেরানো। চত্বরের পরেই পানিতে খাড়া নেমে গেছে পাহাড়ের দেয়াল। দরজায় বসলেই স্পষ্ট দেখা যায় এখান থেকে সাগর আর আকাশ। এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে ওরা। কালো মেঘের মধ্যে গুমগুম করছে বজ্র। মেঘের মতই কুচকুচে কালো সাগরের রঙ, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে চেহারা। প্রকাণ্ড সব ঢেউ এসে আছড়ে ভাঙছে পাহাড়ের গায়ে। যেন দ্বীপসহ সবাইকে গিলে ফেলার পাঁয়তারা করছে সাগর।

'আমার ভয় করছে!' গলা কাঁপছে রবিনের। এ রকম পরিস্থিতিতে আর কখনও পড়েনি, ভাল লাগছে না এ সব তার। 'এত ঢেউ, এত বিদ্যুৎ!'

'ভয় লাগলে চোখ বুজে থাকো,' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল কিশোর। 'ভাল করেই জানো, এখানে কোন বিপদ নেই।'

'ওকে আর বলে কি হবে,' মুসা বলল। 'আমারও তো ভয় করছে। নৌকাটা এখন ঠিকঠাক পেলেই হয়। নাহলে সত্যি সত্যি জাহাজডুবি হয়ে একেবারে রবিনসন ক্রুসো। এই কিশোর, নৌকাটা আছে তো? নাকি ঢেউয়ে নিয়ে গেল?'

'থাকার তো কথা,' কিশোর বলল। 'ঝড় আসতে দেখে আরও ওপরে তুলেছিলাম। তারপুলিন দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। থাকবে, ভালই থাকবে।'

'কিন্তু কেরি আন্টি আর পারকার আঙ্কেল খুব ভাববেন,' রবিন বলল।

'না, ভাববে না,' জিনা বলল। 'ওরা জানে, দ্বীপটা আমি চিনি। ঝড় এলে মাথা গোঁজার অনেক জায়গা আছে এখানে। আব্বা-আম্মার চেয়ে দেখি তোমাদের ভাবনাটাই বেশি।'

যতই সময় যাচ্ছে বেড়েই চলেছে ঝড়, আরও, আরও। বিকেলেও থামল না। এমনকি সারাটা রাত ধরে একটানা কানে এল বাতাসের শোঁ শোঁ আর সাগরের হুঙ্কার। মেঝেতে ক্যানভাস পেতে স্লীপিং ব্যাগ রেখে তাতে ঢুকেছে ওরা। শীত লাগছে না আর। আরামেই শুয়েছে।

হঠাৎ প্রচণ্ড এক শব্দে চমকে উঠল সবাই। কিছুটা কমেছিল ঢেউ, আবার দ্বিগুণ জোরে দেয়ালে আঘাত হানতে শুরু করল। মনে হচ্ছে আর টিকবে না দুর্গ, এবার ভেঙে পড়বে সাগরে। তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে বেরিয়ে পড়ল ওরা। ঘেউ ঘেউ শুরু করল রাফি। বাইরে ঢেউয়ের শব্দকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে আরেকটা আওয়াজ, কিছু ভেঙে পড়ার মত।

'হচ্ছেটা কি!' ফিসফিসিয়ে বলল রবিন। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। কিশোরের গা ঘেঁষে এল। অজানা বিপদের কবল থেকে রক্ষা পেতে চাইছে যেন কাছাকাছি থেকে। 'দেয়াল-টেয়াল ভাঙছে না তো!'

'আরে নাহ্!' অভয় দিল কিশোর। 'এখানে নিরাপদেই থাকব আমরা। অত ওপরে ঢেউ উঠবে না।'

'বাইরে কিছু একটা হচ্ছে,' জিনা বলল। শুধু ঢেউয়ের শব্দ এ রকম না। উঠে দরজার কাছে এগিয়ে গেল সে। কিছু চোখে পড়ল না। 'আমি ওদিকে যাচ্ছি।'

'দাঁড়াও, আমিও আসছি,' উঠে দাঁড়াল মুসাও।

চত্বরের একধারে খিলান, অর্ধেক ভেঙে পড়েছে কোন্‌কালে, বাকিটা এখনও দাঁড়িয়ে। ভিজে ভিজেই তার নিচে চলে এল দুজনে। গলা বাড়িয়ে চোখ বড় করে দেখার চেষ্টা করল। নিচের দিকে দৃষ্টি পড়তেই আঁতকে উঠল জিনা। বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পেল, ওদের পায়ের নিচে পাহাড়ের দেয়ালের অনেকখানি ধসে পড়েছে। সেখানে ক্রমাগত আঘাত হেনে চলেছে ঢেউ, তাতেই হচ্ছে বিচিত্র শব্দটা। মাটি ধসে পড়ায় একটা খোঁড়ল মত হয়ে গেছে। সেখানে বাতাস বাড়ি খেয়ে আরেক ধরনের শব্দ তৈরি করছে।

'সর্বনাশ!' মুসা বলল, 'ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি! গুঁড়িয়ে দেবে দ্বীপটাকে!'

ভূমিকম্প নয়, তবে লাগছে ওরকমই। ভীষণ জোরে এসে দেয়ালে আঘাত হানছে ঢেউ, থরথর করে কেঁপে উঠছে পাহাড়।

'পাহাড়ের চেয়ে তো দুর্গটাই শক্ত মনে হচ্ছে,' মুসা বলল। 'মাটি কাঁপছে, অথচ একটা পাথরও খুলে পড়ছে না! বানিয়েছিল বটে! দেখো দেখো, ঢেউয়ের অবস্থা দেখো!'

আসলেই দেখার মত দৃশ্য। বিশাল ঢেউগুলো গড়িয়ে আসার সময় একটার সাথে আরেকটা বাড়ি লেগে ভাঙছে। আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের গায়ে। কামানের গোলার মত বুম্‌ম্‌ম্ করে পানি ছিটকে উঠছে অনেক ওপরে। তারপর ফেটে গিয়ে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে ফোয়ারার মত।

বেশ কিছুক্ষণ চলল এ রকম। তারপর হঠাৎ করেই যেমন বেড়ে গিয়েছিল ঝড়, তেমনি কমে গেল। শান্ত হয়ে আসছে ঢেউ, বাতাস পড়ে যাচ্ছে।

আবার ব্যাগের মধ্যে ঢুকল ছেলেমেয়েরা। কিন্তু ঘুম আর আসতে চাইছে না। এমনকি রাফিরও না। কান পেতে শুনছে সবাই। মরার আগে বেশ কিছুক্ষণ শোঁ-শোঁ করল ঝড়। ভোরের আগে একেবারে থেমে গেল। তখন ঘুমাল ছেলেমেয়েরা।

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল, আগের দিনের ঝড়টা তখন শুধুই স্মৃতি। প্রথমে ঘর থেকে বেরোল রবিন। আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'এই দেখে যাও, দেখে যাও, আকাশটা কি নীল! মনে হচ্ছে ধুয়ে দেয়া হয়েছে। ঝকঝকে রোদ।'

বেরিয়ে এল অন্যেরা।

জিনা প্রস্তাব রাখল, 'চলো, বাড়ি যাই। আম্মা-আব্বাকে বলব, ভালই আছি। তারপর জিনিসপত্র নিয়ে...'

'ফিরে আসব আবার,' কথাটা শেষ করে দিল কিশোর। 'আবার তাঁবু খাটাব। তা করা যাবে। আগে এসো দ্বীপটা ঘুরে দেখি, কতটা ক্ষতি করল ঝড়ে।'

দেখতে বেশি সময় লাগল না। দুটো গাছ উপড়ে পড়েছে। বেশ কিছু ডাল ভেঙেছে। কিন্তু এতবড় ঝড়ে যতটা ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা করেছিল তার চেয়ে অনেক কম ক্ষতি হয়েছে। সাগরের দিকের পাহাড়ের দেয়ালটারই ক্ষতি হয়েছে বেশি।

ওটার ওপরে এসে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে নিচে দেখার চেষ্টা করল জিনা, কতটা ভেঙেছে।

সাবধান করল কিশোর, 'এই, বেশি কিনারে যেও না। পা পিছলালে শেষ!'

'কিশোর, একটা জিনিস দেখলাম। বুঝতে পারছি না ওটা কি,' জিনা বলল। 'ওই যে, নিচে, ওখানে।'

'কোথায়?' এগিয়ে এসে গলা বাড়াল মুসা।

কয়েকটা পাথর সরে গেল তার পায়ের ঠোকর লেগে। ওরকম আলগা পাথরে পা রাখলে সে-ও পড়বে। খপ করে তার হাত চেপে ধরল কিশোর। টেনে সরিয়ে আনল। জিনাকেও সরাল। বলল, 'এত কিনারে যাচ্ছ! মরবে তো।'

'কিশোর,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল জিনা, 'সত্যিই আমি কিছু দেখেছি! অদ্ভুত!'

'কী?'

'কালো লম্বা একটা কিছু। নড়ছে না, চুপ করে পড়ে আছে। ওই পাথরের টিলাটার কাছে। কোথায় বুঝতে পারছ তো? যেখানে পানি শান্ত থাকে, আর খুব গভীর।'

'কি বলছ তাই তো বুঝতে পারছি না,' মুসার গলায় অবিশ্বাসের সুর। 'পানি ওখানে বেশি, জানি। তলায় কিছু থেকে থাকলে দেখার কথা নয়।'

'কথাই তো সেটা! অবাক তো সে-জন্যেই হয়েছি। কালো জিনিসটাকে জাহাজের মত লাগল। ডুবে যাওয়া জাহাজ।'

তিন

'ভুল করছ না তো?' কিশোর মনে প্রাণে চাইছে জিনার ভুল না হোক। রহস্যের গন্ধ পেয়ে গেছে সে। এ রকমই একটা কিছু চাইছিল। সাগর থেকে আসা রহস্য।

'না, মোটেও না!' জোর দিয়ে বলল জিনা। 'ওটা জাহাজই। ডুবে যাওয়া জাহাজ এই এলাকায় আগেও দেখেছি আমি। আরেকটা জিনিস অবশ্য হতে পারে। মরা তিমি।'

'মরা তিমি হলে ভেসে থাকত।'

'তাই তো। জাহাজই।'

'কিন্তু অত পানিতে দেখলে কি ভাবে?' মুসার প্রশ্ন।

জবাব দিতে পারল না জিনা।

কিশোর ভাবছে। একটা আঙুল তুলল, 'ছিল। মানে, গভীর ছিল, ঝড়ের আগে। রাতের বেলা কাল পাড়ের মাটি ধসে পড়েছিল, মনে নেই? নিশ্চয়ই নিচে গিয়ে জমা হয়েছে। তার ওপর জমেছে পাথর আর আরও মাটি। কিছু পাহাড়ের ওপর থেকে পড়েছে, কিছু ঢেউয়ে এনে ফেলেছে। ব্যস, তলাটা উঠে এসেছে ওপরে, গভীর পানি অগভীর হয়ে গেছে।'

চোখ চকচক করছে অন্য তিনজনের।

চুটকি বাজাল মুসা। 'ঠিক বলেছ, কিশোর, তা-ই হয়েছে।'

'জাহাজটাকেও ঢেউয়েই এনেছে,' জিনা বলল। 'এখানে ওরকমই হয়। ঝড় উঠলে অনেক ডুবন্ত জাহাজ ঢেউয়ের ধাক্কায় দ্বীপের কাছাকাছি চলে আসে। আবার কিছু জাহাজ সরে যায়। গোবেল আইল্যান্ডের আশেপাশে অনেক জাহাজ ডুবেছে। ঝড়ের সময় ভয়াল হয়ে ওঠে এখানকার সাগর। কাল তো নিজের চোখেই দেখলে।'

'তারমানে,' মুসা বলল, 'এখন গিয়ে আমাদের দেখতে হবে, জাহাজই কিনা।'

'হ্যাঁ, গিয়েই দেখতে হবে। নৌকা নিয়ে চলে যাই টিলাটার কাছে। ওখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাবে।'

হ্যাঁ বলতে দ্বিধা করল না কেউ, সবাই একমত। রওনা হলো ওরা। ঢাল বেয়ে খাঁড়িতে নামতে শুরু করল। আগে আগে নামছে কিশোর আর মুসা, ওদের পেছনে জিনা। সবার পেছনে রবিন। তার লম্বা, নরম চুল ফুরফুর

করছে বাতাসে। দৌড় দেয়ার সুযোগ পেয়ে হাতছাড়া করল না রাফি। লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ে নামতে লাগল ঢাল বেয়ে। খুশিতে ঘেউ ঘেউ করছে। অনেকক্ষণ পর খেলার সুযোগ পেয়েছে, সবাইকে খাঁড়িতে নামতে দেখে সে ভেবেছে সাঁতার কাটতে যাচ্ছে।

নৌকাটা দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা আর কিশোর। যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই রয়েছে, তেরপলে ঢাকা। ঢেউ, বাতাস কিছুই লাগেনি। শুধু বৃষ্টির পানি জমে রয়েছে।

তেরপল টান দিয়ে পানি ফেলে ঠেলে সাগরে নামানো হলো ওটা। তারপর এক এক করে উঠে বসল সবাই। দাঁড় তুলে নিল জিনা আর মুসা। কিশোর ধরল হাল। রাফির গলা জড়িয়ে ধরে চুপ করে বসে রইল রবিন।

প্রণালী থেকে বেরিয়ে দ্বীপের পাশ ঘুরে এগিয়ে চলল নৌকা। যতই এগিয়ে আসছে টিলা, ওদের উত্তেজনা বাড়ছে। লম্বা টিলার গায়ে এসে ভিড়ল নৌকা। দেখা গেল, আগের রাতের ঝড় এটাকেও রেহাই দেয়নি। একপাশের মাটি ধসে পড়েছে। পাথর বেরিয়ে পড়েছে। নৌকার কিনার দিয়ে উঁকি মেরে নিচে তাকাল সবাই। কিন্তু ওপর থেকে পানি শান্ত লাগলেও ছোট ছোট ঢেউ রয়েছে এখানে। সেগুলো টিলার গায়ে বাড়ি খেয়ে অস্থির করে তুলেছে পানি। ফলে প্রায় কিছুই দেখা গেল না।

'দূর!' বিরক্ত হয়ে হাত নাড়ল জিনা। 'ওপর থেকেই ভাল ছিল।'

'আমি জানতাম এ রকমই কিছু হবে,' হেসে বলল কিশোর। 'সেজন্যেই ম্যাট্রেস নিয়ে এসেছি। তোমরা তো খুব হাসাহাসি করলে, সাগরের ওপর বিছিয়ে শোব নাকি? এখন বুঝলে তো।' রবারের ম্যাট্রেস। ফুঁ দিয়েই বাতাস ভরে ফুলিয়ে শোয়া যায়।

'গুড! গুড!' চেঁচিয়ে উঠল জিনা। 'দেখি, দাও, বাতাস ভরি।'

সবাই মিলে ফুঁ দিয়ে দিয়ে ম্যাট্রেসটা ফোলাল। দড়ি দিয়ে নৌকার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ভাসিয়ে দিল পানিতে। ওটার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল কিশোর। কিনার দিয়ে মুখ বের করে পানিতে চোখ ডুবিয়ে নিচে তাকাল। একটু দেখেই মুখ তুলে চিৎকার করে বলল, 'আছে! জাহাজই!'

তার মানে জিনা ঠিকই দেখেছে। সাগরের তলায় পড়ে আছে একটা জাহাজের ধ্বংসাবশেষ। দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল সবাই। কিন্তু একবারে সবাই উঠতে পারবে না ম্যাট্রেসে। তাই একজন একজন করেই গেল, মুসা, জিনা, রবিন। একটা জাহাজের অবয়ব দেখতে পেল সকলেই।

'কেমন দেখলে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'মানে, জাহাজটার আকার-আকৃতি?'

'আগে এ রকম আর দেখিনি,' জিনা বলল। 'তবে সিনেমায় দেখেছিলাম একটা।'

'ওটা কি আর আসল জিনিস দেখেছ নাকি,' বলল মুসা। 'আধুনিক ইয়টকে ছদ্মবেশ পরিয়ে পুরানো আমলের স্প্যানিশ জাহাজ বানিয়ে ফেলা হয়। কি যেন বলে? ক্যারাভাল না কি যেন।'

'ঠিক,' তার সঙ্গে একমত হলো রবিন। বইতে ছবি দেখেছে। 'গ্যালিয়ন বলে ওগুলোকে। আগের দিনে স্প্যানিশরা ওগুলোতে করে সোনা বয়ে নিয়ে যেত।'

'একেকজন দেখি একেক কথা বলো,' কিশোর বলল। 'একজন বলছ এক রকম, আরেকজন আরেক রকম। আমার কাছে লেগেছে অন্য আরেক রকম। তাহলে কি সবাই ভুল দেখলাম?'

চুপ হয়ে গেল সবাই।

চুলে হাত বোলাতে বোলাতে ভাবতে লাগল কিশোর। জাহাজটা দেখেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই তার। পানির জন্যেই হয়তো একেক জনের কাছে একেক রকম লেগেছে। যা-ই হোক, অ্যাডভেঞ্চার একটা পাওয়া গেছে। ঠিক তাদের নিচেই রয়েছে, যদিও পানির তলায়।

'শোনো!' উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিশোরের মুখ। 'আমরা কি করব জানো?'

'জানি,' মুসা বলল। 'জাহাজটা দেখতে যাব। পানির তলায়।'

'ঠিক। জিনা আর রবিনের ফ্রগম্যান মাস্ক আছে। তোমার আর আমার ডুবুরির পোশাক। অক্সিজেন ফ্ল্যাস্ক কোথায় ব্যবহার করব ভাবছিলাম না? এটাই সুযোগ। এই জিনা, বের করো।'

গলুইয়ের কাছেই একটা লকার। তালা খুলে ওটা থেকে ডুবুরির পোশাকগুলো বের করল জিনা। ফ্লিপার পরে নিয়ে অক্সিজেন ফ্ল্যাস্ক পিঠে বাঁধল কিশোর। তাকে সাহায্য করল রবিন। মুসাও পরে নিল তার সরঞ্জামগুলো।

জিনা আর রবিন মুখে মুখোশ লাগাতে যাবে, বাধা দিল কিশোর। 'রাখো, একসাথে যাওয়ার দরকার নেই। পানি যথেষ্ট গভীর। অক্সিজেন ছাড়া অত নিচে নামা যাবে বলে মনে হয় না।'

'আমারও তাই মনে হয়,' মাথা ঝাঁকাল জিনা। 'রবিন পারবে? প্র্যাকটিস আছে এত নিচে নামার?'

'না নামলেই ভাল। ওর অত অভ্যেস নেই।'

'তাহলে নামা উচিত না। ঠিক আছে, তোমরা দেখে এসো আগে, তারপর আমি যাব। মুসা, তুমি নাহয় আগে উঠে চলে এসো। কিশোর থাকতে থাকতেই আমি নামতে পারি তাহলে।'

অধৈর্য হয়ে উঠেছে কিশোর। সে আগে ডুব দিল। তার পেছনে চলল মুসা। ডুব দেয়ার আগেই আলোচনা করে নিয়েছে, প্রথমে শুধু জাহাজটার চারপাশে ঘুরবে, বাইরে থেকে দেখবে।

ওপরে বসে ওদেরকে দেখার চেষ্টা করছে জিনা, রবিন আর রাফি। ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে কিশোর আর মুসা।

জাহাজটার কাছে পৌঁছুল দু'জনে। কাছে থেকে ততটা আকর্ষণীয় মনে হলো না জিনিসটাকে। তবে পানির তলায় দেখতে ভারি অদ্ভুত লাগছে। ওরা ওটাকে দেখে অবাক হলো অন্য কারণে।

'আধুনিক জাহাজ,' ভাবছে কিশোর। 'পুরানো-টুরানো নয়। একেবারে

আধুনিক ইয়ট!'

একই কথা ভাবছে মুসা। 'দেখে মনে হয় না বেশিদিন আগে ডুবেছে। তামা আর ক্রোমের তৈরি জিনিসগুলো কালো হয়ে গেছে বটে, সারা শরীর ঢেকে গেছে শামুক আর সামুদ্রিক শ্যাওলায়, কিন্তু দীর্ঘদিন পানির নিচে থাকলে আসল যেসব ক্ষতি হয়, তার কিছুই প্রায় হয়নি। শামুক আর শ্যাওলার হালকা স্তরও বলে দিচ্ছে, বেশিদিন ডুবে থাকেনি। অদ্ভুত তো!'

তবে যে ব্যাপারটা সব চেয়ে বেশি অবাক করেছে ওদের, তা হলো, ওটার আকৃতি আর সরঞ্জাম। আধুনিক হলেও কি যেন একটা রয়েছে, যা পুরনো স্প্যানিশ গ্যালিয়নের কথাই মনে করিয়ে দেয়। সামনের অস্বাভাবিক উঁচু পাটাতন, নক্সা করা রয়েছে খুব বেশি। খোলের চারপাশে আলগা রেলিঙের মত ঘের, আঁকাবাঁকা, ছাঁচে তৈরি, যা আধুনিক ইয়টে কল্পনাই করা যায় না। আরও কিছু গোলমাল রয়েছে, ওদের অন্তত তা-ই মনে হলো, তবে সেটা কি, ঠিক ধরতে পারল না।

তামার একটা প্লেটের কাছে এসে ওপর থেকে বেশ কষ্ট করে শ্যাওলা আর শামুক সরাল কিশোর। রহস্যময় ইয়টটার নাম দেখা গেল। পড়া যায়। মুসা চলে এল তার পাশে। কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে সে-ও নামটা পড়ল। নামটাও অদ্ভুত, গোল্ড মাইন, অর্থাৎ সোনার খনি।

ফিরে তাকিয়ে ওপর দিক দেখাল কিশোর। বুঝতে পারল মুসা।

ফ্লিপার নেড়ে দু'জনেই দ্রুত ওপরে উঠে এল। উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে জিনা, রবিন আর রাফি।

'কি দেখলে?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

মুখোশ খুলে হাতে নিল কিশোর। 'দেখতে তেমন আহামরি কিছু নয়। তবে অদ্ভুত। ভেতরে কি আছে জানি না এখনও। বাইরে থেকে...'

'বাইরে থেকে কী?'

কি কি দেখে এসেছে খুলে বলল মুসা। জানাল জাহাজটার নাম গোল্ড মাইন। নামটা যেমন, চেহারাটাও তেমনি। আধুনিক আর পুরানো ধাঁচ মিলিয়ে তৈরি। ফ্রীক শিপ বলে এ-ধরনের জাহাজকে, বই থেকে জেনেছে।

জাহাজটা দেখতে ওরকম অদ্ভুত কেন, জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল ওরা।

'ভেতরে কি আছে দেখতে হবে,' বলেই আবার মুখোশ পরে ফেলল কিশোর। 'নিচে নামছি। মুসা, তুমি থাকো এবার। জিনা আসুক।'

পোশাক খুলে দিল মুসা। জাহাজের ভেতরে ঢোকার ব্যাপারটা ভাল লাগছে না তার। ঘুরে দেখার সময় একটা জিনিস লক্ষ করেছে সে, জমে থাকা মাটি আর পাথরের ওপর কাত হয়ে আছে জাহাজটা। ডান পাশে। তার সামান্য দূরেই হঠাৎ নেমে গেছে সাগরের তলা, পানি ওখানে অনেক গভীর। যদি পিছলে যায় জাহাজ? হড়কে গিয়ে পড়ে গভীর পানিতে?

সেকথা জানিয়ে বলল সে, 'এক কাজ কোরো। খোলের ভেতরে ঢোকার দরকার নেই। ডেকের ওপরটাই দেখেটেখে চলে এসো। জিনা দেখে এলে

আবার আমি নামব।'

কথাটা ভেবে দেখল কিশোর। মন্দ বলেনি মুসা। বিপদ হতেই পারে। ডুব দিল পানিতে। অনুসরণ করল জিনা। কাত হয়ে রয়েছে ডেক। তার ওপর এসে নামল দু'জনে। হ্যান্ডরেইল ধরে ধরে সাবধানে সামনে এগোল। পায়ের নিচে তক্তাগুলো সব পিচ্ছিল হয়ে আছে। কেমন যেন আঠা আঠা। পা কামড়ে ধরে। অনুভূতিটা মোটেও সুখকর নয়। মুখ বাঁকাল দু'জনেই। ওদের সামনে সাঁতরে বেড়াচ্ছে মাছের ঝাঁক।

খোলা একটা হ্যাচের কাছে চলে এল ওরা, ভেতরে অন্ধকার। মুসার হুঁশিয়ারি ভুলে গেল কিশোর, ভেতরে কি আছে দেখার লোভটাই বড় হয়ে উঠল। খোলা মুখ দিয়ে সাঁতরে ঢুকে পড়ল ভেতরে। কিন্তু জিনা ভোলেনি কথাটা। ডুবে থাকা জাহাজে ঢুকে যে মাঝে মাঝেই সাংঘাতিক বিপদে পড়ে মানুষ, মারাও যায়, একথা ভাল করেই জানা আছে তার। গোবেল বীচের আশপাশের সাগরেই ওরকম ঘটনা অনেক ঘটেছে তার জানামতে। কিশোর ঢুকে যাওয়ার পর দ্বিধা করল সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৌতূহলেরই জয় হলো। সাবধানে থাকতে হবে, মনকে একথা বুঝিয়ে কিশোরের পিছু নিল সে-ও।

যেন ওদের ঢোকার জন্যেই চুপ করে ছিল জাহাজটা। ওরা ঢুকে সারতেও পারল না, জ্যান্ত প্রাণীর মত নড়ে উঠল। পিছলে সরে যাচ্ছে গভীর পানির দিকে।

প্রথমে বুঝতে পারল জিনা। কিশোরের কাঁধ খামচে ধরল। ফিরে তাকাতেই ইঙ্গিতে বোঝাল তাকে, জাহাজটা সরে যাচ্ছে। বলেই আর দেরি করল না, সাঁতরাতে শুরু করল হ্যাচের দিকে। বেরিয়ে চলে এল মাছের মত। কিশোর মুখ বের করতে না করতেই আরও খানিকটা সরে গেল জাহাজ। কোমর ধরে টেনে নিয়ে চলল কিশোরকে। তাড়াতাড়ি তার বাড়ানো হাতটা চেপে ধরল জিনা। হ্যাচের ধার থেকে ততক্ষণে কোমর সরিয়ে ফেলেছে কিশোর। ফ্লিপার নাচাচ্ছে জোরে জোরে। জাহাজ আরও সরে যাওয়ার আগেই বেরিয়ে চলে এল।

বড় বাঁচা বেঁচেছে! জাহাজের দিকে তাকালও না আর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে আসতে লাগল ডেকের কাছ থেকে। বিপদ এখনও কাটেনি। জাহাজটা নিচে তলিয়ে যাওয়া শুরু করলেই পানির টান তৈরি হবে, কাছাকাছি যা পাবে, টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে নিচের দিকে। সেই টানের মধ্যে পড়লে রক্ষা নেই।

ভুশভুশ করে পানির ওপরে ভেসে উঠল দু'জনে। যে টিলাটার গায়ে নোঙর বেঁধেছে নৌকার, সেটাতে উঠে একটা চ্যাপটা পাথরে বসে পড়ল কিশোর। মুখোশ খুলে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আরেকটু হলেই মরেছিলাম! মুসা, তুমি ঠিকই বলেছিলে। জাহাজটা সরে গেছে। ওটার ভেতরে কি আছে কোনদিনই জানতে পারব না আর। গভীর পানিতে তলিয়ে গেছে গোল্ড মাইন।'

ঠিক এটাই যেন আশা করেছিল মুসা, অবাক হলো না। পানিতে মুখ

ডুবিয়ে দেখল প্রথমে। তারপর মুখ তুলে বলল, 'এত আফসোস করছ, যেন মোহর ছিল ওটার মধ্যে! একেবারে নেমে যায়নি জাহাজটা, তবে সরেছে। ওপরেই আছে এখনও। দেখা যায়। থাকবে মনে হচ্ছে, আর নামবে না।'

'নামবে না! কি করে বুঝলে?'

'নামবে না। আবার যাওয়ার কথা ভাবছো নাকি?'

'না নামলে তো যাবই।'

'আমিও যাব। জিনা, দাও তো ওগুলো খুলে।'

'আবার যাবে!' রবিনের কণ্ঠে উদ্বেগ।

'আরে অত ভয় পাচ্ছ কেন?' হেসে বলল কিশোর। জাহাজটা গভীর পানিতে নেমে যায়নি বলে খুব খুশি সে। 'সাবধান থাকব। কিছু হবে না।'

'ঘাউ! ঘাউ!' করে অসন্তোষ প্রকাশ করল রাফি। জাহাজ সরে যাবে কি যাবে না, এত কিছু বোঝে না সে। তাকে ফেলে বারবার পানির নিচে চলে যাচ্ছে ওরা, এটা ভাল লাগছে না তার। যেন বলতে চাইছে, যেতে চাইলে আমাকেও নিয়ে যাও। কিন্তু পানির তলায় তো কুকুর নেয়া সম্ভব নয়। তার মাথা চাপড়ে আদর করে দিল কিশোর।

আবার ডুব দিল সে আর মুসা। জাহাজের কাছে পৌঁছে দেখল, গভীর পানির দিকে তো যায়ইনি, বরং সরে এসেছে আরও। বোধহয় খোলসের নিচের আলগা মাটি সরে যাওয়ায় কিংবা দেবে যাওয়ায় পিছলাতে শুরু করেছিল। উত্তেজনা আর তাড়াহুড়োয় খেয়ালই করেনি তখন কিশোর, কোনদিকে সরছে ওটা। বেশ কিছু বড় বড় পাথরের চাঙড়ের খাঁজে তলাটা এমন ভাবে আটকে গেছে, পিছলে যাওয়াও কঠিন এখন। প্রায় সোজা হয়ে আছে ওপর দিকে। অগের মত কাত হয়ে নেই। ভেতরে ঢোকা এখন আগের চেয়ে সহজ।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে বুড়ো আঙুল তুলল মুসা ইঙ্গিতে বোঝাল জাহাজের অবস্থান এখন ভাল, এবং সে খুশি হয়েছে খুশি কিশোরও হয়েছে। খোলা হ্যাচওয়ে দিয়ে আবার ঢুকল ভেতরে। উত্তেজনায় দুরুদুরু করছে বুক। কি আছে ভেতরে? কি দেখতে পাবে?

শুরুতে কিছু চোখে পড়ল না। তারপর হ্যাচওয়ে দিয়ে আসা আলোয় দেখা গেল, একটা মইয়ের তলায় লম্বা গ্যাংওয়ে নিচে নেমে সে।

জাহাজের ভেতরটা দেখতে এসেছে, সঙ্গে করে ওয়াটারপ্রুফ টর্চ আনতে ভোলেনি। বাইরে থেকে যে পরিমাণ আলো আসছে, তাতে দেখা সম্ভব নয় কাজেই টর্চ জ্বালতে হলো। বিস্ময়ের পর বিস্ময় অপেক্ষা করছে তার জন্যে এক এক করে আবিষ্কার করতে লাগল সে-সব। গোল্ড মাইন চমৎকার একটা আধুনিক ইয়ট। বিলাস বহুল। সুন্দর করে সাজানো স্যালুন আরামদায়ক কেবিন। অনেক জায়গা নিয়ে তৈরি রান্নাঘর। সব দরজাই খুলতে পারল, একটা বাদে। ওপাশে নিশ্চয় আরেকটা কেবিন রয়েছে। কি আছে তাতে?

ঠেলেঠুলে দেখল। কিন্তু নড়লও না দরজাটা। বেঁকাতেড়া হয়ে আটকে

যায়নি, তালা দেয়া, আন্দাজ করল সে। মুসাকে সেটা বোঝানোর জন্যে পেছনে ফিরে তাকাল। কোথায় মুসা? নেই ওখানে। বেরিয়ে গেল?

তাকে খুঁজতে ডেকে ফিরে চলল কিশোর। স্যালুনে দেখা হয়ে গেল। গ্রামোফোন রেকর্ডগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। ইশারায় তাকে সঙ্গে আসতে বলল সে।

দু'জনে মিলে দরজাটা খোলার চেষ্টা করল। ঠেলেঠুলে দেখল। লাভ হলো না কিছুই। কোমরের বেল্টে আটকানো ছুরিটা খুলে নিয়ে ফলার মাথাটা চাবির ফুটোয় ঢুকিয়ে দিল মুসা। ডানে-বাঁয়ে কয়েকবার মোচড় দিতেই তাকে অবাক করে খুলে গেল তালাটা। এত সহজে আর তাড়াতাড়ি সফল হবে, কল্পনাও করেনি।

ঠেলে মুসাকে সরিয়ে দিল কিশোর। দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।

খুলে গেল দরজা। বেশ বড় একটা কেবিনে ঢুকল দু'জনে। আগে যেগুলো দেখেছে তার একটাও এটার সমান নয়। বোধহয় ক্যাপ্টেনের ঘর ছিল এটা। এক কোণে তিনটে বড় কাঠের বাক্স একটার ওপরে আরেকটা রাখা। ওগুলোর কাছে এগিয়ে এল কিশোর। ডালাগুলো পেরেক দিয়ে লাগানো। খুলতে হলে পেরেক তুলতে হবে। চাড় দিয়ে তুলতে হলে যন্ত্র দরকার। তবে আরেকটা সহজ উপায় আছে। পানিতে ভিজে অনেক জায়গায় পচে গেছে তক্তা। জোরে কয়েকটা লাথি মারলেই ভেঙে যেতে পারে।

তবে তারও দরকার হলো না। আরও সহজেই কাজ হয়ে গেল। সে আর মুসা মিলে টেনে একটা বাক্স নামিয়ে আনতে চেয়েছিল মেঝেতে, কিন্তু ওপর থেকে সরাতেই খসে গেল তলা, ছড়িয়ে পড়ল ভেতরের ভারী জিনিসগুলো।

দেখে হাঁ হয়ে গেল দু'জনে। কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন চোখ।

জিনিসগুলো না চেনার মত বোকা নয় ওরা। সোনার বার। হলদে, চকচকে। নোনা পানি কিছুই করতে পারেনি ওগুলোর, কালো দাগ পড়েনি। ছড়িয়ে গেছে কেবিনের মেঝেতে।

চার

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটতে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। কোথা থেকে এল এই সোনার বার? কার জিনিস? জিনিসগুলো এই ডুবন্ত ইয়টে কেন? অনেক প্রশ্ন একসাথে ভিড় করে আসছে মনে। কোনটারই উত্তর জানা নেই ওদের।

একটা বার তুলে নিল কিশোর। পানির নিচে এত দামী একটা জিনিসের

ছোঁয়ায় বিচিত্র অনুভূতি হলো তার। ফিরে চেয়ে দেখল, মুসাও একটা বার হাতে নিয়েছে। ইশারায় তাকে ওপরে উঠতে বলল কিশোর। ব্যাপারটা নিয়ে চারজনে বসে আলোচনা করতে চায়।

কেবিন থেকে বেরিয়ে গ্যাংওয়ের দিকে চলল ওরা। বারটা এখনও কিশোরের হাতে রয়েছে। মুসার আগে আগে চলেছে সে। মই বেয়ে ডেকে উঠতে যাবে, হঠাৎ সামনে দিয়ে একটা ছায়া চলে গেল। টর্চ নেভানো। ম্লান আলোয় ওটাকে একটা বড় মাছ বলে মনে হলো তার।

'বাইন মাছটাছ হতে পারে!' ভাবল সে। কাঁটা দিল গায়ে।

ভয়ঙ্কর মোরে ঈলের কথা জানা আছে তার। বৈদ্যুতিক বাইনগুলোও কম মারাত্মক নয়। তা ছাড়া সাপের মত শরীর। ছোঁয়া লাগার কথা ভাবতেই নাক মুখ কুঁচকে ফেলল সে। ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর জন্যে টর্চ জ্বালল। আলো ফেলল ওটার ওপর।

আলোতে ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, মুখ ঘুরিয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করল ওটা। ভয়ে জান উড়ে যাওয়ার জোগাড় হলো দু'জনের। বাইন মাছ নয়। হাঙর!

বড় জাতের মানুষখেকোগুলো নয়, ডগফিশ। যে ফিশই হোক, হাঙরেরই তো জাতভাই। কামড়ে দিতে অসুবিধে কি? রেগে গেছে যখন।

রেগেছে চোখে আলো পড়ায়। ভালমত তাকাতে পারছে না। চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। ভীষণ বিরক্ত হয়ে আলোর উৎসকে ধ্বংস করার জন্যে ছুটে আসছে ওটা। সময় মত সরে যাওয়ার চেষ্টা করলেও পুরোপুরি সরতে পারল না কিশোর, লেজের ঝাপটায় কাত হয়ে গেল।

মাছটার ভাবভঙ্গি দেখেই বুঝে গেছে মুসা, বিপদে পড়েছে ওরা। ডগফিশের স্বভাব জানা আছে তার, অবশ্যই বই পড়ে। হাঙর গোষ্ঠীর বেশ নিরীহ জীব ওরা। মানুষের আশপাশে ঘুরে বেড়ায় অলস ভঙ্গিতে, সাঁতারুকে আক্রমণ করে না। কিন্তু এটা একটা ব্যতিক্রম। শেয়াল-কুকুর যেমন জলাতঙ্ক রোগ হলে খেপাটে হয়ে যায়, এটারও তেমনি অবস্থা। কিশোরকে কামড়ানোর জন্যে আবার ঘুরল ওটা। ছোট্ট মুখটা হাঁ করা। ভেতরে সারি সারি ধারাল দাঁত।

কি ভেবে টর্চটা হাত থেকে ছেড়ে দিল কিশোর। মেঝেতে পড়ে নিভে গেল ওটা। কিছুই আর দেখতে পাচ্ছে না এখন। হাঙরটা কোথায়, তা-ও দেখার উপায় নেই। ঠিক ওই মুহূর্তে তার পা ধরে টান দিয়ে চিত করে ফেলল মুসা। একেবারে সময়মত! ওদের ওপর দিয়ে শাঁ করে চলে গেল হাঙরটা, লেজের ঝাপটায় আলোড়ন উঠল পানিতে।

আর কি ফিরে আসবে?

মইয়ের দিকে তাকাল দু'জনে। কিন্তু ধরারও সময় পাবে না, জানে। গ্যাংওয়ে ধরে আবার ফিরে আসছে হাঙর। বিশ্রী একটা মুহূর্ত!

নাহ্, ওটাকে ভয় না দেখাতে পারলে আর চলছে না! জোরে জোরে হাত আর ফ্লিপার নেড়ে পানিতে আলোড়ন তুলল কিশোর। তার উদ্দেশ্য বুঝতে

পেরে মুসাও একই রকম দাপাদাপি শুরু করল। এ-ধরনের আচরণে অভ্যস্ত নয় হাঙরটা। কাছে এসেও কামড় না দিয়ে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। ঘুরল আবার এদিকে। যাবে, না হামলা চালাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না যেন। দ্বিধা করছে। চুপ করে আছে দু'জনে। সাঙ্ঘাতিক দীর্ঘ লাগছে সময়টা।

অবশেষে ওদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল হাঙরটা। আর ফিরল না।

যে পথে গেছে ওটা, বেরোতে হলে ওদেরকে ওপথেই যেতে হবে।

'খোদা!' প্রার্থনা করল মুসা, 'বাইরে গিয়ে যেন আমাদের জন্যে বসে না থাকে!'

কিন্তু কিশোর জানে, ঘাবড়ে যাওয়া যে কোন মাছ দ্রুত সাঁতরে সরে যায় বিপজ্জনক এলাকা থেকে। একবার ভয় পেলে পাল্টা আক্রমণ করার জন্যে সহজে আর ফিরে আসে না। কাজেই ওপরে ওঠার সময় মুসার মত ভয়ে ভয়ে থাকল না সে।

ডেকে বেরিয়ে হাঙরটাকে দেখা গেল না। নিরাপদেই ওপরে উঠে এল দু'জনে।

ওদেরকে দেখে হাঁপ ছাড়ল জিনা আর রবিন। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে এত জোরে লাফ মারল রাফি, আরেকটু হলেই পড়ে যেত নৌকার বাইরে। কিশোর মুখোশ খুলতেই তার গাল চেটে দিতে লাগল আদর করে।

'আরে থাম, থাম, সর!' ঠেলে রাফির মুখটা সরিয়ে দিল কিশোর।

'কিশোর, তোমাকে এমন ফ্যাকাসে লাগছে কেন?' রবিন জিজ্ঞেস করল। 'নিচে কি খুব ঠাণ্ডা?'

'না, কাহিল হয়ে গেছি। তিন তিনবার ডুব দিলাম…'

'তার ওপর হাঙরের সঙ্গে লড়াই!' কিশোরের কথাটা শেষ করে দিল মুসা। 'অল্পের জন্যে বেঁচেছি। দিয়েছিল কামড়ে। এই, কি পেয়েছি জানো ওখানে? গুপ্তধন, গুপ্তধন!'

হেসে উঠল জিনা। ভাবল, মুসা মজা করছে। হাঙর, গুপ্তধন—কোনটার কথাই বিশ্বাস করল না। বলল, 'হ্যাঁ, তাই তো। ওপর থেকে আমরাও দেখলাম,' রসিকতা করল সে, 'একটা হাঙর এসে সমস্ত গুপ্তধন খেয়ে ফেলছে।'

'বাজে কথা বোলো না!' এটুকু রসিকতা সহ্য করারও মানসিকতা নেই এখন কিশোরের। ক্লান্তও হয়েছে খুব। 'মুসা সত্যিই বলছে। একটা সোনার বার হাতে করে নিয়ে আসছিলাম, তোমাদের দেখানোর জন্যে, এই সময় হাঙরটা এসে হাজির হলো। হামলা থেকে বাঁচতে গিয়ে বার, টর্চ, সব ছেড়ে দিয়েছি হাত থেকে।' মুসাকে দেখিয়ে বলল, 'ও না থাকলে এতক্ষণে হাঙরের খাবার হয়ে যেতাম।'

'বলো কি!' যেমন অবাক হয়েছে, তেমনি ভয় পেয়েছে রবিন।

কথাগুলো যেন বুঝতে পারছে, এমনি একটা ভঙ্গি করে লাফ দিয়ে ডাঙায় নামল রাফি। পাথরের ওপর বসল গম্ভীর হয়ে। যেন রোমাঞ্চকর গল্পের শেষটা শুনতে চায় রবিন আর জিনার মতই আগ্রহ নিয়ে।

খুলে বলল সব মুসা।

ও শেষ করতেই রবিন বলল, 'এখুনি কটেজে ফিরে যাওয়া উচিত আমাদের। আঙ্কেলকে বলা দরকার। কি করতে হবে তিনিই ভাল বুঝবেন।'

'হ্যাঁ। খোঁজখবর নিয়ে তিনি হয়তো জানতে পারবেন, ওই সোনার মালিক কে।'

কিশোর চুপ করে রইল। অন্যের সাহায্য নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে তার ভাল লাগে না। সোনার বারটা আনতে পারেনি বলে দুঃখ হচ্ছে। পারে তো এখনই আরেকবার নামে। এই অ্যাডভেঞ্চারের এখানেই ইতি, ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে তার।

'যত নষ্টের মূল ওই হাঙর ব্যাটা!' বিরক্ত হয়ে ভাবল সে। 'ওটার জন্যেই প্রমাণ ফেলে আসতে হলো। আমাদের কথা এখন লোকে বিশ্বাস করলেই হয়।'

দাঁড় বেয়ে গোবেল বীচ কটেজে ফেরার সময়ও চুপ করে রইল কিশোর।

ডাঙায় পৌঁছে নৌকা নোঙর করে রেখে কটেজে ছুটল। ওদের দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন কেরি আন্টি। 'এই যে, এসেছ। আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। কি একখান ঝড় যে গেল! যাও, রান্নাঘরে যাও। গরম গরম কোকো খাও গিয়ে। আভনে একটা স্পঞ্জ কেক চাপানো আছে। হয়ে গেছে বোধহয়।'

কোকো আর স্পঞ্জ কেক পছন্দ করলেও খাবার নিয়ে আপাতত তেমন মাথাব্যথা নেই কিশোরের। আগে খবরটা জানানো দরকার। জিজ্ঞেস করল, 'আঙ্কেল কোথায়?'

'স্টাডিতেই আছে। খুব ব্যস্ত। বলে দিয়েছে কেউ যেন বিরক্ত না করে। সারাদিন আর বেরোবে বলে মনে হয় না। বাজার-সদাই কিছু নেই, আমাকেই যেতে হবে আরকি।'

'একটা কথা ছিল।'

'বিকেলে বোলো। এখন ডাকতে গেলে রেগে যাবে।'

ওদেরকে বাড়িতে রেখে গাঁয়ের বাজারে চলে গেলেন কেরি আন্টি। হতাশ দৃষ্টিতে সেটা দেখতে হলো ওদের। কিছু করার নেই। অপেক্ষা করতেই হবে। ক্ষোভ কিছুটা কমাল স্পঞ্জ কেক, সাথে প্রচুর র‍্যাজবেরির জ্যাম।

কাজে এতই ব্যস্ত রইলেন পারকার আঙ্কেল, খাবারের কথাও ভুলে গেলেন। ডেকেডুকে তাঁকে বের করে আনতে হলো জিনার আম্মাকে। তাঁকে দেখেই গড়গড় করে সব বলতে শুরু করল ছেলে-মেয়েরা। শুরুতে তেমন আগ্রহী মনে হলো না তাঁকে। কিন্তু গোল্ড মাইন নামটা শুনেই ফিরে তাকালেন। 'কি বললে? গোল্ড মাইন। শুনেছি। দুই বছর আগে ইয়টটাকে নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে পত্রিকায়।'

'হ্যাঁ, আমারও মনে আছে,' আন্টি বললেন। 'বানানোর ধরনটা নাকি

অদ্ভুত। আর তার জার্মান মালিক ডেইমলার হফও আরেক আজব লোক। আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ একটা ইয়ট বানাতে চেয়েছেন তিনি, কিন্তু দেখতে লাগবে যতটা সম্ভব পুরানো স্প্যানিশ গ্যালিয়নের মত।' হাসলেন আন্টি। 'টেলিভিশনে খবরে দেখিয়েছিল ইয়টটাকে। আজব এক ফ্রীক বোট।'

'আন্টি,' রবিন জানতে চাইল, 'মিস্টার হফ কি সোনার ব্যবসায়ী নাকি?'

'স্বর্ণ ব্যবসায়ী? নাহ্। ইংল্যান্ডে সাধারণ লোকে সোনা নিয়ে কারবার করতে পারে না, বিশেষ করে সোনার বার-টার এ সব। ওগুলো করে ব্যাংক অভ ইংল্যান্ড। আর সোনা চোরাচালানীও বলা যাবে না মিস্টার হফকে। ওসব করার দরকারই নেই তাঁর। এমনিতেই তিনি কোটিপতি।'

'তাহলে সোনার বারগুলো তাঁর জাহাজে এল কিভাবে?' জিনার প্রশ্ন।

কি যেন ভাবছেন পারকার আঙ্কেল। বললেন, 'যদ্দূর মনে পড়ে, ইয়টটা চুরি গিয়েছিল। গোবেল বীচের কাছেই নোঙর করেছিল। ছুটি কাটাতে এসেছিলেন মিস্টার হফ। বছরের একটা বিশেষ সময়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি; জাহাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ান দেশে দেশে। গোবেল বীচের ধারে জাহাজ ভিড়িয়েছিলেন, সঙ্গে কয়েকজন মেহমান ছিল।'

অবাক হলো মুসা। 'হায় আল্লাহ! ওরকম একটা ইয়ট চুরি করার সাহস করল! টেলিভিশনে ছবি প্রচার হয়ে গেছে, জানে পালাতে পারবে না। লোকে দেখলেই চিনে ফেলবে। তারপরেও!'

'তা অবশ্য ঠিক। সাহস বেশিই দেখিয়েছে। তবে জাহাজটার গতি খুব বেশি ছিল। চোরেরা ওটা নিয়ে দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল আসলে। নিয়ে গিয়ে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে চুরি করেনি।'

'কেন? বেরোতে চেয়েছে কেন?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'কারণ ব্যাংক ডাকাতি করেছিল ওরা। সোনার বার লুট করে নিয়ে পালাতে চেয়েছিল।'

'হুঁ, বাকিটা আন্দাজ করতে পারছি। ইয়টটা পথেই ডুবে গেল। হয়তো চোরেরা জানতই না কি করে চালাতে হয় ওটা। ডুবে গেল, অনেক সোনা নিয়ে। তাই না?'

'অনেকটা তা-ই। ঝড়ের কবলে পড়েছিল। ডাকাতেরা মরেনি, লাইফবোটে চেপে প্রাণ বাঁচায়। তাদেরকে উদ্ধার করে জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তিনজন। নামও দিয়েছিল পত্রিকায়। কি যেন? হ্যাঁ, ডিক, মব আর বোলান। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ, কিন্তু বেমালুম অস্বীকার করেছে ওরা। কিছুতেই স্বীকার করেনি যে সোনা লুট করেছে। বার বার একই কথা বলেছে, ইয়টটা চুরি করেছে স্রেফ মজা করার জন্যে। টেলিভিশনে দেখে লোভ হয়েছিল ওটাতে চড়ার। এমনিতে মালিককে বললে তো আর দেবে না, তাই চুরি করেই নিয়ে গিয়েছিল। সোনা লুটের কেস ওদের ওপর চাপাতে পারেনি পুলিশ। কাজেই জেলও বেশি দিন দেয়া যায়নি।'

'মাত্র কিছুদিন আগে জেল থেকে খালাস পেয়েছে ওরা,' যোগ করলেন

আন্টি। 'পত্রিকায় দেখেছি।'

'এতদিন কেউ ইয়টটাকে তোলার চেষ্টা করেনি কেন?' কিশোরের প্রশ্ন। 'পুলিশই বা করল না কেন, যদি সন্দেহই করে থাকে ওটাতে সোনার বারগুলো রয়েছে?'

'চেষ্টা করেনি তা নয়,' জবাব দিলেন পারকার আঙ্কেল। 'তবে কোন সন্ধানই পায়নি জাহাজটার। কেউ দেখেনি কোথায় ডুবেছে। ডাকাতেরাও ঠিক করে বলতে পারেনি কোথায়, কিংবা ইচ্ছে করেই বলেনি। এখন বোঝা যাচ্ছে কোথায় ডুবেছিল, তোমরা তো দেখেই এসেছ। সবাই গিয়ে খোঁজাখুঁজি করেছে গভীর সাগরে। অথচ তীরের কাছাকাছিই ডুবে বসে আছে ওটা, কে ভাবতে পেরেছে?'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'কোন্ জায়গায় জাহাজ ডুবেছে, ডাকাতেরা যে সেটা বলেনি, তার কারণ আছে। এক নম্বর কারণ, বললেই ব্যাংক ডাকাতির দায়ে বড় সাজা হয়ে যেত ওদের। আর দুই নম্বর, জেল খেটে এসে আর তুলে নিতে পারত না সোনাগুলো। পুলিশের কাছে মুখ খোলেনি এই কারণেই। ওরা জানে জাহাজ চুরির দায়ে বেশিদিন সাজা হবে না। সাজা খেটে এসে আবার তুলে নিতে পারবে সোনাগুলো।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই ভেবেছি,' আঙ্কেল বললেন। 'পুলিশকে জানানো দরকার। থানায় ফোন করব। তারপর ওরা যা করে করুক।'

ফোন করতে করতে অনেক দেরি হয়ে গেল। জবাব দিল একটা ঘুমজড়িত কণ্ঠ। কিন্তু পারকার আঙ্কেলের কথা শুনেই ঘুম দূর হয়ে গেল তার। হেসে, রিসিভারটা রেখে দিলেন তিনি। খবরটা জানালেন সবাইকে, 'সাড়া পড়ে যাবে এখুনি সমস্ত থানায়। তবে কালকের আগে কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। শোনো, রাত হয়েছে। তোমরা ঘুমাতে যাও।'

পাঁচ

সে-রাতে ভাল ঘুম হলো না কিশোরের। স্বপ্ন দেখল গুপ্তধন, ব্যাংক ডাকাত আর হাঙর। ভোরবেলায়ই উঠে পড়ল বিছানা থেকে। ঘুম ভাঙাল বন্ধুদের।

'এই, ওঠো। জলদি কাপড় পরে নাও। নিশ্চয় পুলিশ আমাদের ডাকতে আসবে, জায়গাটা ওদের দেখিয়ে দেয়ার জন্যে।'

কিন্তু বিকেল তিনটের আগে পুলিশ এল না। দলের সাথে রয়েছেন একজন শেরিফ আর দু'জন ফ্রগম্যান, অর্থাৎ ডুবুরি। কিশোরদের মুখ থেকে পুরো গল্পটা শুনলেন আবার শেরিফ লিউবার্তো জিংকোনাইশান। লিখে নিলেন নোটবুকে। তারপর জায়গাটা দেখিয়ে দেয়ার অনুরোধ করলেন।

পুলিশের লঞ্চ আছে। তাতে গেল না ছেলে-মেয়েরা। জিনার বোটটা ভাসাল। লঞ্চের পেছনে নৌকা বেঁধে টেনে নিয়ে রওনা হলো পুলিশ।

রহস্য আর অ্যাডভেঞ্চার পেয়ে গেছে। কিশোরের আনন্দ দেখে কে! অন্যেরাও মহাখুশি।

ফ্রগম্যানদের সাথে যাওয়ার খুব ইচ্ছে কিশোরের। ইঞ্জিনের শব্দে নিশ্চয় ঘাবড়ে গিয়ে পালিয়েছে হাঙরেরা, সহজে আর আসবে না। কিন্তু রাজি হলেন না শেরিফ।

লঞ্চ থেকে বাঁধন খুলে নেয়া হলো নৌকাটার। দাঁড় বেয়ে ওটাকে টিলাটার কাছে নিয়ে এল মুসা আর জিনা। আগের দিন যেখানে নৌকা বেঁধেছিল সেখানে এনে বাঁধল। তারপর চ্যাপ্টা পাথরটায় উঠে দাঁড়াল পাঁচজনে, রাফি সহ।

ওখানে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সব। লঞ্চ থেকে নেমে পানিতে ডুব দিল দু'জন ফ্রগম্যান। অল্পক্ষণ পরেই ভেসে উঠল আবার, কিন্তু কিশোরের মনে হলো কয়েক যুগ পরে উঠেছে।

'কনটেইনার নিতে উঠেছে,' মুসা বলল। 'সোনার বারগুলো তোলার জন্যে।'

ভুল বলেছে সে। লঞ্চের ডেক থেকে ফিরে তাকিয়ে শেরিফ বললেন, 'তোমরা নিশ্চয়ই ভুল করেছ। সোনার বার-টার কিছু নেই। বানিয়ে বলোনি তো? চমকে দেয়ার জন্যে?'

'খাইছে! বলে কি?' মুসা বলল।

ক্ষণিকের জন্যে বোকা হয়ে গেল যেন গোয়েন্দারা।

অবশেষে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'জাহাজটা কি নেই?'

'আছে। যেখানে বলেছিলে সেখানেই আছে। ফ্রগম্যানরা বলছে, কয়েকটা আলগা তক্তা দেখতে পেয়েছে। বাক্সের কাঠ হতে পারে। তবে সোনা নেই, একটা বারও না।'

পরস্পরের দিকে তাকাল ছেলে-মেয়েরা। কসম খেয়ে বলতে লাগল কিশোর আর মুসা, সোনার বার দেখেছে ওরা। এমনকি হাতে নিয়েও দেখেছে। ফ্রগম্যানেরা বলল, ওরা সমস্ত ইয়ট খুঁজে এসেছে, সোনা পায়নি। গ্যাংওয়েতে যে বারটা ফেলে এসেছে কিশোর, সেটাও না। আন্দাজ করতে পারছে সে, কি ঘটেছে! জেল থেকে বেরিয়েই চলে এসেছে ডাকাতেরা, যত তাড়াতাড়ি পেরেছে। সোনাগুলো তুলে নিয়ে চলে গেছে।

আরেকবার গিয়ে ইয়টে নামল ফ্রগম্যানেরা। বেশ কিছুক্ষণ পানির তলায় কাটিয়ে উঠে এল। কিছু পায়নি।

লঞ্চ নিয়ে চলে গেল পুলিশ। রেখে গেল হতবাক গোয়েন্দাদের। আলোচনা করার জন্যে নৌকা নিয়ে দ্বীপে ফিরে এল ওরা।

'তদন্ত চালিয়ে যাবে পুলিশ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল জিনা। 'কিন্তু লাভটা কি? ততক্ষণে বহুদূরে চলে যাবে ডাকাতেরা।'

'আমি তা মনে করি না,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে কিশোর বলল। 'গতকালও বারগুলো ছিল জাহাজে। আমরা চলে যাওয়ার পর তুলেছে। বেশি সময় নষ্ট হয়নি এখনও। আর ওগুলো যথেষ্ট ভারী।'

'তাতে কি?' ভুরু নাচাল মুসা। 'ভ্যান বা কার নিয়ে এলেই হলো। তুলে নিয়ে যেতে অসুবিধে নেই।'

'তা নেই,' রবিন বলল। 'তবে পালাতে পারবে না। শেরিফ বললেন না, রেডিওতে খবর পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সতর্ক করে দেয়া হয়েছে চেকপোস্টগুলোকে। পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে দেশ থেকে বেরোতে পারবে না ডাকাতেরা।'

'পারতেও পারে,' জিনা বলল। 'ওরা কখন গেছে কে জানে! এতক্ষণে যদি বেরিয়ে গিয়ে থাকে? আর ধরা যাবে না। বাদ দাও ওসব কথা। পুলিশকে জানিয়েছি, আমাদের দায়িত্ব শেষ। অযথা ভেবে আমাদের মজা নষ্ট করতে যাই কেন? এসো, আগে খেয়ে নেয়া যাক।'

ভাল ভাল খাবার তৈরি করে দিয়েছেন কেরি আন্টি। সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে বসল ওরা। ছোট পকেট রেডিও বের করে অন করল মুসা, খবর শোনার জন্যে। এবং যেন কাকতালীয় ভাবেই তখন সোনার বারগুলো গায়েব হয়ে যাওয়ারই খবর দিচ্ছে সংবাদ পাঠক।

'মেইন রোডগুলোয় কড়া নজর রেখেছে পুলিশ,' বলে যাচ্ছে সে। 'কিন্তু সন্দেহজনক কোন গাড়ি এ-পর্যন্ত চোখে পড়েনি। হতে পারে, পুলিশ ব্যাপারটা জানার আগেই বেরিয়ে চলে গেছে ডাকাতেরা। কিন্তু পুলিশ সে-কথা মানতে পারছে না। তাদের ধারণা, বেশি সময় পায়নি ডাকাতেরা। আর সন্দেহজনক কোন ভ্যান কিংবা গাড়িও গতকাল রাত থেকে আজকের মধ্যে দেখা যায়নি গোবেল বীচ এলাকায়।'

উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল কিশোর। 'দেখলে? আমার কথাই ঠিক। বারগুলো তুলেছে বটে ডাকাতেরা, কিন্তু নিয়ে পালাতে পারেনি। সময় পায়নি। কিংবা কোন কারণে তাড়াহুড়া করেনি। আমরা সোনাগুলো দেখে পুলিশকে বলে দিয়েছি, একথা জানার কোন উপায় ছিল না ওদের। যা-ই হোক, সোনা নিয়ে কাছাকাছিই কোথাও রয়েছে ওরা। এখন রেডিওতে খবর শুনে থাকলে মাথার চুল ছিঁড়ছে, কেন আগেই পালাল না ভেবে।'

'আশপাশেই কোথাও আছে ওরা ভাবছ?' জিনা জিজ্ঞেস করল।

চমৎকার রোদ উঠেছে। ছায়ায় বসে একটা পাথরে হেলান দিল কিশোর। কোলের ওপর দু'হাত ভাঁজ করে রেখে তাকাল জিনার দিকে। 'আমি শিওর, আছে। গোবেল বীচে, কিংবা কাছাকাছি অন্য কোন গাঁয়ে। খবরটা শুনলেই হুঁশিয়ার হয়ে যাবে। গা ঢাকা দেবে কোথাও। পুলিশের সতর্কতা কমে আসার অপেক্ষা করবে। তারপর সোনা নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু আমরা তা হতে দেব না। আরেকটা কেস পেয়ে গেলাম। যেভাবেই হোক ডাকাতদের খোঁজ বের করে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেব।'

জিনা, মুসা, রবিন, তিনজনেই ভাবল, বুদ্ধিটা মন্দ না। রাফিও যেন একমত হয়ে লেজ নাড়তে লাগল।

*

পুলিশ বা খুদে গোয়েন্দারা অনেক চেষ্টা করেও ডাকাতদের কোন হদিস

করতে পারল না। বাতাসে মিলিয়ে গেছে যেন ডিক, মব আর বোলান। সাইকেল নিয়ে গোবেল বীচের আশপাশের অঞ্চলে অনেক চক্কর দিল গোয়েন্দারা। ডাকাতের খোঁজে। সন্দেহজনক যে কোন ব্যাপার দেখলেই খোঁজখবর নিল, লোককে প্রশ্ন করল। কিছুই পাওয়া গেল না। বিকেলে ক্লান্ত এবং হতাশ হয়ে গোবেল বীচে ফিরল ওরা। নৌকা নিয়ে চলে এল গোবেল আইল্যান্ডে, ওদের ক্যাম্পে।

একদিন সন্ধ্যায়, রাতের খাবারের পর আগুনের কুণ্ড ঘিরে বসেছে ওরা। উষ্ণ রাত। আকাশের দিকে তাকিয়ে রবিন বলল, 'দেখো দেখো, তারাগুলো দেখো। যেন হীরার টুকরো। কালো মখমলের ওপর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। 'ভাব এসে যায়, তাই না? কিন্তু সুন্দর, এটা স্বীকার করতেই হবে।'

'ঘাউ!' করে এক হাঁক ছাড়ল রাফি। কবিতা-টবিতা নিয়ে মাথাব্যথা নেই তার। শজারুর গন্ধ পেয়েছে।

মাউথ অরগানে নরম একটা সুর তুলল মুসা। গিটারের তারে টোকা দিল কিশোর। সুর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না সে এখন, আনমনেই বাজিয়ে যাচ্ছে আর ভাবছে। ডাকাতদের কোন হদিস করতে না পেরে অস্থির হয়ে উঠেছে।

বাজনা থামিয়ে বলল, 'অপরাধীদের ধরতে অনেক দেরি হচ্ছে আমাদের···' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'যা-ই হোক, আমি হাল ছাড়ব না। কাল থেকে আবার শুরু করব। গরুখোঁজা করে ফেলব সমস্ত এলাকা। কোন জায়গা বাদ দেব না। আরও অনেক বেশি লোকের সঙ্গে কথা বলব। কারও না কারও চোখে কিছু পড়েছেই। সেটা জানার চেষ্টা করব। গুপ্তধন লুকানো যায়, এ রকম জায়গায়ও খুঁজে দেখব, কিছু আছে কিনা। সোনার বারগুলো কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে ডাকাতেরা, পরে এসে বের করে নিয়ে যাবে বলে।'

ব্যাপারটা নিয়ে আরও অনেকক্ষণ আলোচনা করল ওরা। তারপর শুতে গেল তাঁবুতে। কিশোরের পাশে শুলো রাফি। দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল সবাই।

মাঝরাতের দিকে রাফির গরগর শুনে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। কুকুরটার কাঁধে হাত রেখে তাকে চুপ করতে বলল। কান খাড়া করে ফেলেছে। নিশ্চয় কিছু কানে গেছে রাফির। একটু পরেই কথা শোনা গেল। বড় মানুষের গলা। দেখতে হয়! সাবধানে পা টিপে টিপে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল সে। সঙ্গে রাফি।

বাইরে বেরিয়েই থমকে দাঁড়াল কিশোর। সৈকতের ধার থেকে খাড়া পথটা বেয়ে উঠে আসছে দু'জন লোক।

টর্চ লাগছে না, চাঁদের আলোতেই দিব্যি পথ দেখে উঠে চলে আসছে। জুতোয় লেগে গড়িয়ে পড়ছে পাথর। পরোয়াই করছে না ওরা। তার মানে জায়গাটা ওদের পরিচিত, যাতায়াত আছে এখানে।

আবার তাঁবুতে ঢুকে পড়তে যাচ্ছিল কিশোর, বাদ সাধল রাফি।

ওদেরকে দেখে ফেলল লোকগুলো।

'এই পিটার, কি বলেছিলাম?' বলে উঠল একজন। 'বলেছিলাম না, দ্বীপে লোক আছে। ইস্, কি ভুলটাই যে করলাম...'

'আমাদের পরিকল্পনা গড়বড় করে দেবে, তাই না?' জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে অন্য লোকটা।

মানুষের কথা আর রাফির চেঁচামেচিতে জেগে গেল অন্যেরা। বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে।

'কিছুই হবে না,' প্রথমজন বলল। 'কয়েকটা ছেলে-মেয়ে পিকনিক করতে এসেছে। ওরা আর কি করবে।'

গোয়েন্দাদের পাত্তাই দিল না লোকগুলো। হেঁটে চলে গেল। এভাবে অবহেলা সহ্য হলো না কিশোরের। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই শোনেন, আপনারা কে?'

পরস্পরের দিকে তাকাল লোক দু'জন। তারপর হাসিতে ফেটে পড়ল। পিটার যে লোকটার নাম, সে কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'কে, তা দিয়ে তোমাদের কি?'

'না, এমনি জিজ্ঞেস করলাম আরকি...'

'ডাকাতি-টাকাতি হয় তো,' ফস করে বোকার মত বলে বসল মুসা, 'তাই জানতে চেয়েছে আপনাদের পরিচয়।'

মুহূর্তে বদলে গেল লোকগুলোর ভাবভঙ্গি। গটমট করে এগিয়ে এল একজন, খপ করে হাত চেপে ধরল কিশোরের। 'এই, কি জানো...'

এর বেশি আর বলতে পারল না লোকটা। কিশোরকে আক্রান্ত দেখে রেগে গেল রাফি। চোখের পলকে লাফিয়ে উঠে হাত কামড়ে ধরল লোকটার। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল সে। কামড় ছাড়াতে বেশ কষ্ট হলো তার। তারপর রাফির কলার চেপে ধরে তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বেঁধে ফেলল একটা গাছের সঙ্গে। এমন ভাবে বাঁধল, গলায় ভীষণ চাপ লাগছে, দম নিতেই কষ্ট হচ্ছে কুকুরটার। নড়াচড়া তো দূরের কথা, চিৎকারই করতে পারছে না।

'শয়তান!' রাগে চেঁচিয়ে উঠে লোকটার ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জিনা। তাকে ধরে ফেলল দ্বিতীয় লোকটা। টেনে সরিয়ে নিয়ে, পকেট থেকে আরেকটা দড়ি বের করে রাফির পাশে একই গাছে বাঁধল তাকেও। সাহায্য করতে এগোল মুসা, রবিন আর কিশোর। লোক দুটোর সঙ্গে পারল না। ভীষণ শক্তি ওদের গায়ে। তিন গোয়েন্দাকেও ধরে বেঁধে ফেলল।

বার কয়েক টানাটানি করেই চুপ হয়ে গেল কিশোর। লাভ হবে না। এভাবে দড়ি খুলতে পারবে না। রাগে ফুঁসতে লাগল সে। বাকি ক'জনও খোলার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল।

কিশোর, জিনা আর মুসাকে গাছের সঙ্গে বেঁধেছে ওরা। বাঁধার পর দড়ি শেষ হয়ে গেছে দেখে তাঁবুর একটা দড়ি খুলে নিয়ে এসেছে। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে রবিনকে বেঁধে ফেলে রেখেছে কিশোরের পায়ের কাছে।

'অ্যাবি, চলো,' পিটার বলল তার সঙ্গীকে। 'আর কেউ নেই এখানে।

আমার দেরি দেখলে টম আবার চিন্তায় পড়ে যাবে। নৌকা নিয়ে সেই কখন থেকে বসে আছে। সোনাগুলো ভালয় ভালয় নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি।'

ধক্ করে উঠল কিশোরের বুক। সোনা! তাহলে এরাই সেই ব্যাংক ডাকাত, সোনার বার চুরি করেছে যারা।

দুর্গে গিয়ে ঢুকল পিটার আর অ্যাবি। তারমানে নিশ্চয়ই মাটির তলার ঘরেই সোনাগুলো রেখেছে। অনেক সেলার, অর্থাৎ পাতালঘর রয়েছে দুর্গটায়, দেখেছে কিশোর। তারই কোন একটাতে রেখেছে হয়তো। ইস্, কি বোকামিটাই না করল! বাইরে কত জায়গায় খুঁজে এল, অথচ ওদের নাকের কাছেই রয়েছে মালগুলো, কল্পনাই করেনি একবারও!

কোঁ কোঁ করছে রাফি। তার দিকে তাকাল কিশোর। ভয় পেয়ে গেল কুকুরটার অবস্থা দেখে। মরেই না যায় দমবন্ধ হয়ে!

হাতে বাঁধা দড়িটা গাছের সঙ্গে ঘষতে শুরু করল সে। যদি ছেঁড়া যায়। চামড়া ছিলে গেল, কিন্তু থামল না সে। বাঁধন খুলতে না পারলে মারা পড়বে রাফি।

চুপ করে রয়েছে মুসা আর রবিন। রাগে, দুঃখে কাঁদতে শুরু করেছে জিনা। কুকুরটার জন্যে। শ্বাস নিতে পারছে না রাফি, ঘড়ঘড় শুরু হয়েছে গলার ভেতর। ঢেউয়ের মৃদু ছলছল আর নিশাচর জীবের হুটোপুটি ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। হঠাৎ উল্লাসে চিৎকার করে উঠল কিশোর। খুলে ফেলেছে এক হাতের বাঁধন।

ছয়

অন্য হাতের বাঁধন খোলার চেষ্টা করল না কিশোর। পাশে কাত হয়ে খোলা হাতটা বাড়াল রাফির দড়ির দিকে। ওটাই আগে খোলা দরকার। নাগাল পাওয়া গেল। আঙুল দিয়ে খুঁটতে আরম্ভ করল সে। খুলে গেল গিঁট। টান কমে যেতেই একেবারে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল রাফি। হাঁপাচ্ছে। ব্যথা করছে গলা। শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে।

হঠাৎ শোনা গেল ভারী পায়ের শব্দ। ফিরে আসছে ডাকাতেরা।

'শ্‌শ্‌শ্!' হুঁশিয়ার করল কিশোর। 'নড়বি না!'

ভয় পাচ্ছে সে। এসে কুকুরটাকে ছাড়া দেখলে হয়তো খুনই করে ফেলবে লোকগুলো।

কিন্তু গোয়েন্দাদের কথা যেন বেমালুম ভুলে গেছে ওরা। ফিরেও তাকাল না। ধরাধরি করে ভারী একটা কনটেইনার নিয়ে চলে গেল খানিক দূর দিয়ে। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল খাঁড়িতে।

'আবার আসবে,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'একটাতে হবে না। ওরকম আরও দুটো কনটেইনার লাগবে সব সোনা নিতে।'

ঠিকই আন্দাজ করেছে সে। ফিরে এল ডাকাতেরা। এবারও দু'জনই এসেছে, তবে এবার পিটারের বদলে টম এসেছে। মব একবার টমের বদলে বোলান ডেকে ফেলল তাকে। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল টম, 'এই চুপ চুপ, ওই নামে ডাকবে না! ভুলে যাও কেন!'

আর কোন সন্দেহ থাকল না কিশোরের, এরাই সেই ব্যাংক ডাকাত। ছদ্মনাম রেখেছে। বাড়তি সতর্কতা। লোকে শুনলে যাতে সন্দেহ না করে।

এক এক করে তিনটে কনটেইনারই নিয়ে যাওয়া হলো। নিশ্চয় খাঁড়িতে অপেক্ষা করছে ওদের নৌকা। তাতে নিয়ে গিয়ে তুলছে কনটেইনারগুলো। তৃতীয় পাত্রটা নেয়ার পর আর ফিরল না কেউ। একটু পরে পানিতে দাঁড় ফেলার শব্দ হলো। নিঃশব্দে কাজ সারতে চেয়েছে ওরা, তাই মোটর বোটের বদলে নৌকা নিয়ে এসেছে।

আরেক হাতের বাঁধন খোলায় মন দিয়েছে কিশোর। খুলতে সময় লাগল না। পকেট থেকে পেননাইফ বের করে সঙ্গীদের বাঁধন কেটে দিতে লাগল।

'জলদি এসো!' ফিসফিস করে বলল সে। 'ব্যাটাদের পিছু নেব।'

'পাজামা পরেই যাব?' রবিন বলল। এই পোশাকে বেরোনোটা উচিত হবে কি না বুঝতে পারছে না সে।

'কি হবে?' মুসা বলল। 'ট্র্যাক সুটের চেয়ে খারাপটা কি? গরম-টরম ভালই আছে, ঠাণ্ডা লাগবে না। তবে হ্যাঁ, স্যান্ডাল পরতেই হবে।'

মিনিট দুই পরে নৌকাটাকে ঠেলে পানিতে নামাল কিশোর আর মুসা। রবিন ততক্ষণে একটা উলের স্কার্ফ জড়িয়ে দিয়েছে রাফির গলায়। বেচারা কুকুরটার এমনিতেই খুব কষ্ট হচ্ছে, ঠাণ্ডা লাগলে আরও খারাপ হয়ে যাবে।

'ভাবিসনে, রাফি,' রাগ করে বলল কিশোর, 'এর জন্যে শাস্তি পেতে হবে ব্যাটাদের। ছাড়ব না আমি।'

জিনা তাকিয়ে রয়েছে সাগরের দিকে। ডাকাতদের নৌকাটা দেখা যাচ্ছে এখনও। সাগরের মাঝে অনেক দূর চলে গেছে। সোজা এগিয়ে যাচ্ছে মূল ভূখণ্ডের দিকে।

'জোরে জোরে বাও,' নির্দেশ দিল কিশোর।

তরতর করে এগিয়ে চলেছে নৌকা। গলুইয়ের কাছে হাল ধরে বসেছে কিশোর। রাফি দাঁড়িয়ে রয়েছে তার কাছেই। জিনা আর মুসা দাঁড় বাইছে। রবিন তাকিয়ে রয়েছে ডাকাতদের নৌকাটার দিকে। একবারের জন্যেও চোখ সরাচ্ছে না ওটার ওপর থেকে।

'জোরে, আরও জোরে!' তাগাদা দিল কিশোর। 'শব্দ করবে না। ওরা যেন শুনে না ফেলে। বুঝতে না পারে পিছু নেয়া হয়েছে।'

তীরে পৌঁছে গেল ডাকাতদের নৌকা। তীরে নেমে কনটেইনার নামাতে কিছুটা সময় লাগল ওদের। এই সময়ের মাঝে গোয়েন্দারাও তীরে নৌকা ভিড়িয়ে ফেলল, ডাকাতদের নৌকাটা থেকে সামান্য দূরে। ওদের এখনও দেখতে পায়নি ডাকাতেরা। ভাবেসাবে অন্তত তা-ই মনে হচ্ছে।

'কি করব এখন?' মুসার প্রশ্ন। 'ওদের সঙ্গে লাগতে গেলে লাভ হবে

না। পারব না।'

'চলো, আরও এগোই,' কিশোর বলল। 'কার-টার কিছু একটা নিশ্চয় আছে কাছাকাছি। নম্বরটা নিতে পারি কিনা দেখি...'

পা টিপে টিপে এসে রাস্তায় উঠল ওরা। সৈকতের পাশ দিয়ে চলে গেছে পথটা। গলার ব্যথা ভুলে গেছে রাফি, উত্তেজনায়। নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে কিশোরের পাশে পাশে। মিনিট দেড়েক পরে থেমে গেল ওরা। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ভ্যানগাড়ি। আলো নেভানো। সোনা ভর্তি কনটেইনারগুলো ওটাতে তুলছে ডাকাতেরা।

'এহ্‌হে,' জিভ টাকরায় ঠেকিয়ে চুকচুক শব্দ করল মুসা, 'দেরি করে ফেললাম! আরেকটু আগে এলে টায়ার থেকে হাওয়া বের করে দেয়া যেত। তারপর...'

'চুপ!' তাকে থামিয়ে দিল কিশোর। 'এখন আর ওসব ভেবে লাভ নেই, পুলিশকে ফোন করা দরকার। এসো।'

ভ্যানের দরজা বন্ধ করছে ডাকাতেরা। সামনের সীটে গিয়ে উঠল তিনজনেই। স্টার্ট নিল ইঞ্জিন। চলতে শুরু করল ভ্যান। রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল গোবেল বীচের উত্তরে।

দৌড় দিল ছেলে-মেয়েরা। যেন অলিম্পিক জেতার জন্যে বাজি ধরেছে। মোড়ের কাছে একটা চায়ের দোকানে টেলিফোন আছে। ওখান থেকে ফোন করবে পুলিশকে। এসে দেখল ঘুমিয়ে পড়েছে দোকানদার। অনেক ডাকাডাকি করে তাকে তুলতে হলো।

দোকানের মালিক এক মহিলা। সবে শুয়েছিল। কাঁচা ঘুম ভাঙায় রেগে গেল। তাকে বোঝাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো ছেলে-মেয়েদের।

যা-ই হোক, ফোনটা পাওয়া গেল অবশেষে। একটা মুহূর্ত আর দেরি করল না কিশোর। থানায় ফোন করে শেরিফকে চাইল।

আরেকবার চেকপোস্টকে সতর্ক করলেন শেরিফ।

আর কিছু করার নেই। এরপর কি করবে তা নিয়ে তর্ক শুরু হলো। জিনা বলল দ্বীপে ফিরে যাবে। মুসা বলল, তাহলে আর ঘুমানোর সময় পাবে না বেশিক্ষণ। তার চেয়ে গোবেল বীচ কটেজেই ফিরে যাওয়া যাক।

'দরকারটা কি আর ঘুমানোর আজকে?' কিশোর ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করতে চায় না। তার চেয়ে থানায় গিয়ে দেখতে চায় কতটা কি করতে পারল পুলিশ।

'তাহলে কি করবে?' জিনা জানতে চাইল।

'ঘরে গিয়ে কাপড়গুলো পাল্টে চলো থানায় চলে যাই,' কিশোর বলল। 'কি করে দেখি। ডাকাতগুলো তো ধরা পড়বেই আজকে। আর পালাতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'ঠিক আছে, চলো।'

থানায় এসে যখন পৌঁছুল ওরা, আলো ফুটতে শুরু করেছে তখন। ভোরের বেশি বাকি নেই। ডিউটিরত কনস্টেবলকে অনুরোধ করল কিশোর,

ডাকাতদের খবর জানার জন্যে থানায় অপেক্ষা করতে চায় ওরা। রাজি হলো কনস্টেবল।

সময় যেন স্থির হয়ে আছে। কাটতেই চাইছে না। কিশোরের পায়ের কাছে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে রাফি। অনেক সুস্থ বোধ করছে এখন সে।

হঠাৎ বাজল টেলিফোন। শেরিফ করেছেন। একটা চেকপোস্টে আটক করা হয়েছে তিন ডাকাতকে, গ্রেফতার করা হয়েছে। নিয়ে আসা হচ্ছে থানায়। কিশোর আর তার বন্ধুরা আছে শুনে খুশি হলেন তিনি। কনস্টেবলকে বললেন ওদের যেন থাকতে বলা হয়। কথা আছে।

থাকতে কোন আপত্তি নেই কিশোরের, বরং এটাই চায় সে। কিন্তু কথা আছে শুনে অবাকই হলো। কি কথা আছে? কনস্টেবলকে জিজ্ঞেস না করে পারল না, 'আমাদেরকে কি জিজ্ঞেস করবেন শেরিফ? চোরাই মাল সহ ধরা পড়েছে ডাকাতেরা। ওই সোনার বারই ওদের জেলে পোরার জন্যে যথেষ্ট।'

'তা ঠিক,' কনস্টেবল বলল। 'তবে শেরিফের কথায় মনে হলো, সোনাগুলো পাওয়া যায়নি।'

প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো গোয়েন্দারা। বলে কি?

শেরিফ এসে নিশ্চিত করলেন যে সত্যিই পাওয়া যায়নি সোনাগুলো। ধরে নিয়ে এসেছেন ডিক, মব আর বোলানকে। ছেলে-মেয়েদের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসল ওরা।

'ফোনে তোমাদের কথা শুনে অবিশ্বাস করিনি,' শেরিফ বললেন। 'কিন্তু সত্যটা মেনে নিতেই হবে আমাকে। এই লোকগুলো জেল খেটেছিল। এদেরকেই ডাকাত বলে সন্দেহ করেছি আমরা। এখনও যে করছি না তা নয়। কিন্তু একটা সোনার বারও পাওয়া যায়নি ভ্যানের ভেতরে। ডাকাতিটা যে ওরাই করেছে, প্রমাণ করব কিভাবে?'

'আর অকারণে আমাদের আটকে রাখারও কোন অধিকার নেই আপনার,' ডিক বলল। 'ইয়ট চুরি করেছিলাম, তার শাস্তিও পেয়েছি। জেলে মেয়াদ শেষ করেই বেরিয়েছি আমরা। আমাদের বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগ নেই পুলিশের। আজ রাতের কথা যদি বলেন, তো সত্যিই গিয়েছিলাম সাগরের ধারে। এতদিন জেল খেটেছি, বেরোতে পারিনি কোথাও। এ রকম একটা রাতে যদি একটু খোলা হাওয়া খেতেই গিয়ে থাকি, অন্যায়টা কি করলাম? আপনি হলেও যেতেন না-কি?'

কিছুই মাথায় ঢুকছে না কিশোরের। মুসা আর জিনা রেগে গেছে ডাকাতদের ওপর। এমনকি রবিনও। কি মিথ্যুক রে বাবা!

সোনাগুলো না পেয়ে হতাশ সবাই হয়েছে। পুলিশ, গোয়েন্দারা, সবাই। কিন্তু ডাকাতেরা যেন দিলদরিয়া মেজাজে রয়েছে। কিছুই করার নেই পুলিশের, ছেড়ে দেয়া ছাড়া।

হাসতে হাসতে থানা থেকে বেরিয়ে গেল তিন ডাকাত।

পুলিশকে অনেক কথাই বলল গোয়েন্দারা। কিন্তু শেরিফ কিছু করতে পারলেন না। একটা সোনার বারও যদি পাওয়া যেত ভ্যানে, কেস খাড়া করে

ফেলতে পারতেন তিনি।

নিরাশ হয়ে মুখ কালো করে বাড়ি ফিরল ছেলে-মেয়েরা।

'পুলিশ কিছু করতে পারল না বটে, আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে দিব্যি বেরিয়ে গেল ডাকাতেরা, ঠিক,' কিশোর ভাবল। 'কিন্তু আমি ছাড়ব না ওদের। যেভাবেই হোক, হাতে হাতকড়া পরাবই।'

কিছু খাবার-দাবার নিয়ে আবার দ্বীপে ফিরে এল ছেলে-মেয়েরা। বার বার সাবধান করে দিয়েছেন কেরি আন্টি, সতর্ক থাকে যেন ওরা। আর যেন লাগতে না যায় ডাকাতদের সঙ্গে। অযথা বিপদ না বাধায়। তাঁর কাছে তো হুঁ-হাঁ করে এসেছে ওরা, তবে ভাবছে অন্য কথা। ব্যাটাদের পাকড়াও করবেই করবে।

রোদে বসে গরম গরম ডিম আর মাংস ভাজা দিয়ে নাস্তা সারল। তারপর বসল জরুরী আলোচনায়।

কিশোর বলল, 'নিজের চোখে দেখেছি কনটেইনারগুলো নিয়ে যেতে। আবার লুকিয়ে ফেলেছে ব্যাটারা। এবারও বেশি দূর নিয়ে যেতে পারেনি। একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেলাম, তীরের মাটিতেই কোথাও রেখেছে ওগুলো, দ্বীপে-টীপে নয়। ডাঙায় গিয়ে খুঁজব আমরা। লোকের সঙ্গে কথা বলব। কোন না কোন সূত্র বেরিয়ে যাবেই। মোট কথা এর শেষ দেখে ছাড়ব আমি।'

তার কথার প্রতিবাদ করল না কেউ।

গোবেল বীচ আর তার আশপাশের এলাকার একটা ম্যাপ বের করা হলো। পেন্সিল দিয়ে দেখিয়ে দিল মুসা, তীরে কোন জায়গায় উঠেছিল ডাকাতেরা। ভ্যানটা কোথায় ছিল, তারপর কোনদিকে গেছে। কোন চেকপোস্টের কাছে ডাকাতদের ধরেছে পুলিশ, তা-ও দেখাল। শেরিফের কাছেই শুনেছে জায়গাটার নাম, ম্যাপে বের করতে অসুবিধে হলো না।

'এখান থেকে খোঁজা শুরু করব আমরা,' কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'কি বলো?'

চুপ করে রইল কিশোর। ভাবছে।

জিনা বলল, 'অত বড় তিনটে কনটেইনার লুকিয়ে রাখা সহজ না। জায়গাটা নিশ্চয় বড়। ছোট জায়গায় আঁটবে না।'

সেদিন থেকে খোঁজা শুরু হলো।

তার পর থেকে প্রতিদিনই সকালে নৌকা নিয়ে মূল ভূখণ্ডে চলে আসে গোয়েন্দারা। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। গোবেল বীচের কাছাকাছি ছোট-বড় যত রাস্তা আছে, সবগুলোতে ঢোকে, লোকজনের সঙ্গে কথা বলে। রাস্তা আর পাশের সন্দেহজনক কোন জায়গাই বাদ দেয় না। সোনা লুকিয়ে রাখা যায়, এমন জায়গা তো বটেই; যায় না, এ রকম জায়গায়ও খুঁজে দেখা হয়। কোথায় আছে, বলা যায় না কিছুই। কিন্তু সোনার বারের চিহ্নও কোথাও মেলে না।

'খোঁজ চালিয়েই যেতে হবে আমাদের,' হাল ছাড়ার পাত্র নয় কিশোর। 'যে কোন সময় লুটের মাল নেয়ার জন্যে এসে হাজির হতে পারে

ডাকাতেরা। তখন যাতে ওদের মিস না করি। হাত ফসকে আরেকবার বেরিয়ে গেলেই গেল। সোনাগুলো বের করে নিয়ে যাওয়ার সময় ধরতে হবে। এবার আর শুধু খবর দিয়েই ক্ষান্ত হব না, প্রমাণ নিয়ে হাজির হব পুলিশের কাছে।'

সাত

কিশোরের আশা, ডাকাতদের গন্ধ পেয়ে যাবে রাফি। কিন্তু চলার সময় মাটি শুঁকে শুঁকে চললেও তা পেল না কুকুরটা। সব ধরনের জায়গায় খুঁজছে ওরা। পুরনো বাড়ি, পরিত্যক্ত গোলাঘর, মাঠের মধ্যে নিঃসঙ্গ কুঁড়ে, পাহাড়ের গুহা যা যা চোখে পড়ল কিছুই বাদ দিল না।

একদিন গাছের তলায় লাঞ্চ খেতে বসেছে ওরা, হঠাৎ বলে উঠল জিনা, 'ওই দেখো, টবি। ওর কথাই বলেছি তোমাদেরকে। খেতে ডাকি। আহারে বেচারা! ভাল খাওয়া কপালে খুব কমই জোটে।'

ছেলেটার পরিচয় দিল জিনা। সহজ সরল গাঁয়ের ছেলে, বনের ভেতর থাকে। কেউ জানে না তার আসল বয়েস কত। গাঁয়ের লোকে আদর করে তাকে ডাকে কালা টবি। অথচ কানটান তার ভালই আছে, শোনেও আর সবার মতই ভাল। তবু যে কেন এই নামটা হয়ে গেল তার, তা-ও কেউ বলতে পারে না। নানা রকম কাজ করে খাওয়ার পয়সা জোগাড় করে। যা করে মন দিয়ে করে, ফাঁকি দেয় না, সে-জন্যে মানুষ পছন্দ করে তাকে।

টবি জিনার বন্ধু। দেখা হলেই তাকে কিছু না কিছু দেয়। মিষ্টি, কেক, কিংবা যে কোন ভাল খাবার।

'এই, টবি,' হাত নেড়ে ডাকল জিনা, 'শুনে যাও।'

কাছে এল ছেলেটা। হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কি?'

'বসো। খাও।'

কোন কথা না বলে খেতে বসে পড়ল টবি। ঘাসের ওপর কাপড় বিছিয়ে তাতে নানা রকম খাবার সাজানো হয়েছে। বাড়ি থেকে দিয়ে দিয়েছেন কেরি আন্টি। মাংসের রোল, মুরগির রোস্ট, টমেটোর সালাদ, কয়েক রকমের ফল, আর রুটি।

একটা প্লেটে খাবার ভর্তি করে টবির দিকে বাড়িয়ে দিল জিনা। 'নাও, খাও।'

'দা-দা-দ্দাও,' প্লেটটা নিতে নিতে বলল টবি। 'এদেরকে চি-চি-চিনলাম না। তোমার ব-ব-বন্ধু নাকি?'

ছেলেটার নাম তোতলা টবি না রেখে কেন যে কালা টবি রাখা হলো, রবিনও বুঝতে পারল না। তবে সে ওরকম কোন নাম রাখারই পক্ষপাতি নয়। মানুষকে কটাক্ষ করাকে ঘৃণা করে সে।

মাথা ঝাঁকাল জিনা। 'হ্যাঁ, বন্ধু। বেড়াতে এসেছে। ও কিশোর। ও রবিন। এ হলো মুসা। আর আমাদের রাফিকে তো চেনই।'

নিজের নাম শুনে কান খাড়া করল রাফি। টবির দিকে তাকিয়ে কি বুঝল কে জানে, ঘাউ করে ছোট্ট একটা ডাক ছাড়ল। বোধহয় তার ভাষায় স্বাগত জানাল অতিথিকে।

সবার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল টবি। পেটে হাত বুলিয়ে বলল, 'আজ মনে হচ্ছে ভ-ভ-ভ-ভরবে।'

তার কথার ধরনে সবাই হাসল।

খেতে পারে বটে টবি। দ্রুত হাত চালাচ্ছে। তার খাওয়া দেখে মুসাও না হেসে পারল না। 'তুমি দেখি মিয়া আমারও ওস্তাদ।' আরও খাবার তুলে দিল তার প্লেটে। ফলের ঝুড়িটা টবির দিকে ঠেলে দিল রবিন। অর্থাৎ, যত পারো খাও। কিছুক্ষণের জন্যে সোনা খোঁজার কথা ভুলে গেল কিশোর। তাকিয়ে তাকিয়ে টবির খাওয়া দেখছে। রাফিও বোধহয় মজা পেয়েছে। সবার চারপাশে এক চক্কর দিয়ে ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল ছেলেটার কাছে। তার গলা চুলকে দিল টবি।

'তা আজকাল কি করছ, টবি?' জিনা জিজ্ঞেস করল।

'জি-জি-জি-জিনিস বানাচ্ছি,' মুখে খাবার নিয়েই জবাব দিল টবি। 'টাকাও ভা-ভা-ভা-ভালই কামাচ্ছি।'

'ভাল ভাল,' হেসে বলল জিনা। 'তাহলে ধনী হয়ে গেছ তুমি?'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ছেলেটার চোখ। 'হ্যাঁ।'

'তা কি জিনিস বানিয়ে এত ধনী হয়ে গেলে?'

এক কামড়ে অর্ধেকটা আপেল মুখে পুরেছে টবি। চিবিয়ে সেটা গিলে নিয়ে এদিক ওদিক তাকাল। তারপর কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল, 'তোমাদের বলতে কোন অসুবিধে নেই। জিনিস বানিয়ে ধ-ধ-ধ-ধনী হইনি। আগে যেমন পয়সা পেতাম, এখনও তে-তে-তে-তেমনি পাই। ঝু-ঝু-ঝু-ঝুড়িটুরি বানিয়ে আর কত হয় বলো? গু-গু-গু-গুপ্তধন পেয়েছি, আমার কুঁ-কুঁ-কুঁ-কুঁড়েতে।'

জিনা হেসে চোখ টিপল মুসা আর রবিনের দিকে তাকিয়ে। বোঝাতে চাইল ওরকম কথা টবি বলেই থাকে। কিন্তু কিশোরের কেমন যেন সন্দেহ হলো। সরাসরি তাকাল ছেলেটার দিকে। এই একটিবার হয়তো সত্যি কথাই বলছে, কে জানে!

খাওয়া শেষ হলো। জিনিসপত্র সব গোছগাছ করে নেয়ার পর কাপড়টা তুলে ঝাড়া দিল রবিন। পরিষ্কার করে ভাঁজ করে ব্যাগে ভরল।

উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'টবি, চলো তোমার কুঁড়েতে যাব। গুপ্তধন দেখতে। নিয়ে যাবে তো?'

দৃষ্টি বদলে গেল টবির। দ্বিধা ফুটল চোখে। ভাব দেখে মনে হলো বলে ফেলে পস্তাচ্ছে। ব্যাপারটা কিশোরের চোখ এড়াল না। তাড়াতাড়ি বলল সে, 'আমাদের বিশ্বাস করতে পারো, টবি। কাউকে কিচ্ছু বলব না। কেউ তোমার

জিনিস লুট করতে আসবে না। জিনা যেমন বন্ধু তোমার, আমরাও বন্ধু। শুধু দেখব। গুপ্তধন দেখার বড় কৌতূহল আমার, সব সময়ই।'

কিশোরের মনের কথা বুঝে ফেলল জিনা। বলল, 'হ্যাঁ, টবি, কোন অসুবিধে নেই তোমার। এরা খুব ভাল। দেখাবে?'

দ্বিধা কাটল না টবির। তবে আর অরাজিও হলো না। ঘাড় কাত করে বলল, 'চলো।'

আগে আগে চলেছে টবি। পেছনে দল বেঁধে চলল বাকি সবাই।

বনের মাঝে ছোট একটুকরো খোলা জায়গায় টবির কুঁড়ে। এক সময় এক কাঠুরে থাকত ওটাতে। শক্ত শক্ত কাঠ দিয়ে ওই লোকই বানিয়েছে ঘরটা। কিছুই হয়নি ওটা, এখনও আগের মতই রয়েছে। ঠেলে দরজা খুলল টবি। সবাইকে ঢোকার আমন্ত্রণ জানাল।

কেন যেন কিশোরের মনে হচ্ছে, তাদের খোঁজা সফল হয়েছে অবশেষে। টবির ঘরে সোনার বারগুলো লুকানো রয়েছে।

ঘরের এককোণে গিয়ে দাঁড়াল টবি। কিছু লাকড়ি জড়ো করা রয়েছে ওখানে। কয়েকটা লাকড়ি সরিয়ে নিচ থেকে বের করল দুধের খালি একটা টিন। দু'হাতে ধরে তুলে আনল ওটা, এমন ভঙ্গিতে যেন সাত রাজার ধন লুকানো রয়েছে ওটাতে। দাঁত বের করে গর্বের হাসি হাসল। টিনের মুখ খুলে ভেতরে হাত ঢোকাল।

সাংঘাতিক একটা উত্তেজনার মুহূর্ত। চুপ করে তাকিয়ে রয়েছে সবাই। কি বেরোবে টিন থেকে! নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলেছে সবাই, রাফি বাদে। সে অতসব বুঝতে পারছে না। এত ছোট একটা টিনে ক'টা বার আর ধরবে! তবে একটাও যদি পাওয়া যায়, বোঝা যাবে, ঠিক পথেই এগোচ্ছে—ভাবছে চারজনেই।

'এই যে,' হাত বের করে দেখাল টবি। তামার তৈরি একটা দরজার নব।

এক এক করে বের করল সে পুরানো একটা সিগারেট লাইটার, দুটো বোতাম, কাঁচের রঙিন একটা বোতলের ছিপি।

ভীষণ হতাশ হয়েছে গোয়েন্দারা। কিন্তু সেটা প্রকাশ করে টবির মনে কষ্ট দিল না। বরং বলল, জিনিসগুলো দেখে খুব খুশি হয়েছে। এ রকম জিনিসের মালিক হতে পারা নেহায়েতই ভাগ্যের ব্যাপার।

টবিকে গুডবাই জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

বাইরে বেরিয়েই জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'দূর, হলো না! আমি তো ভেবেছিলাম।...একের পর এক পরাজয়! এবার কি কিছু করতে পারব না নাকি?'

'এত নিরাশ হচ্ছ কেন?' জিনা সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল। 'চুনের পুরনো ভাটিটায় তো খোঁজাই হয়নি এখনও। ওই যে, ডুডিংটন সেইন্ট মেরিতে যেটা রয়েছে, বলেছিলাম না একদিন দেখতে যাব? চলো, দেখাও হয়ে যাবে, খোঁজাও হয়ে যাবে। কে জানে, যা খুঁজছি পেয়েও যেতে পারি।'

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ওখানেও কিছু পাওয়া গেল না। এমনকি পাশের পোড়ো দুর্গটাতেও না। যদিও অনেক খোঁজাখুঁজিই করল।

পরের দিন আশপাশের সমস্ত এলাকা চষে বেড়াল ওরা। কিছুই পাওয়া গেল না।

তৃতীয় দিন সকালে গোবেল বীচ কটেজে ফিরে এল। খাবার ফুরিয়ে গেছে। নিয়ে যেতে হবে। ঘরে অনেক কিছুই নেই। ফুরিয়ে গেছে, কেরি আন্টি জানালেন। বাজার থেকে কিনে আনতে হবে।

সেদিন হাটবার।

'বাজারে টবির সঙ্গে দেখা হবে,' জিনা জানাল। 'জিনিসপত্র বানিয়ে বিক্রি করতে আনে সে। নানা রকম টুকটাক কাজ করে দেয় দোকানদারদের। বয়ের কাজ করে। ডিম আর মাখন বিক্রি করতে সাহায্য করে। মোট কথা, এক হপ্তা পেট চালানোর ব্যবস্থা করতে হয় একদিনেই।'

কিন্তু বাজারে এসে টবিকে কোথাও চোখে পড়ল না।

'এমন তো হওয়ার কথা নয়!' জিনা বলল। 'ও আসবেই। কোন হাটবার বাদ দেয় না। তাহলে পরের হপ্তা না খেয়ে থাকতে হবে। অসুখ-টসুখ করল না তো?'

টবিকে নিয়ে অতটা মাথা ঘামাল না কিশোর। কিন্তু জিনা ঘামাচ্ছে। শেষে আর থাকতে না পেরে ফুল বিক্রি করে যে বৃদ্ধা, তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'টবি আসেনি?'

'নাহ্। বিপদ হয়ে গেল। একলা পারি না।'

'এল না কেন?'

'আসবে কি করে? অসুখ তো। আহারে বেচারা! ডাক্তার গিয়েছিল দেখতে। বাগান-টাগান সাফ করে দেয় তো, না গিয়ে পারেনি ডাক্তার। মানবতা বলেও তো একটা কথা আছে। আমি গেছি।' আরও অনেকেই গেছে। খাবার-টাবার দিয়ে এসেছি। কিন্তু সারাক্ষণ তো আর থাকতে পারি না। সেবাযত্ন করার কেউ নেই ছেলেটার।'

টবিকে ভাল লেগেছে রবিনের। মহিলার কথা শুনে খারাপ লাগল। বনের ভেতর কুঁড়েতে একলা পড়ে আছে এত ভাল ছেলেটা, কষ্টই লাগে।

'গিয়ে দেখা দরকার,' প্রস্তাব দিল সে।

'হ্যাঁ,' সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল জিনা। 'আমরা তাকে বন্ধু বলেছি। অবশ্যই যাওয়া উচিত।'

টবিকে দেখতে চলল ওরা।

কুঁড়ের ভেতরে একটা খড়ের গদিতে শুয়ে আছে টবি। খুব বেশি অসুস্থ লাগছে না দেখে।

'এই যে টবি,' জিনা বলল, 'তোমার জন্যে জামের জেলি নিয়ে এসেছি। আর চকলেট। কেকও এনেছি।'

'কিচ্ছু ভেবো না,' রবিন বলল। 'ভাল হয়ে যাবে'। প্রথমেই নজর পড়ল টবির বিছানাটার ওপর। বলল, 'তুমি একটু ওই টুলটায় বসো তো। বিছানাটা

ঠিক করে দিই। বেশিক্ষণ লাগবে না।'

উদ্বেগ দেখা দিল টবির চোখে। মনে হলো প্রতিবাদ করবে। কিন্তু করল না। মুসার বাড়িয়ে দেয়া চকলেটটা নিয়ে নেমে এল বিছানা থেকে। গদির ওপর বিছানো কম্বলটা তুলে নিয়ে গেল মুসা আর কিশোর, ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে আনার জন্যে।

'আহারে, একটা চাদরও নেই,' মুসা বলল। 'ম্যাট্রেসটারও অবস্থা দেখো। খোঁচা লাগে নিশ্চয়ই। উল্টে দিয়ে দেখা যেতে পারে।'

চৌকি-টৌকি নেই। মাটিতেই ম্যাট্রেস পাতা। সেটা তোলার জন্যে যেই হাত বাড়িয়েছে দু'জনে, হাঁ হাঁ করে উঠল টবি। লাফ দিয়ে এল থামানোর জন্যে। 'না না, ধ-ধ-ধ-ধধরো না ওটা!'

'কি ব্যাপার?' অবাক হয়েছে মুসা। 'তোমার এই জিনিস কেউ নেবে না। আমরা ঠিক করে বিছিয়ে দিচ্ছি শুধু...' বলতে বলতেই গদির একমাথা উঁচু করে ফেলল, টবি বাধা দেয়ার আগেই। আরেক মাথা তুলেছে কিশোর।

দেখে ফেলল নিচে কি আছে। পাথরের মূর্তি হয়ে গেল দু'জনে।

জিনা আর রবিনও দেখেছে। মেঝেতে একটা গর্ত, নতুন খোঁড়া হয়েছে। তার ওপরই রাখা ছিল টবির ম্যাট্রেস। নিচে গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে তিনটে কনটেইনার। ওপরটা মেঝের সমান উঁচু, ফলে ম্যাট্রেস দেবে যায়নি। বোঝাও যায়নি ওপর থেকে কিছু।

এই আবিষ্কারে এতই ধাক্কা খেয়েছে কিশোর, টবির মত তোতলাতে লাগল, 'সো-সো-সোনার বার!'

মুসার হাত থেকে ম্যাট্রেসটা টেনে নিয়ে মাটিতে ফেলল টবি। তারপর এগোল কিশোরের দিকটা নামানোর জন্যে। বলল, 'তি-তি-তিনজন লোক আমাকে কিছু না বলতে বলেছে। অনেক টা-টা-টা-কা দিয়েছে ওরা। ভা-ভা-ভা-ভাল লোক। বলেছে পাহারা দিতে। আরও টা-টা-টা-টাকা দেবে। কি-কি-কিন্তু যদি কিছু হয়, আমার হা-হা-হাত ভেঙে দেবে বলেছে।'

পরস্পরের দিকে তাকাল গোয়েন্দারা। তাদের খোঁজা সফল হয়েছে। যখন ওরা প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছিল, ঠিক তখনই।

ভেবেচিন্তে পরিকল্পনাটা করেছে ডাকাতেরা। চমৎকার একটা বুদ্ধি বের করেছে। নিজেদের ঘাড় বাঁচিয়েছে টবির ঘাড়ে বোঝাটা চাপিয়ে দিয়ে। লুকানোও হলো জিনিসগুলো, পুলিশের নজরেও পড়বে না। অসুস্থ টবিকে দেখতে আসে লোকে। তাদের নজরে কিছুই পড়ে না। যে কুঁড়েতে সচরাচর লোক যাতায়াত করছে, সেটার দিকে ফিরেও তাকাবে না পুলিশ। কেউ ভাবতেই পারবে না ম্যাট্রেসের তলায় সোনার বার লুকানো রয়েছে।

কিশোর বলল, 'যাক, হয়ে গেল কাজ! এখন শুধু পুলিশকে গিয়ে বলা। কুঁড়ের চারপাশে লুকিয়ে থাকবে ওরা। ডাকাতেরা এলেই ক্যাঁক করে ধরবে।'

ম্যাট্রেসের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ল টবি। ভয় পাচ্ছে সে। কিন্তু আর কিছু করার নেই। কিশোরেরা যদি বলে দেয়ই কি করবে সে? আটকাতে তো আর

পারবে না। সে-অনুরোধ করলও না। মিনমিন করে শুধু বলল, 'লোকগুলো আমাকে খুব মারবে!'

'না, মারতে পারবে না,' অভয় দিয়ে বলল কিশোর। 'তার আগেই পুলিশ এসে যাবে।'

সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে দরজার দিকে সবে পা বাড়িয়েছে সে, এই সময় চেঁচাতে শুরু করল রাফি।

'কথা শুনতে পাচ্ছি!' ফিসফিসিয়ে বলল মুসা।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল তিনজন লোক। ডিক, মব আর বোলান। ছেলেমেয়েদেরকে দেখে যেমন অবাক হলো, তেমনি রেগে গেল।

'আবার তোমরা!' গর্জন করে উঠল মব।

রাফির কলার টেনে ধরে রাখল কিশোর। নইলে আবার কামড়াতে যাবে কুকুরটা, এবার হয়তো তাকে গুলি করেই মারবে ডাকাতেরা।

আতঙ্কে থর থর করে কাঁপছে টবি, ককিয়ে উঠল, 'আ-আমি কি-কি-কিছু করিনি! দে-দে-দে-দেখাইনি! ক-ক-ক-কসম…!'

আট

কথাটা বলেই সর্বনাশ করল টবি। গোয়েন্দারাও যে জানে, সেটা বুঝিয়ে দিল ডাকাতগুলোকে। ছোট ঘর। দরজা আটকে দাঁড়িয়েছে ডাকাতেরা। একজন ওখানেই রইল, অন্য দু'জন ওদেরকে ধরার জন্যে এগিয়ে এল। ধরে ফেলল মুসা আর কিশোরকে। রাফিকে লাথি মেরে সরিয়ে দিল দরজায় দাঁড়ানো লোকটা, তারপর কলার চেপে ধরল যাতে কামড়াতে না পারে। টবিকে এখন যা যা করতে বলা হলো, মারের ভয়ে তা-ই করল সে। দড়ি এনে দিল। বাঁধতে সাহায্য করল গোয়েন্দাদেরকে। একটা দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে একসাথে বাঁধা হলো চারজনকে। তারপর পুরনো ভারী একটা গোসলের পানি রাখার গামলা উল্টে ঢেকে দিল রাফিকে। ওটা সরিয়ে ভেতর থেকে বেরোনোর সাধ্য নেই কুকুরটার।

এরপরও সাহায্য করতে হলো টবিকে। ম্যাট্রেস সরিয়ে কনটেইনারগুলো একটা ঠেলাগাড়িতে তোলা হলো। ঠেলে ঠেলে কাছেই কোথাও নিয়ে যাবে হয়তো, যেখানে গাড়ি রেখে এসেছে। হয়তো রাস্তায়ই রয়েছে গাড়িটা।

রাগে ফুলছে কিশোর। বার বার এভাবে পরাজিত হয়ে রাগ বেড়ে যাচ্ছে তার। ডাকাতদের ওপর তো বটেই, নিজের ওপরও।

ফিরে এল ডাকাতেরা। ঠেলে টবিকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে পাল্লা লাগিয়ে দিল। একটু পরেই ভারী হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগল দরজায়।

'দরজায় তক্তা লাগিয়ে আমাদের পালানোর পথ বন্ধ করে দিচ্ছে,' মুসা বলল।

ঘরটা হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যেতে জানালার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'জানালাও লাগিয়ে দিচ্ছে!'

নীরব হয়ে গেল বাইরেটা। ডাকাতেরা চলে গেছে। আর কোন শব্দ নেই। ভয় পেয়েছে রবিন। সেটা চাপা দেয়ার চেষ্টা করে টবিকে অনুরোধ করল বাঁধন খুলে দিতে। কিন্তু এতই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ছেলেটা, রবিনের কথাই যেন বুঝতে পারল না। এককোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে বিড়বিড় করে আনমনে কি সব বলছে।

মোড়ামুড়ি করে, আরও নানারকম কায়দা কসরৎ করে দড়িটা খুলতে পারল ছেলেরা। টবির সাহায্য ছাড়াই। মুক্ত হয়েই ছুটে গিয়ে গামলা সরিয়ে রাফিকে বের করল আগে জিনা।

'এর জন্যে পস্তাতে হবে ব্যাটাদের!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে। 'কিছুতেই ছাড়ব না আমি!'

নেতিয়ে পড়া রাফিকে যখন চাঙা করতে ব্যস্ত জিনা; তিন গোয়েন্দা তখন দরজা খোলার চেষ্টা করতে লাগল। লাভ হলো না।

ভয়ে কাঁপতে থাকা টবিকে বোঝাতে বসল রবিন।

'ভয় নেই, টবি,' কোমল গলায় বলল সে। 'ওরা খারাপ লোক বটে, তবে তোমার গুপ্তধন নিয়ে যাবে না। ওগুলো ওদের দরকার নেই। এখন যখন মারেনি, আর মারবেও না। এখান থেকে বেরিয়েই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব তোমাকে। কিংবা খবর দিয়ে নিয়ে আসব এখানে।'

'যদি বেরোতে পারি!' বিড়বিড় করে মুসা আর জিনাকে সাহায্য করতে এগোল কিশোর। 'খোলা অত সহজ না। পেরেক মেরে তক্তা লাগিয়েছে। ঠেলাঠেলি করে লাভ হবে না। দরজাও খুলবে না, জানালাও না।'

ঘরের ম্লান আলোয় খুঁজতে লাগল ওরা, এমন কিছু, যেটা দিয়ে দরজা কিংবা জানালার পাল্লা ভাঙা যায়। কিন্তু পাওয়া গেল শুধু একটা কয়লা খোঁচানোর সরু শিক, ওটা দিয়ে মোটা কাঠের পাল্লার কিছু করা যাবে না।

'দূর!' রাগ করে শিকটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মুসা। 'চাপ দিতে গেলে বাঁকা হয়ে যাবে!'

'এক মিনিট,' মাটি থেকে শিকটা আবার তুলে নিল কিশোর। একটা বুদ্ধি এসেছে। 'দরজার নিচের মাটি খুঁচিয়ে তুলে ফেলতে পারি আমরা। ফোকর-টোকর করতে পারলে বেরোনো যাবে। অনেক বইতে পড়েছি সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বেরিয়ে যায় বন্দিরা।'

'চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে,' বিশেষ আশা করতে পারছে না জিনা।

দরজার নিচের মাটি খোঁচাতে আরম্ভ করল কিশোর। মাটি নরম। সহজেই খোঁড়া যাচ্ছে। এইবার ভরসা পেল জিনা। সে আর মুসা এসে হাত দিয়েই খুঁড়তে লাগল যতটা পারল। মাটিগুলো সরিয়ে নিয়ে ঘরের কোণে ফেলতে লাগল রবিন। হঠাৎ লাফিয়ে এসে ধাক্কা দিয়ে কিশোরকে সরিয়ে

দিল রাফি। তারপর পা দিয়ে মাটি আঁচড়াতে শুরু করল।

হেসে উঠল কিশোর। 'বা রাফি, বাহ্! সাহায্য করছিস, কর্। আরেকটু সরে কর্। আমাকেও কাজ করতে দে।'

'ঘাউ!' করে কিশোরের সঙ্গে একমত হল রাফি। সরে গেল খানিকটা।

'দুনিয়ার সবচেয়ে বুদ্ধিমান কুকুর তুই, রাফি। গুড বয়। হাত চালা।'

অন্যেরাও মজা পেল। হেসে জিজ্ঞেস করল জিনা, 'কুকুরের আবার হাত কোথায়?'

'ওই হলো। পা দিয়েই যখন হাতের কাজ করতে পারছে, এখন ওগুলোই হাত। হাঁ করে থাকিসনে রাফি, কাজ কর্।'

সবাই হাসছে। হাসিটা সংক্রমিত হলো টবির মাঝেও। বিষণ্নতা কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

রাফি যেন বুঝে ফেলল তাকে নিয়েই মজা করছে সবাই। দ্বিগুণ উদ্যমে কাজ করতে লাগল সে। কিছুক্ষণ মাটি আঁচড়ানোর পর সরে এল দরজার কাছ থেকে। আনন্দে ছোট ছোট ডাক ছেড়ে লাফালাফি জুড়ে দিল। কারও হাত, কারও মুখ চেটে দিয়ে ফিরে এসে আবার মাটি আঁচড়াতে শুরু করল।

কয়েক মিনিট কাজ করেই থেমে গেল সে। কিশোরের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

'কি রে? এত তাড়াতাড়িই কাহিল হয়ে গেলি?'

জবাবে ফ্যালফ্যাল করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল রাফি।

ব্যাপার কি? নুয়ে গর্তের ভেতরে তাকাল কিশোর। 'হায় হায়! পাথর!'

'তার মানে মরলাম!' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল মুসা।

'না, অত সহজে হাল ছাড়ছি না। পাশ দিয়ে খুঁড়ে বের করব সুড়ঙ্গ। আমরা বেরোতে না পারলেও রাফি যাতে পারে।'

'তাতে লাভটা কি হবে? আমরা তো আর বেরোতে পারছি না।'

'হবে, নিশ্চয় হবে!' রবিন বলল। কিশোরের মাথায় কি ভাবনা চলেছে, বুঝে ফেলেছে। 'মেসেজ ঝুলিয়ে দেব ওর গলায়। জিনাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে সেটা ও।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'সোজা গোবেল বীচ কটেজে চলে যাবে। আমাদের উদ্ধার করতে চলে আসবেন পারকার আঙ্কেল।'

এরপর সব কিছু কিশোরের পরিকল্পনা মাফিকই ঘটল। কলারে মেসেজ বেঁধে দেয়া হল রাফির। সরু সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। পাশে আরেকটা পাথর থাকায় ফোকরটা বড় করা সম্ভব হলো না, ফলে ছেলেমেয়েরা কেউ বেরোতে পারল না।

মুহূর্তের জন্যে থামল না রাফি। দু'মাইল পথ পেরিয়ে সোজা কটেজে চলে এল।

কেরি আন্টি ওকে দেখতে পেলেন। কলারে বাঁধা কাগজটাও চোখে পড়ল তাঁর। খুলে নিয়ে পড়েই ভয় পেয়ে গেলেন। কাগজটা নিয়ে গেলেন স্বামীর কাছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে ফোন করলেন পারকার আঙ্কেল। তারপর

গাড়িতে করে রাফিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ছেলেমেয়েদেরকে মুক্ত করে আনতে।

তিনি কুঁড়েতে পৌঁছানোর একটু পরেই পুলিশও এসে হাজির হলো।

পুলিশকে সব কথা জানাল ছেলেমেয়েরা। মুক্তি পেয়েও খুশি হতে পারছে না। কারণ সফল হয়নি ওরা, আবার ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে গেছে ডাকাতেরা। আর কিছুক্ষণ সময় পেলেই অবশ্য হাতে হাতকড়া পরাতে পারত।

তবে শেরিফ ওদেরকে উৎসাহই দিলেন। ওরা সত্যি বলছে না মিথ্যে বলছে এটা নিয়ে একটা সন্দেহ ছিল তাঁর, এখন সেটা একেবারেই নেই। ম্যাট্রেসের নিচে গর্ত, কনটেইনারের দাগ, টবির স্বীকারোক্তি আর ছেলেমেয়েদের কুঁড়েতে আটকে থাকা প্রমাণ করে দেয় যে, এখানে লুকানো ছিল সোনাগুলো। ডাকাতেরা আবার তুলে নিয়ে গেছে।

'চলো, জলদি বাড়ি চলো,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন পারকার আঙ্কেল। 'তোমার আন্টি খুব অস্থির হয়ে আছে। দেরি করলে আবার নিজেই চলে আসবে।'

বাড়িতে ফিরে কেরি আন্টিকে চিন্তামুক্ত করে বাগানে বেরোল ছেলেমেয়েরা। মন খারাপ হয়ে গেছে। পুলিশ কিভাবে ডাকাতদের তল্লাশি চালাচ্ছে সেটা না জেনে দ্বীপে ফিরে যেতেও ইচ্ছে করছে না ওদের। কটেজেই রাতের খাওয়া সেরে ঘুমাতে গেল।

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলেও গম্ভীর হয়েই রইল ওরা।

'মনে হয়,' কিশোর বলল, 'এবার আমরা ফেলই করলাম! ধরতে আর পারলাম না ডাকাতদের! মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেছে আমার!'

এই সময় বাজল টেলিফোন।

ধরলেন পারকার আঙ্কেল। ওপাশের কথা শুনে যখন ফিরে এলেন, তখন তাঁর সদা গম্ভীর মুখে হাসির ঝিলিক। 'গুড নিউজ,' স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদেরকে বললেন তিনি। 'শেরিফ বলেছে, ডাকাতদের গাড়িটা নাকি পাওয়া গেছে। ডাকাতগুলোকেও ধরেছে।'

'হুররে!' বলে চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'ধরা শেষ পর্যন্ত পড়ল! আমরাই জিতলাম!'

'কোথায় পেল?' জিনা জিজ্ঞেস করল।

'হাসপাতালে।'

'হাসপাতালে! ওখানে কি করতে গেছে?'

'চিকিৎসা করাতে। অ্যাক্সিডেন্ট। একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়েছে ডিক। বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিল, কে যেন দেখতে পেয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেছে ওদেরকে। পুলিশ খোঁজ পেয়ে গিয়ে ওখানেই অ্যারেস্ট করেছে।'

হাসি ফুটল মুসার মুখে। ওদেরকে টবির ঘরে আটকে রাখার কথাটা মনে পড়ল তার। বলল, 'ভাল হয়েছে। আচ্ছা শিক্ষা হয়েছে। কম জ্বালান জ্বালিয়েছে আমাদেরকে! এখন বুঝুক মজা।'

'তবে সোনাগুলো উদ্ধার করা যায়নি,' আঙ্কেল বললেন। 'আবার সরিয়ে ফেলেছে। গাড়িতে পাওয়া যায়নি।'

'তাই!' হাসি মুছে গেল আবার মুসার মুখ থেকে। 'তারমানে প্রমাণ করা যাচ্ছে না যে ওরা অপরাধী!'

হাত তুললেন পারকার আঙ্কেল। 'সবটা শোনো আগে। তিনজনের মধ্যে সব চেয়ে বেশি ব্যথা পেয়েছে মব। গায়ে ভীষণ জ্বর। আবোল-তাবোল বকছে। সারাক্ষণ একজন পুলিশ পাহারা দিচ্ছে হাসপাতালে, ওদের ঘরে। সব শুনে ফেলেছে সে। প্রলাপ বকতে গিয়ে সোনার কথা ফাঁস করে দিয়েছে মব।'

'তাই নাকি?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকল রবিন। 'কি বলল?'

'বলেছে দুই বছর আগে সে আর তার দুই সঙ্গী ব্যাংকে ডাকাতি করেছে। প্রলাপের ঘোরে বলে দিয়েছে এ কথা। তারপর...'

'ডিক ওদের সর্দার,' পারকার আঙ্কেল কথা শেষ করার আগেই বলে উঠল কিশোর। 'ডাকাতির প্ল্যান সে-ই করেছে। ডাকাতি করার পর, জাহাজটা চুরি করে। তাতে করে সোনার বারগুলো নিয়ে পালাতে গিয়ে ঝড়ের কবলে পড়ে। জাহাজ ডুবে গেলে নৌকা নিয়ে ভেসে পড়ে সাগরে। সেখান থেকে তুলে এনে জেলে ভরা হয়।'

'ঠিকই তো আন্দাজ করতে পারছ,' কৌতূহলী হয়ে বললেন আঙ্কেল। 'তারপর কি হলো, বলো তো?'

'বলছি। সাগর থেকে তুলে এনে বারগুলো প্রথমে দ্বীপে লুকাল। ওখান থেকে সরিয়ে এনে রাখল টবির কুঁড়েতে। ওখান থেকেও বের করে নিয়ে গেল। একটু ভাবলেই বোঝা যায়, সব কিছুই প্ল্যান করে করছে ওরা। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে একটু একটু করে সরিয়ে নিয়ে গেছে সোনাগুলো।'

মুসা বলল, 'অ্যাক্সিডেন্টের আগেই নিশ্চয় লুকিয়ে ফেলেছে কনটেইনারগুলো। একবার খুঁজে বের করেছি নেহায়েত কাকতালীয় ভাবে। আরেকবার সম্ভব না। কাকতালীয় ঘটনা বার বার ঘটে না।'

'না ঘটুক,' হার মানতে রাজি নয় জিনা, 'খুঁজেই বের করব আমরা। আবার খুঁজতে বেরোব। এখন সহজ হয়ে গেছে কাজ। ডাকাতগুলো আটক রয়েছে। আমাদের কিছু করতে আসতে পারবে না।'

'ঠিক!' টেবিলে চাপড় মারল কিশোর। উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে চোখ।

রেডিওতে মিউজিক হচ্ছিল, শেষ হয়ে গেল। খবর পাঠ করার ঘোষণা দিল ঘোষক। শুরু হলো খবর। জরুরী কয়েকটা রাজনৈতিক সংবাদের পরই ডাকাতদের কথা বলল সংবাদ পাঠক। যেন কিশোরের উৎসাহকে আরও বাড়িয়ে দিতেই পড়ে চলল সে: একটা মেসেজ প্রচার করতে আমাদেরকে অনুরোধ জানিয়েছে ব্যাঙ্ক। ডাকাতদের ধরতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ, কিন্তু সোনার বারগুলো এখনও উদ্ধার করতে পারেনি। কিছুতেই মুখ খোলানো

যাচ্ছে না ডাকাতদের। কোথায় লুকিয়েছে বলছে না। পুলিশ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যাঙ্ক ঘোষণা করেছে, যে বের করে দিতে পারবে, তাকে পঁচিশ হাজার ডলার পুরস্কার দেয়া হবে।'

'এত টাকা!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার।

'তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের!' উত্তেজনায় গলা কাঁপছে রবিনের। 'পুলিশের আগেই সোনাগুলো বের করে ফেলতে হবে!'

'পঁচিশ হাজার ডলার!' জোরে বলতে যেন সাহস পাচ্ছে না জিনা। 'অনেক টাকা।'

'হ্যাঁ,' কিশোরের চোখ চকচক করছে। 'অনেক কিছু কেনা যায়! তবে মানুষকে সাহায্যও করা যায়। বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যায়।'

'তা যায়,' একমত হলেন কেরি আন্টি। 'তোমরা কাকে করতে চাও?'

'আপাতত টবিকে। ওর যা অবস্থা! খেতেও পায় না। একটা ভাল ঘর বানিয়ে দেয়া হবে ওকে। জামা-কাপড় আর খাবারের ব্যবস্থা করা হবে। তারপর যাতে ইস্কুলে ভর্তি হতে পারে, তারও ব্যবস্থা হবে। এই, কি বলো তোমরা?' মতামতের জন্যে বন্ধুদের দিকে তাকাল কিশোর।

'চমৎকার আইডিয়া,' জিনা বলল।

'দারুণ,' বলল মুসা।

'খুব ভাল,' রবিনের মতামত।

'ঘাউ!' জানিয়ে দিল রাফি।

খুব খুশি হলেন পারকার আঙ্কেল আর কেরি আন্টি। এ রকম ছেলেমেয়েকে ভাল না বেসে পারা যায় না। লোভের ছিটেফোঁটাও নেই কারও মধ্যে।

কিন্তু কথা হলো, পুরস্কারটা পাবে তো ওরা?

নয়

আবার নতুন উদ্যমে গুপ্তধন খোঁজার পরিকল্পনায় বসল গোয়েন্দারা। তবে খুঁজতে বেরোনোর আগে টবির সঙ্গে দেখা করা দরকার মনে করল। ছেলেটা অসুস্থ। তার অসুখ আরও বেড়ে গেল কিনা, আগের দিনের ধকল কাটিয়ে উঠতে পারল কিনা, জানা প্রয়োজন।

'আমাদের প্ল্যানের কথা অবশ্যই বলা হবে না এখন তাকে,' মুসা বলল। 'বাড়ি বানানোর কথাটা। শেষে যদি সোনাগুলো না পাই, খুব হতাশ হবে বেচারা। আগে থেকে না জানানোই ভাল।'

'হবে না,' কিশোর বলল। 'কারণ বিফল হবই না আমরা।'

বনের দিকে সাইকেল চালিয়ে চলেছে ওরা।

কুঁড়েতে পৌঁছে দেখল, টবি ভালই আছে। অসুখ অনেক সেরে গেছে।

বিছানায় বসে তার 'গুপ্তধনগুলো' নেড়েচেড়ে দেখছে। তার জন্যে অনেক উপহার নিয়ে এসেছে গোয়েন্দারা। কাঁচের সুন্দর রঙিন মারবেল এনেছে মুসা। রবিন এনেছে চকলেট। কিশোর একটা বাঁশি। আর জিনা তার আব্বার পুরনো একটা হাতঘড়ি চেয়ে এনেছে আম্মার কাছ থেকে। ঘড়িটা এখনও চালু, তবে পরেন না পারকার আঙ্কেল।

এতগুলো উপহার পেয়ে ভীষণ খুশি হলো টবি। নাচতে শুরু করল।

তার সঙ্গে যোগ দিল রাফি। গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ করছে।

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল বাকি সবাই। চলল কিছুক্ষণ। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল রাফি। ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেছে। নিমেষে ভাবভঙ্গি পাল্টে গেছে তার। চাপা গলায় গরগর করে উঠল। নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকে হাঁচি দিল একবার। কুকুরটা যেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে তাকিয়ে কিশোর দেখতে পেল ময়লা একটা লাল-সাদা রুমাল।

'ডিকের রুমাল!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'ওটা দিয়ে কপাল মুছতে দেখেছি, কাল যখন কনটেইনারগুলো বের করে নিয়ে যাচ্ছিল। নিশ্চয় পড়ে গেছে।'

'গুড,' বেশ সন্তুষ্ট মনে হলো কিশোরকে। 'কাজে লাগবে আমাদের। গন্ধ শুঁকে শুঁকে যেতে পারবে এখন রাফি।'

'গন্ধ শুঁকে কি বের করবে?' জিনা ভুরু কোঁচকাল। 'ডাকাতদের? কিন্তু ওদেরকে আর লাগবে না এখন আমাদের। কোথায় আছে জানি।'

'বুঝলে না,' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল কিশোর। 'ডাকাতদের খুঁজতে যাব কেন? বলেছি, গন্ধ শুঁকে যেতে পারবে এখন।'

'তাতে তফাৎটা কি হলো?'

'হলো না?' রবিন বুঝে ফেলেছে। 'ডাকাতদের গন্ধ শুঁকে এগিয়ে যাব আমরা। সেই জায়গাটার খোঁজ পেয়ে যেতে পারি যেখানে সোনাগুলো লুকিয়ে রেখেছে ওরা।'

'খাইছে!' মুসা বলল। 'এটা তো ভাবিনি!'

কিন্তু খুশি হতে পারল না জিনা। 'ভুলে যাচ্ছ সবাই, পায়ে হেঁটে যায়নি ডাকাতেরা। গাড়িতে করে গেছে। কি করে খুঁজে বের করবে রাফি?'

'ঘাউ! ঘাউ!'

হাসল কিশোর। জিনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই যে, তোমার জবাব দিয়ে দিয়েছে। ও মনে করিয়ে দিতে চাইছে, কুঁড়ে থেকে হেঁটে বেরিয়েছে ডাকাতেরা, একটা ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে গেছে কনটেইনারগুলো। ওরা যেখানে থেমে মালগুলো গাড়িতে তুলেছে সেখানেই পাওয়া যাবে আমাদের প্রথম সূত্র, তারপর...'

বাধা দিল উত্তেজিত মুসা, 'কথা বলে অহেতুক সময় নষ্ট। পুরস্কারের কথা শুনে নিশ্চয় এতক্ষণে খোঁজা শুরু করে দিয়েছে অনেকে। আয় রাফি, বেরোই। ভাল করে রুমালটা শুঁকে নে, তারপর বের করে ফেল্ দেখি পথটা। শুরু কর্।'

রুমালের এককোণ আলতো করে দু'আঙুলে ধরে বাড়িয়ে ধরেছে মুসা।

ভালমত শুঁকল রাফি। লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। ফিরে তাকিয়ে যেন বলতে চাইল, 'দেরি করছ কেন? এসো।'

নতুন আনা গুপ্তধনের সঙ্গে টরিকে রেখে খুশি মনে কুকুরটার পেছন পেছন বেরিয়ে গেল গোয়েন্দারা।

ধীরে ধীরে এগোচ্ছে রাফি। বার বার মাটিতে নাক নামিয়ে শুঁকছে। এগিয়ে যাচ্ছে কয়েক পা। থামছে। আবার শুঁকছে। আবার এগোচ্ছে।

চলল এমনি করেই।

বুনো পথ ধরে মেইন রোডের দিকে চলেছে রাফি। কুঁড়ে থেকে বেশ দূরে রাস্তাটা। এখনও তেমন আশাবাদী হতে পারছে না জিনা। 'এখানে তো রাফির দরকারই নেই,' বলল সে। 'ঠেলাগাড়ির চাকার দাগই রয়েছে মাটিতে। কিন্তু যখন মেইন রোডে উঠে যাবে? সিমেন্টের মধ্যে দাগও নিশ্চয় পড়েনি। গন্ধ পাওয়াও মুশকিল।'

'দেখাই যাক না কি হয়,' কিশোর বলল।

মেইন রোডে পৌঁছল রাফি। নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকে ঘাউ করে এক হাঁক ছাড়ল। নিরাশ করেনি, বরং আশার বাণীই শোনাল। রাস্তা পেরিয়ে একছুটে নেমে গেল অন্য পাশে। হুড়মুড় করে গিয়ে ঢুকল ঝোপের ভেতরে।

অবাক হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল গোয়েন্দারা।

'হয় রাফি ভুল করেছে,' মুসা বলল। 'নয়তো গাড়িই ব্যবহার করেনি ডাকাতেরা।'

'রাফি কখনও ভুল করে না,' দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল জিনা, 'ভাল করেই জানো।'

'জলদি চলো ওর পেছনে,' তাড়া দিল রবিন। 'তর্ক পরেও করতে পারবে।'

কুকুরটাকে অনুসরণ করে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেল ওরা। অবশেষে একটা খোলা জায়গায় পৌঁছল রাফি।

'আরে, এ-তো দেখি ডুডিংটন অ্যাবি!' বলে উঠল জিনা।

স্থানীয় লোকেরা এই নাম রেখেছে জায়গাটার। খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়েছে। মধ্যযুগে মঠ তৈরি করেছিল এখানে সন্ন্যাসীরা। কয়েকজন প্রত্নতাত্ত্বিক এসে খুঁড়েছেন এখানে। তারপর তাঁদের ফান্ড ফুরিয়ে যাওয়ায় কাজ অসমাপ্ত রেখেই চলে গেছেন। ডুডিংটন সেইন্ট জেমস অ্যাবি বললেই এখানকার সবাই চেনে জায়গাটাকে।

থামল না রাফি। সোজা এগিয়ে চলেছে অ্যাবির পরিত্যক্ত বাগানের দিকে। পিছে পিছে চলল ছেলেমেয়েরা।

দেখে আর চেনার জো নেই এখন বাগানটাকে। বড় বড় গর্ত আর ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছে। আলগা মাটি সব ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে যেখানে সেখানে। কয়েকটা কবর বেরিয়ে রয়েছে গর্তের ভেতর থেকে। সব পাথরে তৈরি।

মাটি থেকে নাক আর তুলছেই না এখন রাফি। শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে গেল একটা কবরের কাছে, কোন এক সন্ন্যাসীর কবর হবে। কাছে গিয়ে

গভীর আগ্রহে শুঁকতে লাগল।

তারপর কিশোরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঘাউ!'

'তুই শিওর?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

জবাবে লেজ নেড়ে আবার বলল রাফি, 'ঘাউ!'

সবাই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এসে দাঁড়াল কবরটার কাছে। আজকালকার কবরের মত নয় ওটা, পুরানো আমলেরগুলো যে রকম হত, সে-রকম। মুখ বন্ধ করা হয়েছে ভারী পাথরের চ্যাপ্টা ফলক দিয়ে। সেটা টেনে তোলার জন্যে মোটা লোহার আঙটা লাগানো রয়েছে। কয়েকজনে চেপে ধরে টান দিয়ে ঢাকনার মত পাথরটা তুলে আনল। তারপর একসঙ্গে ভেতরে উঁকি দিল।

আয়তাকার করে তৈরি করা হয়েছে কবর। নিশ্চয় তার ভেতরে নামিয়ে দেয়া হয়েছিল কফিনে ভরা লাশটা। গভীরতা খুব কম। এখন আর কফিন কিংবা লাশের চিহ্নও নেই। ক্যানভাসের একটা বড় ব্যাগ দেখা গেল।

ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে তর সইছে না মুসার। দ্রুতহাতে ব্যাগের মুখ খুলে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, 'পেয়েছি! পেয়েছি! সোনা! সোনা!'

কারও দিকে নজর নেই রাফির। আরও দুটো কবর শুঁকছে।

সেটা লক্ষ করল কিশোর। দুটো কবরেরই ঢাকনা তোলা হলো। প্রথমটার মতই আরও দুটো ক্যানভাসের ব্যাগ পাওয়া গেল ও দুটোতেও।

তিনটে কনটেইনারে যত সোনার বার ছিল সবই মনে হয় রয়েছে ব্যাগগুলোর মধ্যে।

কবরের চারপাশ ঘিরে নাচতে শুরু করল গোয়েন্দারা। তাদের সঙ্গে যোগ দিল রাফি।

'বাজনা হলে ভাল হত,' হাসতে হাসতে বলল মুসা। 'কিশোর, তোমার গিটারটা নিয়ে আসা উচিত ছিল...দাঁড়াও দাঁড়াও, আছে একটা জিনিস,' বলেই পকেট থেকে রেডিওটা বের করে অন করে দিল।

কিন্তু তখন মিউজিকের সময় নয়। বাজনা বাজল না। তার বদলে শুনতে পেল খবর।

ডাকাতদের কথাই বলছে সংবাদ পাঠক। স্থানীয় এলাকায় বেশ আলোড়ন তুলেছে ওই খবর। কাজেই যতবার সংবাদ পড়ছে ততবারই ডাকাতির কথা কিছু না কিছু বলা হচ্ছেই। আর হবে না-ই বা কেন, এত টাকার সোনা!

ভারী গলায় পড়ছে লোকটা: ...দু'জন ডাকাত পালিয়েছে। তাদের নাম ডিক আর বোলান। হাসপাতালের রুম থেকে পালিয়েছে। এখনও তাদের ধরতে পারেনি পুলিশ...

'সর্বনাশ!' হাসি চলে গেছে রবিনের, কালো হয়ে গেছে মুখ। ভয়ে ভয়ে তাকাল চারপাশে। 'বেরিয়েই প্রথমে এখানে চলে আসবে ওরা!'

সাংঘাতিক উত্তেজনাময় একটা মুহূর্ত আরেকবার চারপাশে তাকাল রবিন। মুসাও উৎকণ্ঠিত। একটা কবরকে এমনভাবে আগলে দাঁড়াল, যেন

রক্ষা করতে চায় সোনাগুলো। জিনা জোর করে ভয় তাড়ানোর চেষ্টা করছে মন থেকে। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার চেষ্টা করছে। শান্ত রয়েছে কিশোর। এ সব মুহূর্তে মাথা ঠাণ্ডা রাখার আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে তার। নীরবে নিচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে। প্রচণ্ড গতিতে মগজে ভাবনা চলছে তার। সিদ্ধান্তে পৌছুতে চাইছে।

চুপ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাফি। নাচাকুদা বাদ পরিবেশ যে হঠাৎ করে বদলে গেছে এটা না বোঝার মত বোকা নয় সে।

'ভয় পেয়ে মাথা গরম করলে চলবে না,' অবশেষে মুখ খুলল কিশোর 'পুরো পরিস্থিতিটা ভেবে দেখা যাক। সোনাগুলো রয়েছে এখানে। রাফির কল্যাণে পেয়েছি বটে, তবে এখনও ব্যাঙ্ককে জানাতে পারিনি, পুরস্কারও হাতে আসেনি। এত কষ্ট করে সোনাগুলো খুঁজে পেয়েছি। কোনমতেই আর নিতে দেব না ডাকাতদের।'

'দেয়ার তো ইচ্ছে নেই,' মুসা বলল। 'কিন্তু এসে যদি কেড়ে নেয়? কি করব? যে কোন সময় এসে হাজির হতে পারে। আমরা যেমন দিতে চাই না, ওরাও হারাতে চায় না।'

'অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলা দরকার,' পরামর্শ দিল জিনা।

'পারা যাবে না,' রবিন বলল। 'গাড়ি লাগবে। গাঁয়ে গিয়ে গাড়ি আনতে অনেক সময় লাগবে। ততক্ষণে এসে তুলে নিয়ে যাবে ডাকাতেরা।'

'ঠিকই বলেছ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর। 'একটাই উপায় আছে। এখানেই কোথাও লুকিয়ে রাখতে হবে এগুলো। এত ভারী জিনিস বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে। রেখে চলে যাই। গিয়ে পারকার আঙ্কেলকে সহ পুলিশ নিয়ে আসি।'

'কবর থেকে সরিয়ে ফেলতে বলছ?' ভুরু কোঁচকাল মুসা। 'বুদ্ধিটা ভালই। কিন্তু কোথায় লুকাব? এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে খুঁজে পাবে না ডাকাতেরা।'

'ওই ট্রেঞ্চটায় নিয়ে যাব,' হাত তুলে দেখাল কিশোর। 'জলদি হাত লাগাও। কুইক। গর্তে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে রাখব। ডাকাতেরা কল্পনাই করতে পারবে না এত কাছে রেখে গেছি।'

সবাই একমত হলো তার সঙ্গে। আর কিছু করারও নেই।

কাজে লেগে গেল সবাই। ধরাধরি করে ব্যাগগুলো বের করে এনে ফেলল পাশের গভীর ট্রেঞ্চটায়। তারপর মাটি ফেলে ঢেকে দিতে লাগল ওগুলো। যাতে কিছু বোঝা না যায়। সমস্ত চিহ্ন মুছে দিল। দেখে বোঝা যাবে না কিছু লুকানো রয়েছে মাটির তলায়। কাজটা সারতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগল না।

'তিনটে কবরের ঢাকনা লাগানো এখনও বাকি,' মনে করিয়ে দিল কিশোর।

'জলদি করো!' গলা কাঁপছে রবিনের। 'আমার ভয় লাগছে! ডাকাতেরা এসে পড়বে!'

'ভাল আমারও লাগছে না,' স্বীকার করল রবিন। 'রেডিওতে বলেনি কখন পালিয়েছে ডাকাতেরা হাসপাতাল এখান থেকে বেশি দূরে নয়। গাড়ি জোগাড় করতে পারলে এখানে আসতে সময় লাগবে না ওদের।'

'গাড়ি জোগাড় করতেও সময় লাগবে,' যুক্তি দেখাল মুসা। 'টেলিভিশনে নিশ্চয় ওদের দেখানো হয়েছে। খবরের কাগজে ছবি ছেপেছে। দেখলেই লোকে চিনে ফেলবে কাজেই আসতে হলে লুকিয়ে চুরিয়ে আসতে হবে। কেউ গাড়িও ভাড়া দেবে না ওদের কাছে চুরি করতে হবে। তাতে সময় লাগবে।'

মুসার কথায় কিছুটা ভরসা পেল সবাই, তবে অস্বস্তি দূর হলো না। ঢাকনাগুলো লাগাতে ব্যস্ত হলো ওরা। এমন ভাবে লাগাল, যাতে তোলা হয়েছিল বোঝা না যায়।

'যাক, হলো,' হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল কিশোর। 'চলো, গাঁয়ে চলো।'

সবে পা বাড়াতে যাবে কিশোর, তার পথরোধ করল রাফি। চাপা গরগর শুরু করল।

অবাক হলো কিশোর। 'কি হলো রে, রাফি! ওরকম করছিস কেন?'

পা ছেড়ে কিশোরের হাত কামড়ে ধরল কুকুরটা। তারপর টেনে পেছনে সরিয়ে আনতে চাইল।

'গাঁয়ে যেতে বারণ করছে মনে হয়?' মুসাও অবাক হয়েছে রাফির আচরণে।

কিশোরের হাত ছেড়ে দিয়ে আরেক দিকে মাথা ঘুরিয়ে এমন ভঙ্গি করতে লাগল রাফি, যেন বোঝাতে চাইছে, ওদিক দিয়ে গেলে ভাল হয়।

'দেখি, কি করে,' কিশোর বলল।

তার কথা মানতে রাজি হয়েছে, বুঝতে পারল রাফি। একছুটে গিয়ে একটা ঝোপে ঢুকে পড়ল সে সবাই গেল তার পিছু পিছু। ঝোপের ভেতরে ঢুকে দেখল, একটা গাছের গোড়ায় বসে রয়েছে কুকুরটা। ঠিক এই সময় গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল ওদের।

'কেউ আসছে,' জিনা বলল, 'গাঁয়ের দিক থেকে। কানের জোর সাংঘাতিক বেশি তো, আগেই শুনে ফেলেছে কুকুরটা।'

'কিন্তু আমাদের থামাল কেন?' রবিনের প্রশ্ন। 'গাড়ি নিয়ে যে কেউ আসতে পারে। তাতে আমাদের ক্ষতি কি?'

'হয়তো এমন কেউ আসছে,' বিড়বিড় করল কিশোর, 'যাকে আমাদের শত্রু মনে করে রাফি।' পাতার ফাঁক দিয়ে কবরগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।

শিস দিয়ে উঠল মুসা। 'নিশ্চয় ডিক আর রোলান!'

দশ

ঝরঝরে একটা পুরানো ভ্যান এসে থামল কবরের কাছে। দরজা খুলে লাফিয়ে নামল ডিক আর বোলান।

'কবর খুলে সোনার বার নিতে এসেছে,' ফিসফিস করে বলল জিনা।

'কচুটা পাবে,' বুড়ো আঙুল দেখাল মুসা। নীরব হাসিতে ফেটে পড়ছে। 'পাবে শুধু কিছু পুরানো পাথর আর মাটি। নিয়ে গিয়ে বেচুকগে না কোন মিউজিয়ামের কাছে।'

'শ্‌শ্‌শ্‌!' ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে বলল কিশোর। 'ইয়ার্কি মারার সময় নয় এটা। ভাগ্যিস শুনতে পেয়েছিল রাফি। তবে এখনও বিপদ কাটেনি। যেই দেখবে সোনাগুলো নেই, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে ওরা। খুঁজতে শুরু করবে। আমাদের দেখলে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবে। পালানো দরকার।'

'কোথায় যাব?' শঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করল রবিন।

অ্যাবির গির্জাটা দেখাল কিশোর। 'ওখানে। ঘণ্টাঘরে লুকিয়ে থাকব। তবে ওখানেও যদি সোনা খোঁজার কথা ভাবে ব্যাটারা, তাহলেই গেছি।'

'আগেই ওসব ভেবে লাভ নেই,' জিনা সাহস জোগাল। 'টাওয়ারের ওপর থেকে দেখতে পাব, ওরা কি করে। সুযোগ বুঝে আবার সরে পড়ার চেষ্টা করা যাবে।'

নিঃশব্দে পা টিপে টিপে গির্জার দিকে রওনা হলো ওরা। ঝোপের আড়ালে আড়ালে। ঢুকে পড়ল গির্জায়। ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল ওপরে। অ্যাবিতে একমাত্র গির্জাটারই সংস্কার করা হয়েছে। ওপরে উঠে ব্রোঞ্জের চমৎকার ঘণ্টাটা দেখতে পেল ওরা। সাবধানে ছোট জানালা দিয়ে উঁকি দিল মুসা।

'দেখা যাচ্ছে,' নিচু গলায় খবরটা জানাল সে। 'প্রথম কবরটার ঢাকনা তুলছে...তোলো, তোলো, পাবে ঘোড়ার ডিম।'

কিশোর আর জিনা হেসে ফেলল। রবিন চুপ। ভয় লাগছে তার। সোনাগুলো নেই দেখে কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে ডাকাতেরা, সে-কথা ভেবে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না সে।

ঢাকনা তুলল দুই ডাকাত। ভেতরে তাকাল। একটা মুহূর্ত কিছুই ঘটল না। স্তব্ধ নীরবতা। তারপর রাগে ফেটে পড়ল ওরা।

ওদের কণ্ঠস্বর কানে আসছে গোয়েন্দাদের।

'অসম্ভব!' চেঁচিয়ে উঠল ডিক। 'এভাবে গায়েব হতে পারে না! কেউ নিয়ে গেছে! ব্যাটাকে ধরতে পারলে হয়...'

'ভুল কবরে খুঁজছি না তো?' বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েছে

বোলান।

'মনে তো হয় না! দেখি!'

দ্রুত অন্য কবরগুলোর ঢাকনা তুলতে লাগল দু'জনে। একটা করে তোলে, আর গর্জে ওঠে।

সব ক'টা কবরের ঢাকনা তোলা হয়ে গেল। সোনাগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে, এ-ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ রইল না ডাকাতদের।

'নিয়ে গেছে!' চিৎকার করে উঠল ডিক। 'চোরের ওপর বাটপাড়ি! করলটা কে?'

'ওই বিচ্ছুগুলো!' চেঁচিয়ে বলল বোলান। 'শুরু থেকেই আমাদের পেছনে লেগে রয়েছে। নিয়ে তবে ছাড়ল। এত শয়তান ছেলেমেয়ে জীবনে দেখিনি আমি!'

'কারও জানার কথা নয়, কোথায় লুকিয়েছি আমরা। ওরাই বা জানল কি করে? সরাল কোথায়?'

'বুঝতে পারছি না। ওরা জেনে থাকলে নিশ্চয় পুলিশও জেনে গেছে এতক্ষণে। কিন্তু তাহলে তো এখানে ওত পেতে থাকার কথা। তা-ও নেই। ঘটনাটা কি?'

'কি জানি, বুঝতে পারছি না! হয়তো নিজেরাই ভাগাভাগি করে নিয়ে নেয়ার তালে রয়েছে। সে-জন্যেই জানায়নি পুলিশকে। ইস্, যদি ধরতে পারতাম এখন...'

আচমকা হউউউ করে উঠল রাফি। না দেখে তার পা মাড়িয়ে দিয়েছে মুসা। ব্যথায় চিৎকার করে উঠেছে কুকুরটা।

ধড়াস ধড়াস শুরু করল ছেলেমেয়েদের বুক। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল সবার। মাপ চাওয়ার ভঙ্গিতে সামনের একটা পা শূন্যে নাচাচ্ছে রাফি। যন্ত্রণা কমছে না যদিও, তবু আর চিৎকার করছে না সে। তবে ক্ষতি যা করার করে ফেলেছে। শুনে ফেলেছে ডাকাতেরা।

'শুনলে?' ডিককে জিজ্ঞেস করল বোলান।

'শুনব না তো কি কালা নাকি আমি! ওপরে কোনখান থেকে এসেছে মনে হলো।'

'কুত্তা! ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটা ছিল। সেটাই নিশ্চয়। ওই ওখানটায় লুকিয়েছে। ব্যাগগুলোও তুলে নিয়ে গেছে।'

'না, অত ভারী ব্যাগ তুলতে পারবে না।'

'তাহলে গির্জায় লুকিয়েছে। চলো না, ধরে ধোলাই দিলেই বলে দেবে।'

গির্জার দিকে দৌড়ে এল দু'জনে।

'ব্যস, মরলাম!' গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে রবিনের। 'আর কিচ্ছু করার নেই!'

'না, মরিনি এখনও,' জিনা বলল। 'জায়গাটা আমি চিনি আগেও এসেছি মাথা ঠাণ্ডা রাখলে বেঁচে যেতে পারব।'

'কিভাবে?' জিজ্ঞেস সরল মুসা।
'ঘণ্টার দড়িটা বেয়ে নেমে যাব।'
'ঠিক! ঠিক বলেছ।' দৌড়ে গিয়ে ঘণ্টাঘরের দরজা লাগিয়ে ছিটকানি তুলে দিল মুসা। 'ওরা এসে খুলতে খুলতে নেমে যাব আমরা। দড়ি বেয়ে একেবারে টাওয়ারের নিচে। তারপর ঝেড়ে দৌড় দেব যেদিকে চোখ যায়। ওরা আসার আগেই অনেক দূরে সরে যাব।'
'হ্যাঁ, তাই করব।'
'ভাল বুদ্ধি বের করেছ, জিনা,' কিশোর বলল। 'সবাই যার যার রুমাল বের করে দু'টুকরো করে ছিঁড়ে হাতে পেঁচিয়ে নাও। দড়ির ঘষায় চামড়া ছিলবে না তাহলে। পারলে পিছলেই নেমে যাব। তাতে সময় কম লাগবে।'
সবাই তার নির্দেশ পালন করল। কিন্তু কিশোর নিজেই তা করল না। অবাক হয়ে জিনা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কেন করছে না সে। এই সময় সিঁড়িতে ডাকাতদের জুতোর শব্দ শুনে আর জিজ্ঞেস করা হলো না।
ঘেউ ঘেউ শুরু করল রাফি।
'এই, জলদি খোলো!' চেঁচিয়ে বলল ডিক। 'ভাল চাও তো খোলো! শুনছ, খোলো!'
'কুইক!' ফিসফিসিয়ে সঙ্গীদেরকে বলল কিশোর, 'নামো। জিনা, তুমি আগে। তারপর রবিন। মুসা সবার শেষে। জলদি!'
'তুমি?' মুসা জিজ্ঞেস করল।
মাথা নাড়ল কিশোর। 'রাফি দড়ি বেয়ে নামতে পারবে না। কাজেই থাকতেই হবে আমাকে। আমরা দু'জনে যতক্ষণ পারি ওদেরকে আটকে রাখব। তোমরা গিয়ে সাহায্য নিয়ে এসো।'
'তোমাকে মেরে ফেলবে!' রবিন বলল। 'চুলোয় যাক সোনা চলে এসো আমাদের সঙ্গে!'
'সোনার কথা ভাবছি না। রাফির কি হবে? যাও তোমরা, আমার কিছু হবে না। জলদি করো!'
দরজায় ধাক্কা পড়তে লাগল। বেশি শক্ত না পাল্লা। ভাঙতে সময় লাগবে না।
জিনা বলল, 'আমিও থাকি। রাফি আমার কুকুর। ওর জন্যে তুমি কেন...'
'আহ্, যাও তো, তর্ক কোরো না!' জিনার হাতটা সরিয়ে দিল কিশোর। 'রাফি আমাদের সবারই কুকুর। বহুবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে সে। ওকে বিপদের মুখে ফেলে পালাতে পারব না। ডাকাতদের ভয় করি না আমি। দেরি না করে জলদি যাও। সাহায্য নিয়ে এসোগে। যাও।'
ঠেলে জিনাকে সরিয়ে দিল কিশোর।
চারকোনা একটা ফোকর করা হয়েছে মেঝেতে, ঘণ্টার ঠিক নিচে। ওটা দিয়ে একেবারে টাওয়ারের নিচে নামিয়ে দেয়া হয়েছে মোটা একটা দড়ি, ঘণ্টার সঙ্গে কায়দা করে বাঁধা। নিচে থেকেই দড়ি টেনে ঘণ্টাটা বাজানো

যায়।

তর্ক করে সময় নষ্ট করার চেয়ে গিয়ে পুলিশ নিয়ে আসা ভাল, বুঝতে পারছে মুসা। কিশোরকে চেনে সে। একবার যখন যাবে না বলেছে, নেয়া যাবে না আর তাকে। জোরাজুরি করে লাভ হবে না। জিনাকে টেনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল দড়ির কাছে।

দড়িটা চেপে ধরে পিছলে নামতে শুরু করল জিনা। টান লেগে ঢং করে উঠল ঘণ্টা। বাজবেই। ঠেকানো যাবে না।

'আওয়াজটা বন্ধ করা যায় না?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল মুসা।

'কি লাভ? ডাকাতেরা জেনে গেছে আমরা এখানে রয়েছি। ঘণ্টার শব্দ শুনলে ওরা ভাববে আমরা সাহায্যের জন্যে বাজাচ্ছি···এই রবিন, যাও।'

'সাবধানে থেকো, কিশোর!'

'থাকব। যাও, জলদি করো।'

জিনার মত করেই দড়িটা চেপে ধরল রবিন। চোখ বন্ধ করে ঝুলে পড়ল দড়িতে।

ঝটকা দিয়ে দিয়ে বাজতে শুরু করল ঘণ্টা। রবিন কিভাবে নামছে সেটা জানিয়ে দিচ্ছে। একটু পর পরই মুঠি শক্ত করে ফেলছে সে, থেমে যাচ্ছে, ঝাঁকুনি লেগে তখন বেজে উঠছে ঘণ্টা।

শেষবারের মত জোরে একবার ঘণ্টা বেজে বুঝিয়ে দিল রবিন নেমে গেছে। এবার মুসার নামার পালা।

অনেক বড় ঘণ্টা। বন্ধ ঘরে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। বন্ধুকে গুডবাই জানিয়ে ঝুলে পড়ল মুসা।

ঢং ঢং করে আরও কয়েকবার বেজে অবশেষে শান্ত হলো ঘণ্টা। ছোট জানালাটা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল কিশোর। গাঁয়ের দিকে ছুটতে শুরু করেছে জিনা, রবিন আর মুসা। দ্রুত সরে যাচ্ছে এই এলাকা থেকে।

মনে ভয় ঢুকতে দিচ্ছে না কিশোর। আসল সময় এসে গেছে ডাকাতদের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে তৈরি হলো সে।

শেষবারের মত ধাক্কা পড়ল দরজায়। কেঁপে উঠে ঝটকা দিয়ে খুলে গেল পাল্লাটা ছুটে ভেতরে ঢুকল দুই ডাকাত।

'মোটে একটা ছেলে!' চেঁচিয়ে উঠল ডিক। 'আর কুত্তাটা আছে! বাকিগুলো গেল কই?'

'ছিল,' জবাব দিল কিশোর। 'তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে রুচি হলো না। তাই চলে গেছে। যাও না, দৌড়ে গেলে এখনও ধরতে পারবে।'

থমকে গেল বোলান। ভেবেছিল ওদেরকে দেখে ভয়েই প্যান্ট নষ্ট করে ফেলবে। কিন্তু পুঁচকে ছেলেটার মুখে এ রকম কথা শুনে বিশ্বাসই করতে পারল না। 'কি বিচ্ছু ছেলে রে বাবা! সব ক'টাই বিচ্ছু! আমি ভাবলাম গাঁয়ের লোককে ডাকছে! ঘণ্টার দড়ি বেয়ে যে পালিয়েছে কল্পনাই করতে পারিনি!'

ভীষণ রেগে গেছে ডিক। বিকৃত করে ফেলেছে চেহারা। ভারী পায়ে এগিয়ে এল কিশোরের কাছে। রাফির কলার ধরে রেখেছে কিশোর। কোমরে হাত দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল লোকটা, 'সোনাগুলো তাহলে তোমরাই সরিয়েছ! ভাল চাও তো বলে ফেলো। বাকিগুলোকে পাইনি, তাতে কিছু এসে যায় না। তোমাকে তো পেয়েছি। বলো, কোথায় রেখেছ। সময় নেই আমাদের হাতে।'

লোকটার চোখে চোখে তাকাল কিশোর। 'ওই সোনা তোমাদের নয়। ব্যাঙ্কের জিনিস ব্যাঙ্কে ফিরে যাবে।'

গোঁ গোঁ শুরু করেছে রাফি। কিশোরের গায়ে লোকটা হাত দিতে এলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে দেয়ার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু কুকুরের পরোয়াই করল না ডিক। এগিয়ে এল এক পা।

ওর কাছে পিস্তল আছে কি না জানে না কিশোর। নিজের জন্যে ভয় পায় না সে, তাকে গুলি করার সাহস হবে না ডাকাতটার মানুষ খুন করে অপরাধ আরও বাড়াতে চাইবে না। এতটা বেপরোয়া নয়, বোঝাই যায়। তবে আক্রান্ত হলে রাফিকে গুলি করতে দ্বিধা করবে না। ভয়টা রাফির জন্যেই। ধমক দিয়ে বলল, 'এই রাফি, চুপ! চুপ থাক!'

কথা শুনল রাফি। চুপ করে বসে পড়ল।

হেসে উঠল বোলান। 'বুদ্ধি আছে দেখা যায়। বেশ, বলে ফেলো এবার দেরি করতে পারব না। না বললে কি করব জানো?'

পকেট থেকে বড় একটা ছুরি বের করল সে বোতাম টিপতেই সড়াৎ করে খুলে গেল লম্বা ফলা। ঝিক করে উঠল।

মরিয়া হয়ে হাসল কিশোর। 'যত ভয়ই দেখাও, মুখ খুলছি না আমি কাটো, গলা কাটো আমার। তাহলে তো মুখ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে সোনার খোঁজ আর কোনদিন বের করতে পারবে না।'

এগারো

প্রাণপণে ছুটছে মুসা, রবিন আর জিনা।

ছুটতে ছুটতে কাহিল হয়ে পড়ল। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। আপনাআপনি কমে গেল গতি। বনের মাঝখানে চলে এসেছে বুঝতে পারছে, কেউ তাদের পিছু নেয়নি স্বস্তি ফিরে এল অনেকটা। তবে কিশোরের জন্যে দুশ্চিন্তা রয়েই গেল

'কিশোরের কি হলো কে জানে!' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল জিনা। 'লোকগুলোর কাছে একা ফেলে রেখে এসে ভাল করিনি। আমরাও থেকে গেলে পারতাম। সোনাগুলো কোথায় রেখেছি বলে দিলেই হত...'

'চল, ফিরে যাই,' মুসা বলল। 'দেখি, সাহায্য করতে পারি কিনা।

পেছন থেকে হামলা চালাব। এখন ওরা দু'জন। হঠাৎ পেছন থেকে আমরা কিছু করে বসলে ঠেকাতে পারবে না।'

'আর যদি পেরে যায়, তাহলে বিপদে পড়ব সবাই। তারচেয়ে আরেক কাজ করা যাক। তুমি আর আমি ফিরে যাই। রবিন চলে যাক গাঁয়ে। পুলিশ নিয়ে আসুক।'

'কিন্তু বনের মধ্যে দিয়ে পথ,' ভরসা পাচ্ছে না রবিন। 'যদি পথ হারাই? বনটা ভালমত চিনি না আমি।'

ভাবনায় পড়ে গেল মুসা আর জিনা। কি করা যায়? সমাধান করে দিল দুটো ছেলেমেয়ে। প্রায় ওদেরই বয়েসী। বনে এসেছে জাম পাড়তে। একটা ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

'এই শোনো,' হাত নেড়ে ডাকল জিনা। 'আমরা একটা বিপদে পড়েছি। সাহায্য করবে?'

হেসে এগিয়ে এল ছেলেটা। সুন্দর চেহারা। জিজ্ঞেস করল, 'কি সাহায্য?'

'বলো আগে করবে কি না?'

'করব। বলো। আমার নাম ফ্রেডি। ও আমার খালাতো বোন, শারলি। কি সাহায্য চাও?'

'আমি জিনা,' হাত বাড়িয়ে দিল জিনা। 'ওরা আমার বন্ধু। মুসা, আর রবিন। রবিনকে ডুডিংটন সেইন্ট জেমস থানায় নিয়ে যেতে পারবে? যেতে যেতে সব বলবে ও। আমরা দেরি করতে পারছি না। ভীষণ তাড়া আছে।'

'এসো,' রবিনের হাত ধরে টান দিল ফ্রেডি।

'সাবধানে থেকো,' জিনা আর মুসাকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে ফ্রেডির সঙ্গে চলল রবিন। শারলিও চলল ওদের সাথে।

'চলো এবার,' মুসাকে বলল জিনা। 'দেখি, কি সাহায্য করা যায় কিশোরকে।'

কয়েক পা এগিয়েই আবার থেমে যেতে হলো ওদেরকে। দেখে, ছুটতে ছুটতে আসছে টবি। কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে, 'ঘ-ঘ-ঘ-ঘণ্টা শুনলাম! কি-কি-কি হয়েছে!' চোখে ভয় তার।

একটা বুদ্ধি এল মুসার মাথায়। বলল, 'টবি, ডাকাতগুলো গিয়ে গির্জার ঘণ্টাঘরে উঠেছে। কিশোরকে মারবে ওরা।'

'কি-কি-কিশোর!'

'হ্যাঁ, কিশোর। সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে রয়েছে। ওকে সাহায্য করবে?'

'ক-ক-করব।'

কি কি করতে হবে খুলে বলল মুসা। তারপর টবি আর জিনাকে নিয়ে চলল গির্জায়। টাওয়ারটা দেখা যেতে টবিকে ইশারা করল সে। জিজ্ঞেস করল, 'কি করতে হবে মনে আছে তো?'

ঘাড় কাত করে সায় জানাল টবি।
'বেশ, আমরা যাচ্ছি।'
গির্জার ভেতরে ঢুকে গেল মুসা আর জিনা।
টাওয়ারের নিচে চলে এল টবি। জোরে ডেকে বলল, 'এই যে, শু-শু-শু-শুনছেন?'
ডাকটা কানে যেতেই জানালার দিকে এগোল ডিক। ছুরিটা নামাল বোলান। সে-ও ফিরল জানালার দিকে। সুযোগটা কাজে লাগাল কিশোর। দৌড় দিল দরজার দিকে। পেছনে রাফি। চোখের পলকে বেরিয়ে এল খোলা দরজা দিয়ে, ডাকাতরা বাধা দেয়ার আগেই। সিঁড়িতে দেখা মুসা আর জিনার সাথে। উঠে আসছে ওরা। মুসার হাতে পুরানো একটা শিক, জিনার হাতে একটা কাঠ।
'যাক, মারামারি আর করতে হলো না,' হাঁপ ছাড়ল মুসা। 'এটাই আশা করেছিলাম। সুযোগ পেলেই পালাবে তুমি, জানতাম। চলো, ভাগি।'
টবির চিৎকারে মুহূর্তের জন্যে নজর অন্যদিকে ফিরিয়েছিল ডাকাতেরা। আবার কিশোরের পেছনে লাগল। তাকে ধরার জন্যে ছুটে এল ওরা।
একেক লাফে দু'তিনটে করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এল গোয়েন্দারা। বাইরে বেরিয়েই টবিকে ডেকে নিয়ে বনের দিকে দিল দৌড়। তেড়ে এল ডাকাতেরা। জোরে দৌড়াতে পারে বটে ওরা, কিন্তু ঝোপেঝাড়ে ছোটদের সঙ্গে পারল না। সুড়ুৎ করে একখান দিয়ে ঢুকে আরেকখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল গোয়েন্দারা, ডাকাতরা পারল না। তবু লেগে রইল। চোখের আড়াল করল না।
গোয়েন্দারাও কম গেল না। যত রকমে পারল, চালাকি করে করে ডাকাতদের হাত এড়িয়ে থাকল। তবে শেষ রক্ষা করতে পারবে কিনা সন্দেহ। টবি ভয় পাচ্ছে। অনেক কষ্টে সঙ্গে সঙ্গে রইল গোয়েন্দাদের।
অবশেষে বুঝতে পারল কিশোর, এভাবে পারা যাবে না। ধরা পড়তেই হবে। তার চেয়ে মুখোমুখি হওয়াই ভাল। নানা রকম বুদ্ধি খেলে যাচ্ছে মগজে। কোনটাই যুতসই মনে হচ্ছে না। ছুটতে ছুটতে শেষে চলে এল অ্যাবির বাগানে। পুরানো একটা কুয়া দেখে দৌড় দিল সেটার দিকে। ওটা থেকে পানি তুলে ব্যবহার করত সাধুরা।
কুয়ার কিনারে এসে থমকে দাঁড়াল মুসা আর জিনা। খানিক দূরে দুটো মরচে পড়া বেলচা পড়ে থাকতে দেখে গিয়ে তুলে নিল। কিশোর একটা শক্ত ডাল কুড়িয়ে নিল। লাঠির মত ব্যবহার করবে। সহজে ধরা দেবে না ডাকাতদের হাতে। এক সারিতে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের সামনে রয়েছে রাফি, বিকট মুখভঙ্গি করে দাঁত খিঁচাচ্ছে ডাকাতদের দিকে চেয়ে।
জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে টবি। ফোঁস ফোঁস করে বাতাস বেরোচ্ছে নাকের ফুটো দিয়ে।
'ধরো, ধরো ওদের!' চিৎকার করে বলল ডিক।
বিশাল শরীর তার। নড়লেই কিলবিল করে ওঠে হাতের পেশি।

কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়েকে পরোয়া করে না সে তা ছাড়া প্রচণ্ড রাগ তাকে দ্বিগুণ বেপরোয়া করে তুলেছে এগিয়ে এল সে

ঝট করে সরে গেল কিশোর।

সোজা ছুটে এল ডিক। একটা পা বাড়িয়ে দিল মুসা এ রকম কিছু আশা করেনি ডিক। পায়ে পা বেধে মাথা নিচু করে উড়ে গিয়ে পড়ল কুয়ার ভেতরে।

বড় শত্রুটাকে এত সহজে কুপোকাৎ করে ফেলে সাহস বেড়ে গেল ওদের। একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল বোলানের ওপর মুসার গলা টিপে ধরল বোলান। ধাঁ করে ওর হাতে এসে লাগল কিশোরের লাঠির বাড়ি পরক্ষণেই আরেক বাড়ি খেল পিঠে, জিনার বেলচার রাফিও কম যায় না পা কামড়ে ধরল। টবি দেখল এইই সুযোগ, পেছন থেকে জাপটে ধরল ডাকাতটাকে।

এভাবে চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে ভড়কে গেল বোলান চেঁচিয়ে ডিককে ডাকতে লাগল, সাহায্য করার জন্যে কিন্তু ডিকের তখন সাহায্য করার মত অবস্থা নেই কুয়ার পানিতে পড়ে আছে তারই এখন সাহায্য দরকার।

কোনও দিকে না তাকিয়ে বোলানকে পিটিয়ে চলল পাঁচজনে যে যে ভাবে পারল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই কাবু করে ফেলল কুয়ার বালতি তোলার দড়ির মাথায় তাকে বেঁধে নামিয়ে দিল কুয়ার নিচে তার সঙ্গীর কাছে।

ওপর থেকে দড়ির আরেকটা মাথা খুলে আলগোছে ভেতরে ছেড়ে দিল মুসা। কুয়ায় পড়ে গেল দড়িটা উঠে আসার পথ বন্ধ হয়ে গেল কারও সাহায্য ছাড়া উঠতে পারবে না আর ডাকাতগুলো

কুয়াতে পানি খুব বেশি না ডিকের কাঁধ পর্যন্ত উঠেছে নিচে তাকিয়ে মুসা বলল, 'থাকো ওখানে পুলিশ আসুক ওরাই তুলবে'

শেষ পর্যন্ত গোয়েন্দাদেরই জয় হলো খুব খুশি ওরা সোনাগুলো যে উদ্ধার করেছে তাই নয়, পালিয়ে আসা ডাকাত দু'জনকেও আটক করেছে এখন ওদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া আর বারগুলো ব্যাঙ্ককে ফেরত দেয়ার অপেক্ষা

অনেক পরিশ্রম করেছে ওখানেই ঘাসের ওপর বসে পড়ল কিশোর তার কোলের ওপর থুতনি রেখে শুয়ে পড়ল রাফি সে ও কম করেনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল কিশোর বলল, 'লক্ষ্মী ছেলে তোর সাহায্য না পেলে আজ কিছুই করতে পারতাম না

জিনা আর মুসাও রাফিকে স্বাগত জানাল।

'তুমিও অনেক করলে, টবি,' কিশোর বলল। 'বসো এর পুরস্কার তুমি পাবে।'

এতক্ষণে হাসি ফুটল টবির মুখে।

কুয়ার পাশে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওদের ফ্রেডির

সাহায্যে থানায় গিয়ে ওখানকার পুলিশকে সব বলল রবিন। ওরা অয়্যারলেসে যোগাযোগ করল গোবেল বীচ থানার সঙ্গে। শেরিফ তখুনি কয়েকজন পুলিশ নিয়ে চলে এলেন ডুডিংটন সেইন্ট জেমসে। ওই থানারও কয়েকজন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন অ্যাবিতে।

পুলিশ দেখে উঠে দাঁড়াল কিশোর। এগিয়ে গিয়ে হেসে বলল শেরিফকে, 'যাক, এলেন তাড়াতাড়িই। রবিন, খুব তাড়াতাড়ি গিয়েছ মনে হয়।'

এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন শেরিফ। জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাকাতগুলো কোথায়? আমাদেরকে আসতে দেখে পালাল বুঝি? তোমরা ভাল আছ?'

'আছি। ডাকাতগুলো পালায়নি, বহাল তবিয়তেই আছে,' হাসল কিশোর।

'মানে?' বুঝতে পারলেন না শেরিফ।

'আটকে ফেলেছি।' হাত তুলে দেখাল মুসা, 'ওই কুয়ার তলায়। ব্যাঙ ধরছে এখন।'

'আর সোনাগুলো রয়েছে ওই ট্রেঞ্চে,' হাত তুলে দেখাল জিনা।

উঁকি দিয়ে গিয়ে কুয়ার তলায় দেখে এলেন শেরিফ। কয়েকজন পুলিশ গিয়ে মাটি সরিয়ে ব্যাগ বের করল।

'কাজই করেছ দেখছি!' বিশ্বাস করতে পারছেন না যেন শেরিফ, কয়েকটা ছেলেমেয়ে এ রকম একটা ব্যাপার ঘটিয়েছে।

শত মুখে প্রশংসা শুরু করে দিল পুলিশ। গর্বে আধ হাত ফুলে গেল গোয়েন্দাদের বুক।

*

সেই বিশেষ দিনটি এল অবশেষে। বলছি সে-কথা, তবে তার আগে কয়েকটা খবর জানিয়ে নিই। ডাকাতদের জেলে ভরেছে পুলিশ। কথামত পুরস্কারের টাকা পরিশোধ করে দিয়েছে ব্যাঙ্ক। তারপর থেকে বাড়ি খুঁজতে আরম্ভ করেছে খুদে গোয়েন্দারা, তাদেরকে এই কাজে সাহায্য করেছেন কেরি আন্টি।

বিশেষ দিন মানে গৃহপ্রবেশের দিন। নতুন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে টবিকে চমকে দিতে চাইল গোয়েন্দারা। বনের ভেতরে তার কুঁড়ে থেকে গিয়ে তাকে নিয়ে এল ওরা, গোবেল বীচে।

চমৎকার একটা কটেজ। বেশি বড় না, ছোটখাট, কিন্তু ছিমছাম, সুন্দর। একেবারে বড় রাস্তার ধারে। সাদা রঙ করা দেয়াল। দরজা-জানালা সবুজ। বাড়ির সামনে ফুলের বাগান। নিজে দোকানে গিয়ে পছন্দ করে আসবাবপত্র কিনে এনে সাজিয়ে দিয়েছেন কেরি আন্টি।

টবির হাত ধরে আগে আগে ভেতরে ঢুকল কিশোর। পেছনে মিছিল করে ঢুকলেন কেরি আন্টি, পারকার আঙ্কেল, জিনা, রবিন, মুসা আর রাফি। পারকার আঙ্কেল আসতে চাননি, এ সব সামাজিক কাজকর্মে বিশেষ আগ্রহ নেই তার, গবেষণায় ব্যস্ত থাকতেই বেশি পছন্দ করেন। জোর করে স্বামীকে

ধরে এনেছেন আন্টি।

'এটা তোমার নতুন বাড়ি, টবি,' কিশোর বলল। 'আমরা তোমাকে উপহার দিলাম। পাশের বাড়িটা কার, জানো নিশ্চয়?'

'জানি। মিসেস কি-কি-কিপলিং।'

'হ্যাঁ, মিসেস কিপলিং। তিনি কেরি আন্টিকে কথা দিয়েছেন, তোমার খাবার রান্না করে দেবেন। তার জন্যে মাসে মাসে অবশ্যই টাকা দিতে হবে। সে-ভাবনাও তোমার নয়। ব্যাঙ্কে তোমার নামে টাকা রেখে দেয়া আছে। ওরাই মাস মাস টাকাটা পাঠিয়ে দেবে মিসেস কিপলিঙের কাছে। কি, কেমন লাগছে?'

হতবাক হয়ে রইল খানিকক্ষণ টবি। তারপর বিড়বিড় করল, 'ভা-ভা-ভাল!'

'ইস্কুলেও যেতে হবে তোমাকে,' মুসা বলল।

'ইস্কুলে!'

'হ্যাঁ। কেন, পারবে না?' হেসে বললেন কেরি আন্টি।

কালো হয়ে গেল টবির মুখ। সোজা রওনা দিল দরজার দিকে।

খপ করে তার হাত ধরে ফেলল কিশোর। 'কি হলো? কোথায় যাচ্ছ?'

শুকনো কণ্ঠে টবি বলল, 'আমার জন্যে অনেক করেছ তোমরা, সে-জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার স্বাধীনতা আমি নষ্ট হতে দেব না।'

'মানে?'

'স্কুলের বন্দি জীবন যাপন করতে আমি রাজি নই। তারচেয়ে আমার বনের জীবনই ভাল। মুক্ত। স্বাধীন।'

'কি বোকার মত কথা বলছ তুমি, টবি? স্কুলে না পড়লে করবেটা কি? সারা জীবন ভবঘুরে, বেকার হয়ে থাকবে নাকি? শোনো, স্কুলে পড়লে তোমার স্বাধীনতা নষ্ট হবে না। তোমার বনের বাড়িটাও থাক। যখনই ছুটি পাবে, ওখানে গিয়ে কাটিয়ে আসবে। আমরাও যাব মাঝে মাঝে, পিকনিক করতে।'

এবার হাসি ফুটল টবির মুখে। 'সত্যিই যাবে?'

'যাব,' কথা দিল কিশোর।

আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় চোখে পানি এসে গেল টবির। 'তোমাদের মত এত ভালমানুষ জীবনে দেখিনি আমি!'

'গৃহপ্রবেশ তো হলো,' জিনা বলল, 'এবার বাকি কাজটা সেরে ফেলা যাক।'

টবি ছাড়া সবাই বুঝতে পারল কাজটা কি। তাকে নিয়ে আসা হলো খাবার ঘরে। সেখানে টেবিলে থরে থরে খাবার জিনিস সাজানো।

হাসি আনন্দের মাঝে শেষ হলো খাওয়া। কর্মতালিকায় এর পরে রয়েছে গানবাজনা। মাউথ অরগান বের করল মুসা। কিশোর হাতে নিল গিটার।

উসখুস করছেন পারকার আঙ্কেল, অনেকক্ষণ থেকেই। আর থাকতে পারলেন না। নিতান্ত বেরসিকের মত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমরা চালিয়ে

যাও। আমি আর থাকতে পারছি না। জরুরী কাজ পড়ে আছে।'

কারও অনুমতির তোয়াক্কা না করেই দরজার দিকে রওনা দিলেন তিনি। তাঁকে এগিয়ে দিতেই যেন পিছে পিছে গেল রাফি। কিন্তু না, এগিয়ে দেয়ার জন্যে নয়। পারকার আঙ্কেল বেরিয়ে গেলে মুখ আর পায়ের সাহায্যে ঠেলে পাল্লাটা ভেজিয়ে দিয়ে ফিরে এল সে। সবার দিকে মুখ করে বসে নির্দেশ দিল, 'ঘাউ!' অর্থাৎ, শুরু করতে পারো এবার।

- : শেষ :-

শ্বাপদের চোখ

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

বিছানায় গড়িয়ে চিত হলো কিশোর। চোখ মেলল। হাত-পা টানটান করতে লাগল ধীরে ধীরে।

ঘাড় ঘোরাল। বিছানার পাশের ঘড়িতে সময় দেখার জন্যে। এখন উঠে পড়লে খানিক ব্যায়াম করে এসে সময়মত স্কুলে পৌঁছানো যাবে কিনা দেখতে চায়।

আরি! চোখ মিটমিট করতে লাগল সে। টেবিলটা নেই ওখানে। এটা তার নিজের বাড়ির বেডরুম নয়।

দ্রুত, অস্থির ভঙ্গিতে ঘুরতে শুরু করল চোখ দুটো। ছাতের রঙ ধূসর। কেমন বিষণ্নতায় ভরা। মনে পড়ল, কোথায় রয়েছে সে।

কি কি ঘটেছিল, মনে পড়ল সব।

চেপে ধরল গায়ে দেয়ার চাদরটার কিনার। একটানে তুলে নিয়ে এসে টেনে দিল মাথার ওপর। গুটি পাকিয়ে গোল হয়ে গেল বলের মত। চুলোয় যাক এই দুনিয়া, মানুষ-জন, সব কিছু। জাহান্নামে যাক।

চাদরের নিচেও চুইয়ে এসে ঢুকছে অ্যান্টিসেপটিকের গন্ধ। কিশোরের মনে হলো এই গন্ধ যেন চিরকালের মত তার নাকে বসে গেছে, কোনদিন সরবে না আর।

বিছানার ধাতব স্প্রিঙের শব্দ হতে লাগল। ঘরের অন্য ছেলেগুলোও বিছানা ছাড়তে শুরু করেছে।

'গুড-মর্নিং, পাগলের গোষ্ঠী!' আপনমনেই হেসে উঠল সে। তিক্ত হাসি।

চটাৎ! চটাৎ! চটাৎ!

শব্দটা কিশোরের চেনা হয়ে গেছে। মোজাইক করা মেঝেতে শক্ত চামড়ার স্যান্ডেল পরে হাঁটছে গার্ড। ও রকম শব্দ এখানে একমাত্র গার্ডরাই করে। বাকি সবাই নরম ধূসর স্যান্ডেল পরে। যেগুলো পরে হাঁটলে কোন শব্দই হয় না প্রায়। হাসপাতালের এই 'মানসিক রোগী' লেখা উইংটাতে শক্ত বা ধারাল কোন জিনিস ব্যবহারের অনুমতি নেই রোগীদের। এমনকি জুতো পরাও নিষেধ।

রুক্ষ চেহারার বদমেজাজী মানুষগুলো গার্ড হলেও ওদেরকে 'গার্ড' বলে ডাকার নিয়ম নেই এখানে।

ডাকতে হবে ব্রাদার গ্রেগ, ব্রাদার লিওন, অর্থাৎ নামের আগে 'ব্রাদার'

শব্দটা যুক্ত করে দিয়ে।

কিন্তু কিশোরকে বাধ্য করতে পারেনি ওরা। সে 'গার্ড' বলেই ডাকে।

'অ্যাই, কিশোর, ওঠো!' বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে খেঁকিয়ে উঠল ব্রাদার গ্রেগ বিশালদেহী কুস্তিগীরের মত শরীর। মাথার লম্বা চুলগুলো পেছনে টেনে নিয়ে গিয়ে ব্যান্ড দিয়ে আটকানো। কুতকুতে চোখ।

কিশোর জানে এই ডাক উপেক্ষা করা যাবে না। চাদরটা ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠতেই হবে তাকে। এই জেল হাসপাতালের আইন বড় কড়া।

বিছানার পাশে দেয়ালে লাগানো ফ্রেমে ঝোলানো রয়েছে রঙ চটা, মলিন একটা তোয়ালে। উঠে বসে হাত বাড়িয়ে টান দিয়ে খুলে আনল সেটা। বিছানা থেকে নেমে জেল হাসপাতালের সরবরাহ করা ধূসর রবারের স্যান্ডেল পায়ে গলাল। তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে দু'হাতে ডলে ডলে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করল চোখ থেকে। পরনে হাসপাতালের দেয়া ঢোলা পোশাক।

'লাইনে দাঁড়াও,' আদেশের সুরে প্রায় ধমকে উঠল ব্রাদার গ্রেগ। দরজার বাইরে গিয়ে সারি দিয়ে দাঁড়াচ্ছে ছেলেরা। ধূসর হলঘরটা থেকে বেরিয়ে এসে কিশোরও দাঁড়িয়ে গেল সারিতে। বাথরুমে যাওয়ার জন্যে।

সারির সঙ্গে শামুকের গতিতে চলতে চলতে পাশের জানালার দিকে তাকাল সে। মোটা শিক লাগানো জানালার ওপাশে কাঁচের শার্সি। তুমুল ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। কাঁচের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে বালতিতে করে পানি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়া হচ্ছে কাঁচের গায়ে। বিকট শব্দে বাজ পড়ল। চমকে গেল কিশোর।

ইস্, যদি বেরিয়ে যেতে পারতাম! মনটা আকুলিবিকুলি করে উঠল তার। এখন বেরোলে মুহূর্তে ভিজে চুপচুপে হয়ে যেতে হবে। শীতে কাঁটা দেবে গা। তবু তো স্বাধীনতা! আহা!

জঘন্য এই বন্দীশালা থেকে ওই ঝড়-বৃষ্টিও অনেক ভাল।

বাথরুমের দরজার মুখে পৌঁছে গেল সে। প্রতিবারে চারজন করে যেতে পারে ভেতরে। চারজনের ব্যবস্থা আছে। কিশোরের পালা এল। গোমড়ামুখো চারটে ছেলের সঙ্গে ভেতরে ঢুকল সে। ওরাও তার মতই পাগল। মানসিক রোগী।

আমাকেও নিশ্চয় ওদের মতই গোমড়ামুখো লাগছে। পাগল তো! ভাবল কিশোর। সব পাগলেরই চেহারার ভঙ্গি এক, তাকানো এক।

বাথরুমে খোলা বাল্‌ব ঝুলছে ছাত থেকে। বেসিনের আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল সে। মুখে পানির ছিটে দিতে দিতে আয়নার দিকে তাকাল।

উঁহু। মোটেও ভাল না। নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মন্তব্য করল সে। ধসে গেছে চেহারা। বড় বড় চোখ দুটোর নিচে কালি। চামড়ার রঙটা সামান্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। দেয়ালের ধূসরতার সঙ্গে মিল আছে।

আর চুলেরই বা কি দশা! ছেঁটে ছোট করে দেয়া হয়েছে। সাবান-শ্যাম্পু, কোন কিছুই ঠিকমত দিতে না পারায় মাত্র তিনদিনেই কেমন বিবর্ণ,

মলিন লাগছে চুলগুলো।

তিন দিন। মাত্র তিন দিন এই দুঃস্বপ্নের জগতের বাসিন্দা হয়েছে সে। মনে হচ্ছে তিন যুগ।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। অভ্যস্ত হতে হবে। যে করেই হোক। মনে হচ্ছে না খুব সহসা ছাড়া পাবে। কতকাল থাকতে হবে কে জানে।

বিচারকের কথাগুলো কানে বাজছে। ওর চাচাকে বলছে, 'পাগল হোক আর যা-ই হোক, খুন করেছে আপনার ভাতিজা। খুন করা ভয়ানক অপরাধ। জামিন দেয়া যাবে না।'

'খুন করা ভয়ানক অপরাধ!' আয়নার দিকে তাকিয়ে আনমনে কথাটার প্রতিধ্বনি করল সে। একটা চিরুনি তুলে নিয়ে চুলে বসাল।

তার পাশের সিংকের ছেলেটা ঝট করে মুখ তুলে তাকাল।

ফিরে তাকাল না কিশোর। চোখের কোণ দিয়ে দেখল। চমৎকার! নিজে নিজে কথা বলা শুরু করেছি তাহলে! ডাক্তারের কথাই বোধহয় ঠিক। এটাই তাহলে হওয়া উচিত আমার সঠিক বাসস্থান।

'জলদি করো না!' দরজার কাছ থেকে ধমকে উঠল ব্রাদার গ্রেগ। 'ডাক্তার সাহেব কি বসে থাকবেন নাকি তোমার জন্যে? বাথরুমেই যদি এতক্ষণ লাগিয়ে দাও, নাস্তা করবে কখন? ডাক্তারের কাছে যাবে কখন?'

ডাক্তার! ডক্টর মনরোর সঙ্গে আরেকবার সিটিং দেবার কথা মনে হতেই নিজের অজান্তে কুঁকড়ে গেল কিশোর। আগের দিনের কথা ভাবল। প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে মাথা ধরে গিয়েছিল তার। অনন্ত জিজ্ঞাসা ডাক্তারের। কি হয়েছিল? কি ভাবছে? কেমন বোধ করছে? উফ্! ভয়াবহ!

গরিলার মত চেহারার ওই নাছোড়বান্দা লোকটার সঙ্গে দ্বিতীয়বার আর কথা বলতে চায় না সে। এত কথার দরকারটা কি? একটা নামই তো যথেষ্ট। ভয়াবহ এক পিশাচীর নাম। ট্রিশ অ্যান্ডারসন।

ট্রিশ!

দুই

গাড়িটা ড্রাইভওয়ে থেকে বের করছেন কিশোরের চাচা রাশেদ পাশা।

'বিদায়, রকি বীচ। ওশনসাইড, আসছি আমরা!' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল কিশোর। গেট পেরিয়ে রাস্তায় নামল গাড়ি। পেছনে তাকিয়ে রইল সে। ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে ওদের বাড়িটা।

ঝাড়া মেরে পা থেকে স্যান্ডেল খুলে নিয়ে আরাম করে পিঠ এলিয়ে দিল চেয়ারে। তার ডানে বসা বাচ্চা দুটোর দিকে তাকিয়ে হাসল। মেরিচাচীর

ভাইয়ের ছেলে-মেয়ে। মেরিচাচীর ভাই মিস্টার হোমার একজন সরকারী উকিল।

ফুফুর দায়িত্বে ছেলে-মেয়ে দুটোকে রেখে ছুটিতে ইয়োরোপে বেড়াতে গেছেন ওদের বাবা-মা। ছেলেটার নাম এরিক বয়েস আট বছর মেয়েটা বেকি। বয়েস পাঁচ।

পচা গরম পড়েছে। মুহূর্তে ঘেমে আঠা হয়ে যায় শরীর।

'চাচা, এয়ারকুলারটা ছেড়ে দাও,' কিশোর বলল

'চালুই তো আছে,' মেরিচাচী জানালেন।

'কই, টের পাচ্ছি না তো,' গোঁ-গোঁ করে বলল এরিক

'আমি পাচ্ছি। আমার শীত লাগছে।' হি-হি করে কাঁপার ভঙ্গি করল বেকি। এরিক যা বলবে, সে ঠিক তার উল্টোটা বলবে।

হাইওয়ের এক ধারে গাছপালা। মাঠ। বাড়িঘর। আরেক পাশে প্রশান্ত মহাসাগর। সকালের চমৎকার সোনালি রোদ। আকাশে মেঘ নেই বলে সকালটা অতি সুন্দর।

বেড়াতে যাচ্ছে ওরা। স্যালভিজ ইয়ার্ডের দায়িত্ব দুই ব্যাভারিয়ান ভাই বোরিস আর রোভারের ওপর। কাজেই নিশ্চিন্ত রয়েছেন রাশেদ পাশা আর মেরিচাচী।

ইয়ার্ডের পুরানো মাল বেচাকেনার পাশাপাশি কিছুদিন হলো শখের সাংবাদিকতা শুরু করেছেন মেরিচাচী। একটা ম্যাগাজিনের জন্যে নতুন আর্টিক্যাল লিখছেন। তথ্য আর মালমশলা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। নামটা কি দেবেন তা-ও ঠিক করে ফেলেছেন: নতুন প্রজন্মের ওপর নতুন চাপ বর্তমান ইয়াং জেনারেশন যে মানসিক পীড়নের মধ্যে রয়েছে, লেখাটা তার ওপর ভিত্তি করে। ওশনসাইডে বসে শেষ করার ইচ্ছে।

হাইওয়ে ধরে ছুটছে গাড়ি। সামনের সীট থেকে ফিরে তাকালেন মেরিচাচী। 'কিশোর, বল্ তো, তোর জীবনে এখন সবচেয়ে দুশ্চিন্তার কারণ কোনটা?'

ইস্, আবার! নীরবে গুঙিয়ে উঠল সে। এ সব প্রশ্নের জবাব দেয়ার মত মূড নেই এখন তার। খোদা! বাঁচাও!

বাতাসে উড়তে থাকা চুলগুলো মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে দিতে মেরিচাচী বললেন, 'আমি জানি তোর জীবনে অনেক সমস্যা। প্রচুর দুশ্চিন্তা। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কোনটা?' মাঝে মাঝে কিশোরের মনে হয়, ও যেন ওর চাচীর গবেষণার বস্তু। বস্তুর সঙ্গে তার তফাৎটা হলো, তার প্রাণ আছে।

'এই মুহূর্তে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা, এ দুটোর পাশে বসে থাকা,' এরিক আর বেকিকে দেখিয়ে বলল কিশোর। মহাসুখে তখন বাক্স থেকে পেস্ট্রি বের করে খাচ্ছে দু'জনে। খাওয়ার চেয়ে বেশি করছে শয়তানি। পেস্ট্রির সমস্ত মাখন ডলে ডলে ভাইয়ের শার্টে লাগাচ্ছে বেকি।

'অ্যাই, ভাল হচ্ছে না কিন্তু!' চেঁচিয়ে উঠল এরিক।

হি-হি করে হাসতে লাগল বেকি। পেস্ট্রি দিয়ে এরিকের চুলে ডলা মেরে

বলল, 'দে, আমি তোর চুল আঁচড়ে দিই।'
'থামবি!' আরও জোরে চিৎকার করে উঠল এরিক।
চাচীকে দেখিয়ে কিশোর বলল, 'বুঝলে তো এখন?'
চেঁচানো শুরু করল এরিক। 'ফুফু, ওকে কিছু বলবে? শেষ করে দিল তো!'
আস্তে করে বেকির হাতটা সরিয়ে দিলেন মেরিচাচী। এরিকের শার্টে লাগা মাখন মুছতে হাত বাড়ালেন।
সীটের পেছনে রাখা একটা পাখির খাঁচা। কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। এরিকের দিক থেকে মনোযোগ শেষ হতে ফিরে তাকাল বেকি। টান দিয়ে সরিয়ে নিল খাঁচার ওপরের কাপড়টা। ভেতরে দুটো মুনিয়া। মেয়েটা সারাক্ষণ মুখ ভার করে রাখে, বর্ষাকালের মেঘে ঢাকা আকাশের মত। কিশোরের ধারণা। তাই নাম রেখেছে ক্লাউড। আর পুরুষটা খালি মেজাজ দেখায়। সে-জন্যে ওটার নাম থান্ডার।
কাপড় সরাতেই কিচির-মিচির শুরু করে দিল পাখি দুটো। তাতে জেগে গেল মিস্টার ডেভিল। এতক্ষণ কিশোরের পায়ের কাছে আরাম করে ঘুমিয়ে ছিল। এগুলোও অ্যান্ডারসনদের সম্পত্তি। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে এগুলোকেও মেরিচাচীর দায়িত্বে রেখে গেছেন।
'উঠে পড়েছিস। আয়,' ভারী বিড়ালটাকে আদর করে তুলে নিয়ে কোলের ওপর বসাল কিশোর। জন্তু-জানোয়ার পছন্দ করে ও। ওর হাত চেটে দিল বিড়ালটা। কুণ্ডলী পাকিয়ে আবার শুয়ে পড়ল কোলের ওপর।
'কিশোর,' আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন মেরিচাচী, 'বল্ না, কোন ব্যাপারটা নিয়ে এখন তোর সবচেয়ে মানসিক যন্ত্রণা?'
ইস্, চাচীর হাত থেকে মুক্তি নেই! যতক্ষণ না একটা সন্তোষজনক জবাব দিতে পারবে, ছাড়বে না চাচী।
'এখন সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা হচ্ছ তুমি,' রেগে উঠল কিশোর। 'ইস্, পাগল করে দিল!'
হাসিটা মিলিয়ে গেল মেরিচাচীর। বড় বড় চোখ দুটোর উজ্জ্বলতা থাকল না আর, নিষ্প্রভ হয়ে গেল।
বলাটা কি ঠিক হলো? ভাবল কিশোর। 'পাগল হয়ে যাচ্ছি', 'পাগল করে দিল', এ ধরনের কথাগুলো শুনলেই ভড়কে যান মেরিচাচী। কারণ সত্যি সত্যি একবার মাথা গড়বড় হয়ে গিয়েছিল কিশোরের। ডক্টর মুনের ইনজেকশনের প্রভাবে। মুসা, রবিন, এমনকি চাচীকেও খুনের পরিকল্পনা (তিন গোয়েন্দা সিরিজের 'প্রেতাত্মার প্রতিশোধ' বইতে) করেছিল তখন সে।
বলে যখন ফেলেছে, ফেলেছে, এখন আর আফসোস করে লাভ নেই। মিস্টার ডেভিলের কানের গোড়া চুলকে দিতে লাগল কিশোর। ওশনসাইডে গিয়েও ছুটির পুরো স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে না আর সে। সারাক্ষণ এখন তার ওপর কড়া নজর রাখতে থাকবেন মেরিচাচী।
কিশোর তাঁর মন খারাপ করে দিয়েছে। বাড়িয়ে দিয়েছে দুশ্চিন্তা। অন্য

প্রসঙ্গে চলে গেলেন মেরিচাচী। বেকি আর এরিককে দেখে রাখার জন্যে একজন বেবি-সিটারের প্রয়োজন। ওশনসাইড ডেইলিতে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তিনি।

'কই,' রাশেদ পাশাকে বললেন তিনি, 'কেউ তো এল না। ওখানে গিয়ে কাউকে না পেলে তো বেড়ানোটারই বারোটা বেজে যাবে।'

'পেয়ে যাবে,' রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিলেন রাশেদ পাশা। 'অত চিন্তা কোরো না।'

চিন্তাটা যে মেরিচাচীর কোনখানে, সেটা তো কিশোর বুঝতে পারছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সীটে হেলান দিল সে।

দুই ঘণ্টা পর ওশনসাইডে যাওয়ার রাস্তাটায় ঢুকল গাড়ি। হাইওয়ে থেকে মোড় নিয়ে সরু আঁকাবাঁকা আরেকটা রাস্তা ধরে আধঘণ্টা গাড়ি চালালেন রাশেদ পাশা।

ছোট্ট সৈকত শহর ওশনসাইড নজরে এল। জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে তাকিয়ে রইল কিশোর। শহরে ঢুকল গাড়ি। আর্ট গ্যালারি, রেস্টুরেন্ট, স্পোর্টস স্টোর আর একটা পুরানো ধাঁচের জেনারেল স্টোর পার হয়ে এল।

'সুন্দর শহর,' বলল সে।

'কিশোর ভাই, ওই দেখো!' চিৎকার করে উঠল এরিক।

ট্রাফিক সার্কেলের ঠিক মাঝখানের গোল চত্বরে ঘাসে ঢাকা এক টুকরো জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা বাদামী ভালুকের প্রমাণ সাইজের মূর্তি। থাবায় চেপে ধরা একটা মাছ।

'শুনেছি,' রাশেদ পাশা বললেন, 'মাছ শিকার নাকি এখানে দারুণ জনপ্রিয়। তারমানে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।'

চত্বরটার পাশ দিয়ে অন্যপাশে চলে এল গাড়ি। ওপর দিকে উঠতে শুরু করল।

'বাড়িটা কি পাহাড়ের ওপরে, চাচা?' জানতে চাইল কিশোর।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন রাশেদ পাশা। 'বাড়িটা থেকে মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই নিচের সাগর দেখা যায়। খুব সুন্দর।'

গাছপালায় ঘেরা কতগুলো সামার হাউজের দিকে মোড় নিল অবশেষে গাড়ি। সরু একটা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে ওদের বাড়িটা। চেহারাটা আধুনিক, কিন্তু বাড়িটা পুরানো। কাঠের তৈরি। মরচে পড়া চালা

'সত্যি সুন্দর!' মিস্টার ডেভিলকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামল কিশোর।

হুড়াহুড়ি করে তার পেছনে নেমে এল এরিক আর বেকি। ছুটাছুটি শুরু করে দিল সামনের লনটায়।

বাড়ির সদর দরজার তালা খুললেন রাশেদ পাশা পেছন পেছন ঘরে ঢুকল কিশোর। বলে উঠল, 'দারুণ!'

মুগ্ধ চোখে ঘরের জিনিসগুলো দেখতে লাগল সে। ওপরের দুটো স্কাইলাইট দিয়ে আলো আসছে আধুনিক লিভিং রুমটাতে। পেছনের

দেয়ালের বেশির ভাগটা জুড়ে রয়েছে কাঁচের পাইডিং ডোর। নীল-সাদা ডোরাকাটা পর্দা দিয়ে ঢাকা দরজার দুটো ফ্রেমের দুই প্রান্ত।

রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়ল কিশোর। এগিয়ে গিয়ে কাঁচের পাইডিং ডোরটা ঠেলে সরিয়ে একটা কাঠের ডেকে বেরিয়ে এল। নিচে রোদে চকচক করছে সুইমিং পুলের পানি। গাছের ছায়া এসে পড়েছে পানিতে।

'দারুণ! দারুণ!' আবার একই কথা বলল কিশোর। সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করার আর নতুন কোন শব্দ নেই যেন তার স্টকে।

কান পেতে রইল সে। কানে আসছে গাছের ফাঁকে বয়ে যাওয়া বাতাসের বিচিত্র শব্দ। তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে সৈকতে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ছলাৎ-ছল।

অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে খানিকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থেকে ঘরে ফিরে এল আবার সে। সামনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরোল।

গাড়ি থেকে মালপত্র নামাচ্ছেন রাশেদ পাশা। তাঁকে সাহায্য করতে এগোল কিশোর।

এরিক আর বেকি ছুটাছুটি করে খেলছে। এসে পড়ল তার গায়ের ওপর।

'এহ্হে! চোখে দেখো না নাকি?' ধমক লাগাল কিশোর। কিন্তু এতই উত্তেজিত দু'জনে, ওর কথা কানেই ঢুকল না। ওদের খেলা ওরা চালিয়েই গেল।

চাচার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর। ট্রাংক থেকে একটা ব্যাগ বের করেছেন রাশেদ পাশা। হাত বাড়াল কিশোর, 'দাও, ওটা আমার কাছে।'

'বাড়ির মালিকের একটা বোটও ছিল, বুঝলি। ইঞ্জিন লাগানো,' রাশেদ পাশা বললেন। 'নদীর ঘাটে বাঁধা আছে। ওটা ফাও দিয়ে দিয়েছে বাড়ির সঙ্গে চালিয়ে দেখতে হবে ওটা।'

ব্যাগের ভারে কাত হয়ে গেল কিশোর। ঘরে এসে ঢুকল। সামনের হলের লাগোয়া ত্রিকোণ রান্নাঘরটায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল চাচীকে। কিশোরকে দেখে বললেন তিনি, 'খাবার তো কিচ্ছু নেই ঘরে। বাজারে যাওয়া দরকার।'

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে,' কিশোরের পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল বেকি। দৌড়ে গিয়ে ফুফুর শাড়ি ধরে টানাটানি শুরু করল।

তাকে কোলে তুলে নিলেন মেরিচাচী, 'আচ্ছা, যেয়ো।'

'আমিও যাব,' লিভিং রুম থেকে চিৎকার করে উঠল এরিক। 'ওই ভালুকটা আরেকবার দেখতে ইচ্ছে করছে আমার।'

'আমি আর যাচ্ছি না,' কিশোর বলল। 'এ দুটোর সঙ্গে আরেকবার গাড়িতে বসার এক বিন্দু ইচ্ছে আমার নেই। আমি বাড়িতেই আছি।'

'ঠিক আছে, থাক,' বেকিকে কোল থেকে নামিয়ে দিলেন মেরিচাচী। বেকি, এরিক আর রাশেদ পাশাকে নিয়ে দরজার দিকে এগোলেন। বেরিয়ে যাওয়ার আগে ফিরে তাকিয়ে কিশোরকে বললেন, 'জরুরী কোন দরকার

পড়লে ফোন করিস।'

'পড়বে না,' হাত নেড়ে জানিয়ে দিল কিশোর।

ডেকে উঠল পাখিগুলো। ফিরে তাকাল কিশোর। 'অ, রোদের মধ্যে যেতে চাইছিস?' এগিয়ে গিয়ে খাঁচাটা তুলে নিল সে। কাউচের পেছনে নিয়ে গিয়ে রাখল। জানালা দিয়ে বিকেলের রোদ এসে পড়েছে ওখানে। 'নে, এখানে তোদের ভাল লাগবে।'

যেন তার কথার জবাবে গান গাইতে শুরু করল পাখি দুটো।

ধীরে ধীরে এপাশ ওপাশ লেজ নাড়ানো শুরু করল মিস্টার ডেভিল।

'পাখির ওপর লোভ করলে পিটিয়ে হাড় গুঁড়ো করে দেব,' আলতো ধমক লাগাল কিশোর।

সুটকেস আর ক্যাসেট প্লেয়ার হাতে দোতলায় নিজের বেডরুমে এসে ঢুকল সে। সুটকেস থেকে জিনিসপত্র বের করে বিছানায় রাখল। সেগুলো কেবিনেটের ড্রয়ারে গোছানোর আগে চালু করে দিল ক্যাসেট প্লেয়ারটা। গান শুনতে শুনতে গোছাবে। এই সময় দরজার ঘণ্টা বাজল।

কে এল?

সিঁড়ি বেয়ে আবার নিচতলায় নেমে এল সে। দরজা খুলে দিল।

অপূর্ব সুন্দরী একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিশোরের চেয়ে দু'এক বছর বেশি হতে পারে বয়েস। চোখের মণি এত নীল, কন্ট্যাক্ট লেন্স লাগানো কিনা ভাবল কিশোর। মাথা ভর্তি সোনালী চুল রেশমের মত ঝলমল করছে। হালকা নীল শার্ট আর সাদা প্যান্টে চমৎকার লাগছে।

'এই যে,' কিশোরকে দেখে বলে উঠল মেয়েটা। 'বিজ্ঞাপনটা দেখে এলাম।'

'বিজ্ঞাপন?'

'দুটো বাচ্চাকে দেখাশোনা করতে হবে, বলা হয়েছে না?'

'ও। ওই বিজ্ঞাপন!' একপাশে সরে জায়গা করে দিল কিশোর। 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

'আমি ট্রিশ,' ঘরে ঢুকে মেয়েটা জানাল। 'ট্রিশ অ্যান্ডারসন। আমাকে আপনি আপনি করতে হবে না। তোমার চেয়ে বয়েস খুব একটা বেশি হবে না আমার।...যা বলছিলাম। বিজ্ঞাপনটা পড়ে মনে হলো, আমার জন্যে খুব ভাল হবে।'

'তাই?' কিশোর বলল। 'কিন্তু আমার চাচা-চাচী তো ঘরে নেই এখন।'

'অ,' দমে গেল মনে হলো ট্রিশ। 'আজকেই আরেকটা ইন্টারভিউ আছে আমার। একটার সময়। ওটা হয়ে গেলে আর আর আসব না।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' হাত তুলল কিশোর। 'ফোন করে দেখি। চাচী বলে গেছে, জরুরী দরকার হলে...'

থেমে গেল সে। অদ্ভুত একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে ট্রিশের। নীল চোখের পাতা সরু করে তাকিয়ে আছে কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে।

তীক্ষ্ণ একটা হিসহিসানী শোনা গেল।

ঘুরে তাকাল কিশোর।

কাউচের ওপর দাঁড়িয়ে আছে মিস্টার ডেভিল। পরিবর্তন তার মাঝেও দেখা যাচ্ছে। একটা থাবা উদ্যত। বেরিয়ে পড়েছে থাবার নখগুলো। ভয়ানক ভঙ্গিতে ফাঁক করে রাখা মুখের ভেতরে দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। খাড়া হয়ে গেছে ঘাড়ের চুল। আরেকবার হিসিয়ে উঠল সে।

'সরি,' ট্রিশকে বলল কিশোর। মিস্টার ডেভিলকে তুলে নিয়ে শান্ত করার জন্যে পিঠ চাপড়ে দিয়ে স্বগতোক্তি করল, 'কি রে, কি হয়েছে তোর? এ রকম ও তো কখনও করিস না!'

'আমি বরং চলেই যাই!' দরজার দিকে রওনা দিল ট্রিশ।

'আরে না না, দাঁড়াও!' শক্ত করে মিস্টার ডেভিলকে চেপে ধরল কিশোর। 'এক মিনিট। চাচীকে ফোন করে দেখি, কি বলে?'

হাতের দামী ঘড়িটা দেখল ট্রিশ। 'ঠিক আছে। তাহলে বসেই যাই কয়েক মিনিট।'

রান্নাঘরে এসে ঢুকল কিশোর। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আস্তে করে মেঝেতে নামিয়ে রাখল মিস্টার ডেভিলকে। 'হলো কি তোর? খবরদার, আর শয়তানি করবি না।'

চাচীর মোবাইল নম্বরে ফোন করল কিশোর। ট্রিশের কথা জানাল।

'এখুনি রওনা হচ্ছি,' মেরিচাচী বললেন। 'ওকে আটকা। দশ মিনিটের বেশি লাগবে না আমাদের।'

রিসিভার রেখে ঘুরে তাকাতেই চোখে পড়ল মিস্টার ডেভিলের লেজটা দরজার ওপাশে চলে যাচ্ছে। বসার ঘরে চলে যাচ্ছে সে।

'মিস্টার ডেভিল! মিস্টার ডেভিল!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'উফ্, নামও রেখেছে বটে! ডাকলে গলা শুকিয়ে ওঠে!'

আবার হিসিয়ে উঠল বিড়ালটা।

তারপর তীক্ষ্ণ একটা ভীতিকর শব্দ। বিড়ালের ক্রুদ্ধ ডাকের মতই, তবে কিছুটা অন্য রকম। বিড়ালকে কখনও এ রকম শব্দ করতে শোনেনি সে।

দরজার অন্যপাশে এসে ট্রিশের ওপর চোখ পড়তে বরফের মত জমে গেল যেন কিশোর।

চিতাবাঘের আক্রমণের ভঙ্গিতে কাঁধ দুটো কুঁজো করে ফেলেছে ট্রিশ। আবার সরু হয়ে এসেছে চোখের পাতা। চোখের সাদা অংশটা হলুদ হয়ে গিয়ে ধক্‌ধক্ করছে।

আচমকা বিড়ালের মত ঠোঁট ওপরে তুলে ভেঙচি কাটল মিস্টার ডেভিলকে। হিসিয়ে উঠল।

শিউরে উঠল কিশোর। এ রকম ভীতিকর শব্দ জীবনে শোনেনি।

তিন

আরেকবার জন্তুর মত, অমানবিক একটা হিসহিস শব্দ করে উঠল ট্রিশ।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে কিশোরের পাশ কাটিয়ে ঝড়ের গতিতে গিয়ে আবার রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল মিস্টার ডেভিল।

ফিরে এসে নিচু হয়ে বিড়ালটাকে কোলে তুলে নিল কিশোর। গায়ে হাত বুলিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। 'কেমন মজা? গেছিলি অন্যকে শাসাতে, এখন নিজেই কাবু।'

কিশোরের হাতে মাথা ঘষতে শুরু করল মিস্টার ডেভিল। ঘাড়ের লোম এখনও খাড়া।

'চাচী রওনা হয়ে গেছে,' দরজা দিয়ে উঁকি মেরে ট্রিশকে বলল কিশোর। 'তুমি বসো।'

একটা বাটিতে করে মিস্টার ডেভিলকে পানি এনে দিল কিশোর। তাকে চাপড়ে দিয়ে, আদর করে বহু কষ্টে শান্ত করল। কয়েক মিনিট পর বাইরে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। সদর দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন চাচা-চাচী ট্রিশকে স্বাগত জানালেন। হুড়মুড় করে রান্নাঘরে এসে ঢুকল এরিক। পেছনে বেকি।

কিশোরকে জিজ্ঞেস করল এরিক, 'মহিলাটি কে? আমাদের নতুন বেবি-সিটার?'

খোলা দরজা দিয়ে লিভিং রুমের দিকে তাকিয়ে দেখল কিশোর, ট্রিশের ইন্টারভিউ নিতে বসেছেন চাচা-চাচী। এরিকের কথার জবাব দিল সে, 'রাখা হবে কিনা এখনও বোঝা যাচ্ছে না।'

তবে সহসাই বুঝে গেল কিশোর, পরিস্থিতি ট্রিশের পক্ষেই যাচ্ছে।

কাউচে সামনের দিকে ঝুঁকে বসেছেন রাশেদ পাশা। দুই হাত কোলের ওপর। চোখের উজ্জ্বল হয়ে ওঠা দেখেই বোঝা যায় ট্রিশকে পছন্দ করতে শুরু করেছেন তিনি।

পাশে বসেছেন মেরিচাচী। ট্রিশের কথা শুনে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাচ্ছেন। রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে চাচা-চাচীর দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। তাঁদের ভাব-ভঙ্গিই বুঝিয়ে দিচ্ছে, ট্রিশের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছেন দু'জনেই।

'কিশোর ভাই, বাক্সটা খোলো না,' এরিক বলল। 'খিদে পেয়েছে খুব।'

চাচীর নিয়ে আসা মুদীর ব্যাগ খুলে টিউনার টিন খুলল কিশোর। এরিক আর বেকির জন্যে স্যান্ডউইচ বানাতে শুরু করল। একটা চোখ লিভিং রুমের দিকে।

'আরি, কিশোর ভাই, কোনদিকে তাকিয়ে আছ? সব পড়ে যাচ্ছে তো।'

চেঁচিয়ে উঠল এরিক। একটা কাঠের টুল টেনে এনে তাতে উঠে বসল।

'পড়ুক, পড়ুক,' বেকি বলল। 'খারাপ জিনিসগুলোই পড়ছে। ইচ্ছে করেই ফেলছ, তাই না, কিশোর ভাই?'

'চুপ!' ধমক লাগাল কিশোর। 'শুনতে পাচ্ছি না তো।'

'শহরের বাইরে আমার দূর সম্পর্কের এক আন্টির কাছে থাকি,' ট্রিশ বলছে। 'আন্ট জিবার মেয়ে শীলা কলেজে পড়ে। হোস্টেলে থাকত। মা'র কাছে চলে এসেছে এখন। তিনজনের জন্যে বাড়িটা খুব ছোট হয়ে গেছে। থাকা-খাওয়া সহ একটা কাজ পেলে এখন সমস্যার সমাধান হয় আমার।'

'এ ধরনের কাজ কি আর করেছ কখনও?' মেরিচাচী জিজ্ঞেস করলেন।

'করেছি। গত দুই গ্রীষ্মেই বেবি-সিটারের কাজ করেছি।'

'বয়েস কত তোমার?' জানতে চাইলেন রাশেদ পাশা।

'সতেরো।'

'যে দুটো কাজ করেছ, সেগুলোর রেফারেন্স আছে?' জিজ্ঞেস করলেন মেরিচাচী।

ট্রিশের হাতে ফুল আঁকা কভারওয়ালা বড় একটা নোটবুক। সেটা থেকে প্লাস্টিকের কভারে মোড়া একটা টাইপ করা কাগজ বের করল সে। 'এই যে, নিন। ফোন নম্বরগুলো নিচে।'

'দেখি, একজনকে অন্তত ফোন করে কথা বলে আসি,' কাগজটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মেরিচাচী। 'এখনই আসছি।' রান্নাঘরে এসে ঢুকলেন তিনি। লাগিয়ে দিলেন দরজাটা।

'ওকে রাখছ নাকি?' জিজ্ঞেস করতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করল না কিশোর।

'তুই কি বলিস?' চাচী জিজ্ঞেস করলেন।

'আমার জন্যে কাউকে লাগবে না,' সাফ জবাব দিয়ে দিল এরিক। 'তবে বেকির জন্যে দরকার।'

'দরকার তো আসলে তোর জন্যে,' বেকি বলল। 'আমি কি করলাম?'

ওদের কথায় কান দিলেন না মেরিচাচী। কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, বললি না? মেয়েটাকে কেমন লাগছে তোর?'

'জানি না, চাচী,' সত্যি কথাটাই বলল কিশোর। 'কিন্তু ওকে দেখে মিস্টার ডেভিল যে কি রকম করল, যদি দেখতে। ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল। চেহারাই বদলে গেল বিড়ালটার। দাঁতগুলো সব বের করে এমন কাণ্ড শুরু করল, চমকে গিয়েছিলাম আমি।'

'অ, তারমানে বিড়ালটারও রসবোধ আছে,' হাসতে হাসতে বললেন মেরিচাচী। 'তবে মেয়েটাকে আমার পছন্দ হয়েছে।'

'বিড়ালের রসবোধ! কি বলছ, চাচী তুমি? আমার তো মনে হলো ট্রিশকে দেখে আঁতকে উঠেছে মিস্টার ডেভিল।'

'নিয়ে নাও ওকে, ফুফু,' এরিক বলল। 'মেয়েটা দারুণ!'

এরিকের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন চাচী। প্রচণ্ড ধমক লাগালেন,

'এক চড় লাগিয়ে দেব! এই বেয়াদব, মেয়েটা কি রে? এ ভাবে কথা বলা কোথায় শিখেছিস?'

টেলিফোন যন্ত্রটার নিচে ট্রিশের দেয়া কাগজটা চাপা দিয়ে রিসিভার তুলে নিলেন মেরিচাচী। নম্বর টিপে কানে ঠেকালেন।

চাচীর কাছে দাঁড়ানো কিশোরও শুনতে পেল রিসিভারের মধ্যে রিঙ হওয়ার আওয়াজ। বিজি সিগন্যাল।

'এটাতে তো কথা বলছে,' মেরিচাচী বললেন। 'দ্বিতীয়টাতে দেখি।'

দ্বিতীয়টা থেকে কোন সাড়াই এল না। রিঙই হচ্ছে না।

'ট্রিশ আপাকে রেখেই দাও, ফুফু,' ধমক খেয়ে সাবধান হয়ে গেছে এরিক। 'তুমি নাকি মানুষ চেনো! সব সময়ই তো বলো।'

'হ্যাঁ, চিনি,' জবাব দিলেন মেরিচাচী। 'মেয়েটাকে আমার ভালই মনে হচ্ছে। ওকে যেতে দেয়া উচিত হবে না।'

'খোঁজ-খবর কিছু না নিয়েই রেখে দেবে?' মেনে নিতে পারছে না কিশোর।

'ওসব পরেও নেয়া যাবে,' চাচী বললেন। 'এখন ওকে ছাড়া উচিত হবে না।'

'চাচী, কাজটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না!'

লিভিং রুম থেকে হাসির শব্দ ভেসে এল। ফিরে তাকাল কিশোর। তার চাচার সঙ্গে জমিয়ে ফেলেছে ট্রিশ। রাশেদ পাশাকে বলছে, 'আপনাদের বিড়ালটা আমাকে দেখে যে রকম শুরু করল, যদি দেখতেন।' এমন ভঙ্গি দেখাচ্ছে ট্রিশ, যেন কি মস্ত এক রসিকতা। 'সকাল বেলা খালার বাড়িতে একটা ইঁদুর ধরার কল পরিষ্কার করেছিলাম। আমার গায়ে ইঁদুরের গন্ধ পেয়েছে বিড়ালটা। জন্তু-জানোয়ারের ঘ্রাণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ।'

'তা ঠিক,' একমত হলেন রাশেদ পাশা। 'বন্ধ টিনে কোন কিছু রাখলেও সেটার গন্ধ পেয়ে যায় মিস্টার ডেভিল।'

তিনি হাসলেন। হাসিতে যোগ দিল ট্রিশ।

নিজেকে রীতিমত বোকা মনে হতে লাগল কিশোরের। মনে হলো, মিস্টার ডেভিলের প্রতিক্রিয়া নিয়ে একটু বেশিই বিচলিত হয়ে পড়েছে সে।

চাচীর সঙ্গে লিভিং রুমে ঢুকল কিশোর। একটা কাউচে বসে পড়ল। দুই হাত কোলের ওপর।

মেরিচাচী বললেন, 'তোমার দুটো নম্বরের একটাতেও কথা বলতে পারলাম না।'

'তাই নাকি?' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল ট্রিশ। 'অসুবিধে নেই। আমার সম্পর্কে খারাপ কিছু বলবে না ওরা, আমি শিওর।'

'আমিও শিওর,' উষ্ণ হাসি হাসলেন রাশেদ পাশা। মেরিচাচীর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন।

'কাজটা তোমাকে দেয়া যেতে পারে, ট্রিশ,' মেরিচাচী বললেন। 'এখন ভেবে দেখো আমাদের এখানে কাজটা তুমি নেবে কিনা।'

'নেব না মানে!' হাসি ছড়িয়ে গেল ট্রিশের মুখে। 'আমি এ মুহূর্ত থেকে কাজে যোগ দিলাম!'

'এরিক! বেকি! এদিকে এসো,' মেরিচাচী ডাকলেন। 'তোমাদের ম্যাডামের সঙ্গে পরিচয় করে যাও।'

লজ্জিত, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পায়ে পায়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল দু'ভাই-বোন।

'ম্যাডাম বলার দরকার নেই,' কাউচ থেকে উঠে এগিয়ে গেল ট্রিশ। 'আমাকে আপা বলবে। ট্রিশ আপা। তারপর? কেমন আছ তোমরা? তোমাদেরকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে।'

ভাইয়ের হাত আঁকড়ে ধরে রইল বেকি। তবে হাসি ফুটেছে মুখে।

'আমাদেরকে সব সময় ঘরের মধ্যে আটকে রাখবেন না তো?' সন্দিহান কণ্ঠে প্রশ্ন করল এরিক। 'সারাক্ষণ খালি "পড়ো, পড়ো" করবেন?'

'আরে না না, তা করব কেন?' হাসিমুখে বলল ট্রিশ। 'আমাকেই বরং তোমরা বলে দেবে কোন্‌টা আমার করা উচিত, কোন্‌টা উচিত না।'

'তা পারব,' বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে জবাব দিল এরিক। 'কোন সমস্যা হবে না আপনার। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে শুধু হুকুম করবেন আমাকে।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।' কিশোরের দিকে ফিরল ট্রিশ। 'কিশোর, তোমার বন্ধু হতে আমার আপত্তি নেই। আশা করি চমৎকার একটা সামার কাটাব আমরা এখানে।'

'দেখা যাক,' নিশ্চিত হতে পারল না কিশোর। সন্দেহটা থেকেই গেল তার।

'সুটকেসে করে আমার জিনিসপত্র নিয়েই এসেছি আমি। ভাবলাম, যদি চাকরিটা হয়েই যায়,' মেরিচাচী আর রাশেদ পাশার দিকে তাকিয়ে বলল ট্রিশ। 'বাইরে রেখে এসেছি। নিয়ে আসিগে।'

ট্রিশকে ঘর থেকে বেরোতে দেখল না কিশোর। কারণ তার চোখ পাখির খাঁচাটার ওপর। চুপ করে আছে ও দুটো। সাধারণত যা থাকে না। সারাক্ষণই হয় কিচির-মিচির করে ওরা, নয়তো নরম সুরে শিস দেয়। বিশেষ করে থান্ডার। সে তো সারাক্ষণই ডাকাডাকি করতে থাকে।

কিন্তু এখন একেবারে চুপ করে আছে পাখি দুটো।

খাঁচার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। ওরা ঘুমিয়ে আছে কিনা দেখার জন্যে। না, জেগেই আছে। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে খাঁচার ভেতরে ওদের বসার দণ্ডটার ওপর।

'অ্যাই, তোরা চুপ করে আছিস কেন?' খাঁচায় নাড়া দিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর। তারপরেও যখন শব্দ করল না পাখি দুটো, বলল সে, 'দেখো, চাচী, পাখি দুটোও অদ্ভুত আচরণ করছে...'

কারও সাড়া না পেয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখল ঘরে কেউ নেই। ট্রিশের পর পরই সবাই বেরিয়ে চলে গেছে।

আবার খাঁচার দিকে ফিরল কিশোর। 'অ্যাই, কথা বল্!' টোকা দিতে লাগল খাঁচার শিকে।

যেন ঘোরের মধ্যে থেকে জেগে উঠল থান্ডার। হঠাৎ করে ডাকতে শুরু করল। তার সঙ্গে যোগ দিল ক্লাউড।

'আশ্চর্য!' আপনমনেই বিড়বিড় করল কিশোর। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল দরজার দিকে। বাইরে কি করছে সবাই দেখার জন্যে।

*

কয়েক মিনিট পর দল বেঁধে ট্রিশের সঙ্গে দোতলায় উঠতে লাগল সবাই। তার ঘর দেখিয়ে দিতে।

ট্রিশের সুটকেসটা ভারী বলে রাশেদ পাশাই বয়ে নিয়ে এসেছেন। সেটা নামিয়ে রেখে তিনি চলে গেলেন।

'এরিক আর বেকির পাশের ঘরটাতেই থাকো তুমি,' একটা ঘর দেখিয়ে বললেন মেরিচাচী। 'জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে রেখে সুইমিং পুলের কাছে চলে এসো। আমরা ওখানেই থাকব।'

'ঠিক আছে,' হাসিমুখে জবাব দিল ট্রিশ। 'এমন একটা বাড়িতে থাকার জায়গা পেলাম, যেখানে সুইমিং পুলও আছে। সাঁতার কাটতে আমার ভীষণ ভাল লাগে।'

বেকি আর এরিককে ট্রিশের সঙ্গে ঘরে রেখে মেরিচাচীও নিচে নেমে গেলেন। কিশোর গেল না। দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দেখছে ট্রিশ কি করে।

পুরানো সুটকেসটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলল ট্রিশ। ঝাঁকি লেগে লাফ দিয়ে খুলে গেল ধাতব খিল। ভেতরের কিছু কাপড়-চোপড় ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে পড়ল মেঝেতে।

ভেতরে ঢুকল কিশোর। কাপড়গুলো তুলে দেয়ার জন্যে। নীল একটা জামা তুলতেই ভাঁজের মধ্যে থেকে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে গেল একটা খবরের কাগজের কাটিং।

'কি লেখা ওটাতে?' ট্রিশকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মিষ্টি হাসিটা মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল ট্রিশের মুখ থেকে। 'কিছু না,' বলে তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে প্রায় ছোঁ দিয়ে তুলে নিল কাগজের টুকরোটা।

পরক্ষণে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে, সরে গেল কিশোরের কাছ থেকে। কাগজের টুকরোটায় চোখ বোলাল।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে কিশোর। কাগজটাতে কি লেখা আছে? কি লুকাল ট্রিশ?

ঝটকা দিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল ট্রিশ। 'দেখতে চাও কি আছে? এই যে। নাও।'

পুরানো কাটিং। হলদে হয়ে এসেছে কাগজটা।

হাতে নিল কিশোর। তারিখটা দেখল। দু'বছর আগের। হেডলাইনটা পড়ল: লীলা অ্যান্ডারসন এখনও অজ্ঞান।

নীরবে খবরটা পড়তে শুরু করল কিশোর:

১৫ বছর বয়েসী কিশোরী লীলা অ্যান্ডারসনের জ্ঞান এখনও ফেরেনি। প্যাসিফিক হাসপাতালেই রয়েছে সে। ডাক্তাররা বলছেন, এখনও বিপদমুক্ত হতে পারেনি। বাঁচবে কিনা সন্দেহ আছে।

ডাক্তারদের ধারণা, প্রচুর পরিমাণে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস টেনে নেয়ার ফলে তার মগজের ক্ষতি হয়েছে। জ্ঞান যদি ফেরেও, বেঁচে যায় এ যাত্রা, মগজের যে ক্ষতিটা হয়েছে তাতে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হবে। মগজের গোলমাল কিংবা চিরস্থায়ী ভাবে মানসিক রোগী হয়ে যাওয়াটাও বিচিত্র নয়।

খবরটা পড়া শেষ করে মুখ তুলল কিশোর। 'বেচারি! তোমার কেউ হয় নাকি?'

'আমার বোন,' ট্রিশ জানাল। 'যমজ।'

'এখন কি অবস্থা?'

কাটিংটার দিকে চোখ নামাল ট্রিশ। 'এখনও বেঁচে আছে। সেই একই রকম অজ্ঞান।'

'আহারে! ইস্!' দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর।

'না দেখে দুঃখ করছ,' রহস্যময় ভঙ্গিতে বলে উঠল ট্রিশ। 'সামনাসামনি যদি দেখতে, দুঃখ করার বদলে ঘাবড়ে যেতে, লীলা এতটাই ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে।'

চার

পরদিন সকালে ডেকে বেরিয়ে এল কিশোর। সকালের অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে লাগল। সূর্যের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাচ্ছে যেন পুরো প্রকৃতি।

ট্রিশকে দেখতে পেল। বনের রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে নদীর দিকে। তার সঙ্গে খুশি মনে নাচতে নাচতে চলেছে এরিক আর বেকি।

একটা সাদা শার্ট গায়ে দিয়েছে ট্রিশ। নীল প্যান্ট। দারুণ সুন্দরী লাগছে ওকে।

ফিরে তাকাল ট্রিশ। কিশোরকে দেখে তার উদ্দেশে হাত নাড়ল।

কিশোরও নাড়ল। ভদ্রতা করে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও। পরিবারের সবাই ট্রিশকে অতিরিক্ত পছন্দ করে ফেলেছে। করাটা খারাপ কিছু নয়। কিন্তু তার নিজের মনের খুঁতখুঁতানিটা দূর করতে পারছে না কোন ভাবেই।

নাস্তা সেরে বেরিয়ে পড়ল কিশোর। ছাউনিতে একটা সাইকেল পেল। সেটা নিয়ে রওনা হলো শহরে। ঘুরে দেখার জন্যে।

শহরে এসে প্রথমেই একটা টেলিফোন বুদে ঢুকল সে। মুসা আর রবিনকে ফোন করার জন্যে। রবিনকে পাওয়া গেল না। বাড়ি নেই। কোথায়

বেরিয়েছে বলতে পারলেন না রবিনের আম্মা মিসেস মিলফোর্ড।

মুসাকেও পাওয়া গেল না। তার আম্মা জানালেন ভোররাতের বাসেই ওশনসাইডে রওনা হয়ে গেছে।

ঘড়ি দেখল কিশোর। মুসার আসার সময় হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বাস স্টেশনে ছুটল সে।

রকি বীচ থেকে কিশোরের আসার সময় রবিন আর মুসা, দু'জনের কারও সঙ্গেই দেখা হয়নি। মেসেজ রেখে এসেছিল বোরিসের কাছে। বলে এসেছিল, ওরা দু'জন যদি আসতে আগ্রহী হয় আসতে পারে।

দূর থেকেই দেখতে পেল, বাস স্টেশনে ঢুকছে বাস। গতি বাড়িয়ে দিল কিশোর। কাছে যাওয়ার আগেই দেখল, দরজায় বেরিয়ে এসেছে মুসা।

'হাই', 'কেমন আছ', এ সব পর্ব শেষ হওয়ার পর রবিনের কথা জিজ্ঞেস করল কিশোর। সে আসেনি কেন, জানতে চাইল।

মুসা জানাল, লাইব্রেরিতে কাজ পড়ে গেছে রবিনের। আরও তিনদিন কাজ করতে হবে, তার আগে ছুটি পাবে না। ছুটি হলেই রওনা হয়ে যাবে।

'তারপর?' স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে কিশোরের পাশে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল মুসা। 'কেমন লাগছে ওশনসাইড?'

'এখনও দেখার সময়ই পাইনি,' কিশোর জানাল। 'তবে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে আসার খানিক পরেই।'

'কি ঘটনা?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ট্রিশ নামে একটা মেয়েকে কাল বেবি-সিটারের চাকরি দিয়েছে চাচা-চাচী। এরিক আর বেকিকে দেখে রাখার জন্যে। বেড়াতে এসে ঘরে বসে থাকতে চায় না চাচা-চাচী। পোলাপান নিয়ে বেরোলে বেড়ানোর আনন্দ হবে মাটি। আমাকেও আটকাতে পারবে না, জানে। কে বসে বসে দুটো ছেলে-মেয়েকে পাহারা দেবে। তাই একজন লোকের দরকার হয়ে পড়েছিল।'

'হুঁ। কিন্তু অদ্ভুত ঘটনাটা কি? বেবি-সিটারের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?'

খানিকটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করে শেষে বলেই ফেলল কিশোর, 'মিস্টার ডেভিল ওকে পছন্দ করতে পারছে না। সে-জন্যেই আমার সন্দেহ। বোকামি মনে হচ্ছে নাকি তোমার?'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল মুসা। 'হচ্ছে না। জন্তু-জানোয়ারেরা অনেক সময় এমন সব ব্যাপার আঁচ করে ফেলে, যেটা মানুষ পারে না। ওদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মানুষের চেয়ে অনেক প্রখর।'

'সিরিয়াসলি বলছ?'

'তাই তো।'

সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে ঠেলতে ঠেলতে এগোল কিশোর। পাশে পাশে হেঁটে চলল মুসা।

'জন্তু-জানোয়ারেরা যে মানুষের চেয়ে সাবধানী, সেটা আমিও জানি,' কিশোর বলল। 'টিটু কি সব কাণ্ড করত, মনে নেই? রাফিয়ানও করে। মানুষ যেটা বুঝতে পারে না, অদ্ভুত ভাবে কি করে জানি সেটা আঁচ করে ফেলে

জন্তু-জানোয়ারেরা, বহুবার দেখেছি। সে-জন্যেই ট্রিশকে দেখে মিস্টার ডেভিল ওরকম খেপে যাওয়ায় সন্দেহটা হয়েছে আমার। এরিকদের পাখি দুটোও ট্রিশকে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে চুপ হয়ে যায়। লক্ষ করেছি, বিড়ালটাও ভয় পায়, পাখি দুটোও। কিন্তু চাচা-চাচীকে বোঝাতে পারছি না কোনমতেই। ওদের ধারণা ট্রিশের মত মেয়েই হয় না।'

চুপ হয়ে গেল কিশোর। এক হাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে রেখে আরেক হাতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে। আচমকা মুসার দিকে ঘুরল। 'মুসা, আমার মনে হয় এখন আমাদের বাড়িতে না যাওয়াই উচিত তোমার। হোটেলে গিয়ে ওঠো।'

অবাক হলো মুসা। 'কেন?'

'কেন জানি না, ট্রিশকে আমার ভাল মনে হচ্ছে না। মন বলছে, কোন একটা অঘটন ঘটানোর জন্যেই আমাদের বাড়িতে ঢুকেছে ও।...তোমাকে ও দেখেনি যখন আপাতত দেখা দেয়ার দরকারও নেই। বলা যায় না, গোপনে তদন্তের দরকার পড়তে পারে। হোটেলে ওঠো। তারপর শহরে ঘোরাঘুরি করে খোঁজ-খবর নাও লোকের কাছে, ট্রিশ নামে কোন মেয়েকে কেউ চেনে কিনা। বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞেস করেছিল চাচী। এখানকারই ঠিকানা দিয়েছে ট্রিশ। ওর খালার বাড়ির ঠিকানা।'

মুসাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি রওনা হলো কিশোর।

কিছুদূর চালানোর পর সাইকেল থেকে নামল কিশোর। ঢাল বেয়ে ওঠা খুব কঠিন কাজ। চালিয়ে নেয়ার চেয়ে বরং ঠেলে নিয়ে ওঠা সহজ।

বাড়ির সামনে এনে সাইকেলটা স্ট্যান্ডে দাঁড় করাল সে। ঘরে ঢুকল। কারও সাড়াশব্দ না পেয়ে চাচীকে ডাকল।

জবাব পেল না।

'বেকি? এরিক?' আবার ডাকল।

সাড়া নেই।

কাঁচের দরজাটা ঠেলে খুলে ডেকে বেরিয়ে এল সে।

সুইমিং পুলের দিকে চোখ পড়তেই ধড়াস করে এক লাফ মারল হৃৎপিণ্ডটা।

বেকি!

পুলের ঠিক মাঝখানে ভাসছে সে।

চোখ বোজা। ভেজা চুলগুলো ছড়িয়ে রয়েছে মাথার চারপাশে।

বেকি! চিৎকার করতে চাইল কিশোর। কিন্তু শব্দ বের করতে পারছে না মুখ দিয়ে। আতঙ্কে জমে গেছে যেন।

সাঁতার জানে না বেকি। এ ভাবে ভেসে থাকার একটাই মানে। পানিতে ডুবে মারা গেছে লাশটা ভেসে উঠেছে পানির ওপর!

পাঁচ

'বেকি! বেকি!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

দুড়দাড় করে ডেকের সিঁড়ি বেয়ে নেমে পুলের দিকে দৌড় দিল।

পুলের কিনারে এসে ডাইভ দিয়ে পড়ল পানিতে। পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়ে পানির নিচ দিয়ে সাঁতরে চলল।

কাছে পৌঁছে পানির নিচে কোন কিছুর অস্তিত্ব টের পেল সে। মোচড় দিয়ে উঠল বুকের মধ্যে। কি আছে ওখানে?

সামনে গড়িয়ে এল ওটা। পথ রোধ করে দিল তার।

পানিতে রয়েছে ভুলে গিয়ে চিৎকার করে উঠল সে। নাকে মুখে পানি ঢুকে গেল তার। দম আটকে যাচ্ছে। বুঝতে পারল তার সামনে রয়েছে ট্রিশ।

ট্রিশ!

ডুব দিয়ে ছিল পানির নিচে!

পানিতে ভেসে উঠে দম নেয়ার চেষ্টা করতে করতে রেগে উঠল কিশোর, 'কি ব্যাপার? কি হচ্ছে এখানে?'

'সেটাই তো আমি জিজ্ঞেস করছি তোমাকে,' ট্রিশও রেগে উঠল। 'কাপড়-চোপড় পরে এ ভাবে পানিতে লাফিয়ে পড়ার অর্থটা কি?'

হাত দিয়ে ডলে চোখের ওপর থেকে পানি সরাল কিশোর। মাথা তুলতে দেখল বেকিকে। ট্রিশের কাঁধ আঁকড়ে ধরেছে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে গর্বের সঙ্গে জানাল, 'কিশোর ভাই, চিত হয়ে ভেসে থাকা শিখে ফেলেছি আমি।'

'তাই!' চমকের ধাক্কাটা সামলাতে পারেনি এখনও কিশোর। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস শব্দ কমানোর চেষ্টা করল।

'বেকিকে সাঁতার শেখাচ্ছি,' ট্রিশ জানাল। 'পানির নিচ থেকে ওকে ঠেলে রেখেছিলাম। কিন্তু তুমি এ ভাবে পাগলের মত ছুটে এলে কেন?'

দৌড়ে এলেন মেরিচাচী। তার পেছন পেছন এল এরিক।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি 'এত চেঁচামেচি কিসের?'

প্রথমে কিশোরের দিকে তাকালেন, তারপর ট্রিশের দিকে

'কিছু হয়নি, চাচী,' কিশোর বলল।

শার্ট-প্যান্ট-জুতো পরা কিশোরকে পানি থেকে উঠে আসতে দেখে ভুরু কুঁচকে গেল মেরিচাচীর

হা-হা করে হেসে উঠল এরিক 'পা পিছলে পানিতে পড়ে গিয়েছিলে,

তাই না, কিশোর ভাই?'

মাথা নিচু করে রইল কিশোর। চাচীর দিকে তাকাতে পারছে না।

'আস্ত একটা বেকুবের মত লাগছে তোমাকে, কিশোর ভাই!' হাসি আর থামতে চায় না এরিকের।

'এরিক, সর এখান থেকে!' ধমকের সুরে বললেন মেরিচাচী। 'ইচ্ছে হলে তুইও পানিতে নামগে, যা।' চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকালেন কিশোরের দিকে। 'কিশোরের সঙ্গে কথা আছে আমার।'

পানিতে নামার জন্যে কাপড় খুলতে শুরু করল এরিক।

'কিশোর, সমস্যাটা কি তোর?' পুলের কাছ থেকে সরে এসে জিজ্ঞেস করলেন মেরিচাচী।

'আমি…আমি ভাবলাম রেকি ডুবে মারা গেছে,' চাচীর চোখের দিকে তাকাতে পারছে না কিশোর। 'দূর থেকে দেখলাম পেট উঁচু করে ভেসে আছে। ওকে বাঁচানোর জন্যে গিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিলাম। বুঝতে পারিনি ট্রিশ ওকে সাঁতার শেখাচ্ছে।'

নরম হয়ে এল মেরিচাচীর মুখের ভঙ্গি। কিশোরের কপাল থেকে এক গুচ্ছ ভেজা চুল সরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলি, না? পাওয়ারই কথা।'

'চাচী,' সাহস পেয়ে বলে ফেলল কিশোর, 'ট্রিশকে আমার ভাল লাগছে না। দেখলেই জানি কেমন লাগে। অশুভ কিছু একটা রয়েছে ওর মধ্যে।'

'বিড়ালটার কথা এখনও মাথা থেকে ঝাড়তে পারিসনি তুই।'

'শুধু বিড়ালটা না,' কণ্ঠস্বর খাদে নামাল কিশোর। 'পাখি দুটোও ওকে দেখলে চুপ করে যায়।'

'কিশোর,' সন্দেহের দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন মেরিচাচী, 'সত্যি করে বল্ তো দেখি, কি হয়েছে তোর?'

'যে টেলিফোন নম্বরগুলো দিয়েছে, আমার মনে হয় আরেকবার চেক করা উচিত।'

'তারমানে গোপনে খোঁজ-খবর করতে বলছিস?'

'গোপনে মানে? খোঁজ-খবর নেয়ার মধ্যে গোপনীয়তা দেখলে কোথায়?'

'তুই মনে করেছিস চুপ করে আছি। তা না। আরও কয়েকবার ফোন করার চেষ্টা করেছি,' মেরিচাচী বললেন। 'সেই একই অবস্থা। একটা সারাক্ষণ বিজি থাকে, আরেকটাতে রিংই হয় না।'

'অবাক লাগেনি তোমার কাছে?'

'না।'

'কোন রকম খটকা লাগছে না?'

'না,' জবাব দিলেন মেরিচাচী। 'যে লাইনটা সারাক্ষণ বিজি থাকে, সে-পরিবারটায় নিশ্চয় বেশ কিছু ছেলেমেয়ে আছে, যারা সারাক্ষণ ফোন করেই চলেছে। এক মুহূর্তের বিরাম নেই। অন্য পরিবারটা বাড়ি-ঘরে তালা দিয়ে বেড়াতে চলে গেছে। এর মধ্যে অবাক হওয়ার কিছু দেখছি না। আমি শিওর,

ওদেরকে যখন পাওয়া যাবে, জিজ্ঞেস করব, ট্রিশের পক্ষেই বলবে ওরা ভাল ভাল কথা।'

'তার যে একটা বোন হাসপাতালে দু'বছর ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, সে-কথা জানো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'ট্রিশ আমাকে বলেছে মেয়েটা নাকি ভয়ানক খারাপ স্বভাবের। অশুভ।'

'উঁহু, বলেনি,' মাথা নাড়লেন মেরিচাচী। 'আহারে, নিশ্চয় বোনকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছে ট্রিশ। ওর সঙ্গে আরও ভাল ব্যবহার করা উচিত আমাদের। খুব খারাপ সময় যাচ্ছে ওর। আমাকে বলেছে, ওর বাবা-মা নাকি কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। তারমানে আপনজন বলতে আছে কেবল একটামাত্র বোন। তা-ও মরে কি বাঁচে!'

'তুমি দুঃখ করছ। কিন্তু ট্রিশের কোন কষ্ট আছে বলে তো মনে হয়নি আমার। বরং কথার ধরনটাই ভাল ছিল না।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন মেরিচাচী। 'আমার মনে হয় কোন ভুল করছিস তুই।' কিশোরের ভেজা চুলগুলোতে হাত বুলিয়ে আদর করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলেন

পুলের দিকে ফিরে তাকাল কিশোর। বেকি আর এরিকের সঙ্গে বড় একটা রঙিন বল নিয়ে লোফালুফি খেলছে ট্রিশ। অন্তরঙ্গ সম্পর্কের নমুনা।

নিজের ঘরে ফিরে এল কিশোর। ভেজা কাপড়-চোপড় খুলে ফেলল। বিছানার নিচে বসে থাকতে দেখল মিস্টার ডেভিলকে। আদর করে ওর কানের পেছনটা চুলকে দিল সে।

'মিস্টার ডেভিল, তুই যদি কথা বলতে পারতি ভাল হত,' মৃদু স্বরে বলল কিশোর। 'আমাকে জানাতে পারতি, ট্রিশকে দেখলেই অমন খেপে উঠিস কেন। জানাটা আমার ভীষণ জরুরী।'

কথা বুঝতে পেরে যেন মাথাটা কিশোরের হাতের তালুতে ঘষতে আরম্ভ করল মিস্টার ডেভিল।

হাসল কিশোর। 'তোকেও আমার খুব পছন্দ, মিস্টার ডেভিল।'

কাপড় বদলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। মিস্টার ডেভিলও বেরিয়ে এল। তার সঙ্গে সঙ্গে নিচে চলল।

রান্নাঘরে যাওয়ার পথে চাচা-চাচীর বেডরুমটার পাশ কাটাল কিশোর। শোবার ঘরটাকেই অফিস হিসেবেও ব্যবহার করছেন দু'জনে। চেয়ারে বসে কাগজপত্র ঘাঁটছেন রাশেদ পাশা। কাজে এতই মগ্ন, মুখ তুলেও তাকালেন না।

ঘরের এক কোণে বসে কোলের ওপর ল্যাপটপ কম্পিউটারটা রেখে টাইপ করছেন মেরিচাচী। কিশোরের সাড়া পেয়ে ফিরে তাকালেন। একবার হেসেই চোখ নামালেন আবার কম্পিউটারের দিকে।

কিশোরের সঙ্গে রান্নাঘরে না গিয়ে ঘুরে সদর দরজার দিকে হাঁটা দিল মিস্টার ডেভিল। বন্ধ দরজার পাল্লায় মাথা ঘষতে ঘষতে ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে। তার চোখে অনুনয় দেখে বুঝতে পারল কিশোর, বেরোতে

চায় বিড়ালটা। 'বেরোতে চাচ্ছিস? দাঁড়া, খুলছি।'

দরজাটা খুলে দিল কিশোর। বেরিয়ে গেল মিস্টার ডেভিল।

রান্নাঘরে ফিরে চলল কিশোর। একটা চিপসের প্যাকেট হাতে নিয়ে চলে এল জানালার ধারে। প্যাকেট ছিঁড়ে এক মুঠো চিপস মুখে ফেলে বাইরে তাকাল। বাড়ির সামনের দিকটা নজরে আসে এখান থেকে।

গেট দিয়ে ঢোকার রাস্তাটার ধারে, বাঁয়ের লনটায় এখন এরিক আর বেকির সঙ্গে খেলছে ট্রিশ।

আনমনে আরও কয়েকটা চিপস মুখে ফেলল কিশোর। রাস্তায় গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেদিকে তাকাল সে। লাল গাড়িটা চোখে পড়ল।

চোখের কোণ দিয়ে এ সময় মিস্টার ডেভিলকে দেখতে পেল সে। বাড়িতে ঢোকার রাস্তায় উঠছে।

আচমকা বাধা পেয়ে গোঁ-গোঁ করে উঠল ইঞ্জিন।

রাস্তায় চাকা ঘষার শব্দ।

'ঘটনাটা কি?' অবাক হলো কিশোর।

লাফ দিয়ে লনে নেমে তীব্র গতিতে ছুটতে শুরু করল মিস্টার ডেভিল।

গাড়িটাকে আচমকা ঘুরে যেতে দেখে চমকে গেল কিশোর।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে ড্রাইভার!

বশে রাখতে পারছে না গাড়িটাকে!

বাড়ির সীমানায় ঢুকে পড়ল গাড়ি। ছুটে আসতে শুরু করল এরিক আর বেকির দিকে। থামাতে না পারলে চাপা দেবে নিশ্চিত।

ছয়

চিৎকার করে উঠল কিশোর। দিশেহারা হয়ে গেছে। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

লনে নেমে পড়েছে লাল গাড়িটা। ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটছে।

চিৎকার করে উঠল বেকি।

দু'হাত মুখের ওপর তুলে নিয়ে এল এরিক।

অসহায়ের মত তাকিয়ে রইল কিশোর। বুঝতে পারছে, সে গিয়ে এখন আর কিছু করতে পারবে না। সে ঘর থেকে বেরোনোর আগেই গাড়িটা এসে চাপা দেবে ওদের।

বেকি আর এরিকের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়তে দেখা গেল ট্রিশকে। গর্জন তুলে ছুটতে থাকা গাড়িটার আড়ালে হারিয়ে গেল তিনজনে।

রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরোল কিশোর। চাচা-চাচীর চিৎকার কানে এল।

বিকট একটা শব্দ হলো। কিশোরদের গাড়িটাতে প্রচণ্ড জোরে গুঁতো লাগিয়ে দিয়েছে রাস্তা থেকে আসা গাড়িটা।

বন্ধ হয়ে গেল ওটার ইঞ্জিন। দাঁড়িয়ে গেল গাড়িটা।

শুধুই নীরবতা এখন।

পলকের জন্যে। পরক্ষণে শোনা গেল মেরিচাচীর আতঙ্কিত চিৎকার। উন্মাদের মত চিৎকার শুরু করেছেন তিনি।

'ওরা ভালই আছে, আন্টি,' ট্রিশের কথা শোনা গেল। 'বেকি আর এরিক ভাল আছে।'

হাঁ করে দম নিচ্ছে কিশোর।

বেকি আর এরিককে নিয়ে মাটিতে ঝাঁপ দিয়েছিল ট্রিশ। বেকিকে টেনে তুলল সে। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল এরিক।

'খোদা!' ফুঁপিয়ে উঠলেন মেরিচাচী। 'ট্রিশ, তুমি আজ বাঁচালে ওদের!'

ছুটে গিয়ে ছেলে-মেয়ে দুটোকে জড়িয়ে ধরলেন মেরিচাচী। বেকিকে কোলে তুলে নিলেন।

চমকের ধাক্কাটা কেটে যেতে কেঁদে উঠল বেকি। ফুফুর ঘাড়ে মুখ ঘষতে ঘষতে ফোঁপাতে লাগল।

লাল গাড়িটার দিকে ফিরল কিশোর। ড্রাইভারের সীট থেকে নেমে আসছে একটা অল্পবয়েসী লোক। বিমূঢ়, কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা ঠিক আছে তো?'

'এ কাণ্ডটা কেন করলেন?' রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করল ট্রিশ।

'আ-আমি…জা-জানি না!' তোতলাতে শুরু করল লোকটা। 'সত্যি বলছি! আমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না!' নিজের গাড়িটার দিকে ফিরে তাকাল সে। কিশোরদের গাড়ির একপাশে গুঁতো মেরেছে।

'আমি আস্তে আস্তেই চালাচ্ছিলাম,' লোকটা বলল। 'হঠাৎ করে গজরাতে শুরু করল ইঞ্জিন, গতি বেড়ে গেল। স্টীয়ারিং কাজ করল না। ব্রেক চাপলাম। ওটাও কাজ করল না।'

'মদ খেয়েছেন নাকি?' রেগে উঠলেন রাশেদ পাশা।

'না না, কসম খোদার! ও সব আমি খাই-টাই না! কি যে ঘটল, সত্যি বলতে পারব না। গতি বাড়াইনি! মদ খাইনি! আমার এত খারাপ লাগছে…' চোখ নামাল লোকটা।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিশোরের চাচা। বিশ্বাস করলেন কিনা বোঝা গেল না। তবে এ নিয়ে আর রাগারাগি করলেন না।

'ভাগ্যিস, কেউ চাপা পড়েনি।' বললেন তিনি। 'গ্যারেজে ফোন করা দরকার।'

ফোন করার জন্যে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি।

লাল গাড়িটার সামনের চাকার ফাঁকে একটা ডোরা কাটা লেজ চোখে পড়ল কিশোরের।

এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে বসে চাকার ফাঁকে আটকে থাকা বিড়ালটাকে বের

করে আনল সে। তার হাতে নিথর হয়ে ঝুলে রইল মিস্টার ডেভিলের রক্তাক্ত দেহ। নিজের অজান্তেই একটা গোঙানি বেরিয়ে এল কিশোরের মুখ থেকে।

'ওহ্, খোদা!' কপালে চাপড় মারল লোকটা। 'সত্যি বলছি, ইচ্ছে করে চাপা দিইনি বিড়ালটাকে! আমি ওকে দেখিইনি!'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল কিশোর। তারপর ট্রিশের দিকে তাকাল

ট্রিশের ঠোঁটের কোণে আলতো একটা হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

বিশ্বাস হতে চাইল না কিশোরের। সত্যি হাসছে ট্রিশ?

মিস্টার ডেভিলের লাশটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। ট্রিশের মুখোমুখি হলো। তিক্তকণ্ঠে বলল, 'বিড়ালটা মারা যাওয়ায় খুশি হয়েছ তুমি!'

'কিশোর, দোহাই তোর, ওর সঙ্গে লাগতে যাসনে!' এগিয়ে এলেন মেরিচাচী। 'বিড়ালটা মারা যাওয়ায় ও খুশি হবে কেন?'

কিশোরের পাশে এসে দাঁড়াল এরিক। মৃত বিড়ালটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর ভাই, সত্যি সত্যি মরে গেছে মিস্টার ডেভিল? মা খুব কষ্ট পাবে। বিড়ালটাকে কি যে ভালবাসত।'

জবাব দিল না কিশোর। বনের দিকে তাকাল। ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল সেদিকে। কিছু দূর গিয়ে ফিরে তাকাল। 'এরিক, একটা শাবল নিয়ে আসবে? ছাউনিতে পাবে।'

'এখুনি আনছি,' ছাউনির দিকে দৌড় দিল এরিক।

আবার হাঁটতে শুরু করল কিশোর।

দুই মিনিটের মধ্যেই একটা ছোট শাবল হাতে বেরিয়ে এল এরিক। দৌড়ে চলল কিশোরকে ধরার জন্যে।

বনে ঢুকল দু'জনে। ঢাল বেয়ে নেমে গেছে গাছপালা। বড় বড় দুটো পাথর পড়ে আছে এক জায়গায়। মাঝখানে সরু ফাঁক। একজন লোক কোনমতে ভেতর দিয়ে যেতে পারে।

জায়গাটা পছন্দ হলো কিশোরের। ফাঁকের কাছে এসে দাঁড়াল। বিড়ালটাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করল।

কোমরে দুই হাত রেখে চুপচাপ দেখছে এরিক। আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় মারল। খানিক পরেই ফিরে এল বুনো ফুল-পাতা সহ কতগুলো ডাল নিয়ে। কিশোরের পাশে বসে ফুলগুলো ছিঁড়ে রাখল মাটিতে। মন ভীষণ ...প। বিড়ালটার জন্যে। তবে কাঁদল না।

একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলল কিশোর। তাতে ডাল-পাতা বিছিয়ে দিল এরিক। 'এই বিছানায় আরামেই থাকবে মিস্টার ডেভিল, কি বলো, কিশোর ভাই?'

গর্তের মধ্যে পাতার বিছানায় বিড়ালটাকে শুইয়ে দিল ওরা। মাটি চাপা দিয়ে কবর দিল। কবরের ওপর বিছিয়ে দিল বুনো ফুল। কানে আসছে গাছের ফাঁকে বয়ে যাওয়া প্রবল বাতাসের একটানা শব্দ।

এরিকের দিকে ফিরে তাকাল কিশোর। নিজের ভাবনাটাকেই যেন শব্দ করে মেলে দিল এরিকের কাছে, 'গাড়িটা যে ভাবে ছুটে এল, অবাক লাগেনি তোমার?'

'ভয়ে এমনই কাবু হয়ে গিয়েছিলাম, কি যে দেখেছি কিছুই মনে নেই,' জবাব দিল এরিক। 'বলের দিকে ছিল মনোযোগ। গাড়িটাকে আসতেও দেখিনি। তুমি দেখেছ?'

'দেখেছি। মনে হলো, হঠাৎ করে যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল গাড়িটা। সব নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে নিজেই নিজেকে চালানো শুরু করল।'

অবশ লাগছে কিশোরের। ভীষণ ক্লান্ত।

রাতে ভাল করে খেতে পারেনি। এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না বিড়ালটার মৃত্যুর পেছনে ট্রিশের হাত আছে। মুসার সঙ্গে দেখা করে সব জানিয়ে এসেছে। মুসা অবশ্য বিশ্বাস করেছে। অবাস্তব অস্বাভাবিক ঘটনায় তার অবিশ্বাস নেই।

মুসা জানিয়েছে, যতটা পেরেছে খোঁজ-খবর করেছে সে। ট্রিশ অ্যান্ডারসন বা শীলাকে চেনে এমন কাউকে খুঁজে পায়নি ওশনসাইডে। আরও ভালমত খোঁজ নেয়ার কথা তাকে বলে এসেছে কিশোর।

খাওয়ার পর সোজা নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়েছে সে। শুয়ে শুয়ে ভাবছে। লিভিং রূম থেকে ভেসে আসছে হাসির শব্দ। টেলিভিশন দেখছে সবাই। বেকি আর এরিকের মন থেকে অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনাটা মুছে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন মেরিচাচী আর রাশেদ পাশা।

বড় শহরের মত ইলেকট্রিসিটির অত্যাচার নেই এখানে। অত আলোও নেই। জানালা দিয়ে আসছে আকাশ থেকে ঝরা কালচে-ধূসর আলো। কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল কিশোর, বলতে পারবে না।

দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের।

উঠে বসল বিছানায়।

অন্ধকার ঘর। লাল আলোটা কিসের?

বুঝতে পারল, ওর ডিজিটাল ঘড়ির। কোথায় রয়েছে, তা-ও মনে পড়ল। নিজেদের রকি বীচের বাড়িতে নয়।

কানে আসছে ঝিঁঝির ডাক। নীরবতার মাঝে অনেক জোরাল শোনাচ্ছে দটা। ঘড়ির লাল নম্বরগুলো বলছে, রাত বারোটা বেজে একত্রিশ।

বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। এক ফালি ফ্যাকাসে চাঁদ আলো ছড়িয়ে দিতে লাগল তার ওপর।

গুড়গুড় করে উঠল তার খালি পেট। গলাও শুকনো। পিপাসা পেয়েছে পানি দরকার। দুই হাতে চোখ রগড়াল। বেরিয়ে এল অন্ধকার হলওয়েতে

পুরো বাড়িটা নীরব। সবাই শুয়ে পড়েছে। নিঃশব্দে সিঁড়ির দিকে এগোল কিশোর।

চোখ পড়ল ট্রিশের ঘরের ওপর। দরজা খোলা।
কৌতূহল হলো কিশোরের। ট্রিশ কি বাইরে বেরিয়েছে?
সাবধানে গিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিল কিশোর।
অন্ধকার ঘর। দাঁড়িয়ে আছে ট্রিশ। তার গায়ে এসে পড়েছে জানালা দিয়ে আসা চাঁদের আলো। পরনে সাদা, ঢোলা, হাতাকাটা গাউন।
এত লম্বা লাগছে কেন ওকে? অবাক হয়ে ভাবল কিশোর। অন্ধকার বেডরুমে চঞ্চল ঘুরতে থাকল তার দৃষ্টি।
আলোর কারসাজি? ভুল-ভাল দেখছে?
নাকি এখনও দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছে?
হঠাৎ কিশোরের অস্তিত্ব টের পেয়ে গিয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল ট্রিশ।
চিৎকারটা বেরিয়ে চলে এসেছিল। তাড়াতাড়ি মুখে হাত চাপা দিয়ে ফেলল কিশোর।
ফ্যাকাসে চাঁদের আলোয় বিকৃত লাগছে ট্রিশের মুখ। ভয়ানক লাগছে চেহারা। অশুভ পিশাচ।
কিশোরের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল ট্রিশ। নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর হাসি।
ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে কিশোর। কিন্তু পারছে না।
ট্রিশের চোখের দৃষ্টি আটকে রেখেছে ওকে।
এমন কিছু রয়েছে সে-দৃষ্টিতে, নড়তে পারছে না সে।
কি আছে? কি আছে?
এত লম্বা লাগছে কেন ট্রিশকে?
চোখে পড়ল কিশোরের। কেন লম্বা লাগছে, বুঝতে পারল।
অবিশ্বাস্য!
কিন্তু বাস্তব!
মেঝের ফুটখানেক ওপরে খাড়া হয়ে ভেসে রয়েছে ট্রিশ।
হঠাৎ তীব্র এক ঝলক আলোর রশ্মি বিদ্যুৎ শিখার মত ছুটে এল কিশোরের দিকে।

সাত

ছোপ ছোপ গাঢ় বেগুনী রঙ ভাসছে কিশোরের চোখের সামনে। আবার গভীর অন্ধকারে ডুব দিতে চাইছে তার দেহের একটা অংশ। আরেকটা অংশ জেগে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে।
বেগুনী রঙটা ধীরে ধীরে মুছে গিয়ে ধূসর হয়ে গেল।

চোখের সামনে থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল কুয়াশা। চাচার মুখটা দেখতে পেল। বহুদূরে। তারপর কাছে।

আরও কাছে।

'জ্ঞান ফিরছে,' তাঁকে বলতে শুনল কিশোর। কপালে ঠাণ্ডা স্পর্শ। ওর চাচীর উদ্বিগ্ন মুখটা দেখা দিল ধূসর ঝিলিমিলির মধ্যে।

'কি হয়েছিল?' দুর্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'আমার মাথা ব্যথা করছে। তোমরা এখানে কেন?'

'বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলি তুই,' চাচা বললেন। 'ঘরে পানি শেষ। ফ্রিজ থেকে আনতে যাচ্ছিলাম। দেখি ট্রিশের ঘরের বাইরে পড়ে আছিস।'

ট্রিশ!

নামটা ধাক্কা দিয়ে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল কিশোরকে। কনুইয়ে ভর দিয়ে নিজেকে উঁচু করল সে। 'ওকে বিদেয় করো জলদি!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'এখনই বের করে দাও! প্লীজ!'

'শান্ত হ, বাবা!' কোমল কণ্ঠে বলে আস্তে করে কিশোরের একটা হাত তুলে নিলেন মেরিচাচী।

ঝাড়া দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল কিশোর। 'শান্ত আমি হতে পারছি না! জলদি যদি ওকে বের না করো, সর্বনাশ করে দেবে আমাদের।' গলা কাঁপছে তার। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। কিন্তু কিছু করার নেই। 'ট্রিশকে শূন্যে ভাসতে দেখেছি আমি! নিজের চোখে!'

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলেন মেরিচাচী ও রাশেদ পাশা। উদ্বেগ ফুটল চোখে।

'আমি সত্যি বলছি!' কিশোর বলল। 'শূন্যে ভাসছিল ট্রিশ। মেঝে থেকে ফুটখানেক উঁচুতে শূন্যের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখে হেসে উঠল পাগলের মত। একটা বিদ্যুতের শিখার মত জিনিস ছুঁড়ে মারল।...নইলে আমি বেহুঁশ হলাম কেন, বুঝতে পারছ না?'

আস্তে আস্তে কিশোরের কাঁধ ডলে দিতে লাগলেন রাশেদ পাশা। 'তা পারছি না। কিন্তু কিছু একটা যে হয়েছে তোর মগজে...'

'আমি পাগল! পাগল ভাবছ আমাকে?' লাফ দিয়ে উঠে বসল কিশোর। 'এসো আমার সঙ্গে।' উঠে দাঁড়াল সে। 'নিজের চোখে দেখবে।'

'কিশোর! থাম্! কিশোর!' অনুরোধ করলেন মেরিচাচী।

কিন্তু ট্রিশের ঘরের কাছে পৌঁছে গেছে কিশোর। এক ধাক্কায় খুলে ফেলল পাল্লা। ফিরে তাকিয়ে দেখল ঠিক তার পেছনেই রয়েছেন চাচা-চাচী।

ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে থাকতে দেখল ট্রিশকে।

ঘুমাচ্ছে?

'কি হয়েছে?' মাথা তুলল ট্রিশ। 'কোন সমস্যা?' ঘুম-জড়িত কণ্ঠ।

থরথর করে কাঁপছে কিশোর। 'তুমি শূন্যে ভেসেছিলে!' চিৎকার করে উঠল সে। 'অস্বীকার করে লাভ নেই। আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'শূন্যে ভাসছিলাম?' চোখ ডলতে ডলতে বলল ট্রিশ। 'কিশোর, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। মানুষ আবার শূন্যে ভাসে কি করে?'

ওর এই নিরীহ ভঙ্গি আরও রাগিয়ে দিল কিশোরকে। চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'সে-জন্যেই তো আমার মনে হচ্ছে, তুমি মানুষ নও। ডাইনী গোছের কিছু, যদিও এ সব আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু চোখের সামনে যা দেখলাম–গাড়িটাকে টেনে নিয়ে এসে বিড়ালটাকে খুন করালে, চাঁদের আলোয় ঘরের মধ্যে শূন্যে ভেসে থাকলে, তারপর স্টার ওঅরসের যোদ্ধাদের মত বিদ্যুৎ শিখা ছুঁড়ে মেরে বেহুঁশ করলে আমাকে–তাতে তোমাকে আর মানুষ বলে মনে হচ্ছে না আমার।'

কিশোরের চাচা-চাচীর দিকে মুখ ফেরাল ট্রিশ। 'ও কি আমার সঙ্গে মজা করছে রাত দুপুরে?'

ওর এই অভিনয় আর সহ্য করতে পারল না কিশোর। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'মিথ্যুক কোথাকার! খবরদার বলছি, আমাকে পাগল প্রমাণিত করার চেষ্টা করবে না!'

ভীষণ চমকে যাওয়ার ভঙ্গিতে হাঁ হয়ে গেল ট্রিশের মুখ।

খপ করে কিশোরের হাত চেপে ধরলেন রাশেদ পাশা।

তাতে রাগ আরও বেড়ে গেল কিশোরের। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারছে না কোনমতে। হঠাৎ তার মনে হলো, এ রকম মাথা গরম তো সে নয়! এর পেছনেও কি ট্রিশের কারসাজি রয়েছে? অসম্ভব না।

নিজেকে শান্ত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল কিশোর।

শক্ত করে ধরে রাখলেন রাশেদ পাশা, যাতে ছুটতে না পারে কিশোর। তিনি নিশ্চয় ভাবছেন, ছেড়ে দিলেই গিয়ে ট্রিশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কিশোর।

'কিছু মনে কোরো না, ট্রিশ,' বললেন তিনি। 'যাও, শুয়ে পড়ো। আমরা ওকে নিয়ে যাচ্ছি।'

জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে ট্রিশের। বিমূঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু হয়েছে নাকি ওর? এ রকম পাগলের মত করছে কেন? আমি কোন সাহায্য করতে পারি?'

'না না, লাগবে না,' রাশেদ পাশা বললেন। 'আমরাই সামলাতে পারব। তুমি বরং ঘুমানোর চেষ্টা করো।'

বাধা দিল না আর কিশোর। ওকে টেনে বের করে নিয়ে এলেন রাশেদ পাশা।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে। লিভিং রুমে।

কিশোরকে সোফায় বসিয়ে দিলেন। হাত ছাড়লেন না। শক্ত করে ধরে রাখলেন।

রাগ লাগছে কিশোরের। হতাশা, ক্ষোভ বেড়েই চলেছে। মরিয়া হয়ে উঠতে চাইছে। মনে হলো প্রাণভরে চিৎকার করতে পারলে এই চাপ অনেকটা কমত।

পায়ের শব্দ কানে এল তার। ঘরে ঢুকেছে কেউ। মুখ তুলে দেখে এরিক। ঘুমে ভরা চোখ ডলতে ডলতে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে কিশোর ভাইয়ের?'

তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে দরজার দিকে ঘুরিয়ে দিলেন মেরিচাচী। 'কিছু না। মিস্টার ডেভিলের জন্যে কষ্ট পাচ্ছে তোমার কিশোর ভাই। যাও, ঘুমাতে যাও।'

'তার আর কি দোষ,' বিড়বিড় করে বলল এরিক। 'আমারই কান্না পাচ্ছে।' টলতে টলতে দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল সে। রাতের বেলা ঘুমের মধ্যে আবার কি করে বসে সে-জন্যে তার সঙ্গে গেলেন মেরিচাচী।

'আসলে তোর কি হয়েছে, বল্ তো, কিশোর?' জিজ্ঞেস করলেন রাশেদ পাশা। 'মাথার মধ্যে কি কোন রকম খারাপ অনুভূতি হচ্ছে? কারও ওপর আক্রোশ, কাউকে খুন করতে ইচ্ছে করছে?—আগের বার যেমন হয়েছিল?'

'না, ওরকম কিছুই হচ্ছে না,' কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল কিশোর। 'চাচা, বিশ্বাস করো, ট্রিশের ব্যাপারে একটা বর্ণ বাড়িয়ে বলছি না আমি। আমি নিজের চোখে দেখেছি ওকে শূন্যে ভেসে থাকতে। ও তোমাদের ভুল বোঝাচ্ছে, চাচা...'

ফিরে এলেন মেরিচাচী। কিশোরের পাশে বসলেন। 'কিশোর, তোর কি মনে হচ্ছে, আমাদের মনে তোর জায়গায় ঠাঁই করে নিয়েছে ট্রিশ? ওকে তোর চেয়ে বেশি পছন্দ করতে শুরু করেছি আমরা?'

'চাচী, দোহাই তোমার!' ককিয়ে উঠল কিশোর। 'মেজাজটা আরও খারাপ কোরো না! কেন আমার কথা বিশ্বাস করছ না? তোমরা কি ভাবছ আমি আবার পাগল হয়ে গেছি, আগের মত?'

চাচা-চাচীকে চুপ করে থাকতে দেখে অন্য ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর, 'আচ্ছা, একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো—আগে কখনও এ রকম করতে দেখেছ আমাকে? ভূত-প্রেত-ডাইনী কিংবা এ ধরনের জিনিসগুলোকেই আমি অবাস্তব মনে করি। তাহলে শুধু শুধু ট্রিশের ব্যাপারে মিথ্যে বলতে যাব কেন? ওর সঙ্গে কি আমার কোন শত্রুতা আছে?'

'না,' জবাব দিলেন মেরিচাচী। 'তবে চোখের ভুল হতেই পারে...'

'তাহলে বেহুঁশ হলাম কেন?'

'কিশোর,' চিন্তিত ভঙ্গিতে চাচী বললেন, 'রাতে তুই প্রায় কিছুই খাসনি। ক্লান্তি আর পেটে অতিরিক্ত খিদে থাকলেও মানুষ অনেক সময় নানা রকম উল্টোপাল্টা কাণ্ড করে বসে।'

'তারমানে তুমি বলতে চাইছ পেটে খিদে থাকাতে আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম ট্রিশের দরজার সামনে?'

'তা বলছি না। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলি ওখানে। ঘুমের ঘোরেই কোন কারণে বিছানা থেকে উঠে বাইরে বেরিয়েছিলি। হতে পারে খাওয়ার জন্যে নিচে যাচ্ছিলি। কিন্তু পরে নিচে না গিয়ে আবার শুয়ে পড়েছিলি, বারান্দায়, বিছানা ভেবে। ঘুমের ঘোরে কত কাণ্ডই তো করে মানুষ।'

'তারমানে বলতে চাইছ নিশিতে পেয়েছিল আমাকে?'

'অবাস্তব কিছু না এটা। অনেক মানুষকেই পায়।'

'হ্যাঁ, এইটা সম্ভব,' স্ত্রীর সঙ্গে একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালেন রাশেদ পাশা।

বার বার ছাগলকে কুকুর বলে যেমন ব্রাহ্মণকে বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছিল তিন ঠগ যে আসলে ওটা ছাগল না, কুকুরই; কিশোরেরও সেই অবস্থা হয়ে গেল এখন। ভাবতে আরম্ভ করল সে, ট্রিশকে শূন্যে খাড়া হয়ে থাকতে দেখাটা বোধহয় কল্পনাই ছিল তার। দুঃস্বপ্ন দেখার কুফল। হয়তো সত্যিই ঘুমের মধ্যে নিশিতে পাওয়া মানুষের মত বিছানা থেকে নেমে গিয়েছিল সে। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল ট্রিশের ঘরের সামনে।

রাত দুপুরে অন্যের ঘরের দরজার সামনে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়াটা অনেক বেশি বাস্তব, কাউকে শূন্যে ভেসে থাকতে দেখার চেয়ে, মনে মনে স্বীকার করল সে। কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব কোনমতেই খুঁজে পেল না—তার দিকে বিদ্যুৎ শিখা ছুটে আসার ব্যাপারটা। ওটাকে কি বলবে? দুঃস্বপ্ন?

অকারণ আর তর্কাতর্কির মধ্যে না গিয়ে বিড়বিড় করে বলল সে, 'কি জানি, হয়তো তোমাদের কথাই ঠিক।'

ওষুধ ধরছে বুঝতে পেরে সোফায় নড়েচড়ে বসলেন মেরিচাচী। 'স্নায়ুর ওপর অতিরিক্ত চাপ মানুষের সর্বনাশ করে দেয়। আজকালকার ছেলেমেয়েরা সব সময়ই একটা চাপের মধ্যে থাকে। আমার মনে হয় ডাক্তার দেখানো উচিত তোর। মানসিক রোগের ডাক্তাররা ভাল পরামর্শ দিতে পারবে।'

গুঙিয়ে উঠল কিশোর। 'উহু, চাচী! তোমার ওসব ম্যাগাজিন-পড়া আর্টিক্যালের গবেষণাটা আমার ওপর চালিও না তো আর দয়া করে। আমার কোন ডাক্তারের দরকার নেই।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন চাচী। 'অনেক সময় মনের কথা অন্যকে বললে ভারটা অনেক হালকা হয়ে যায়। একটু আগেই নিশিতে পাওয়া মানুষের ওপর লেখা একটা বই শেষ করলাম। স্বপ্নচর বা ঘুমের মধ্যে যারা হাঁটে তাদেরকে এই দলে ফেলা হয়েছে। বেশির ভাগ সময়ই দেখা গেছে, স্নায়ুর অতিরিক্ত উত্তেজনা কিংবা চাপের ফলেই এ সব কাণ্ড করে মানুষ।'

চাচীর লেকচার অসহ্য লেগে উঠল কিশোরের। সাহায্যের আশায় চাচার দিকে তাকাল।

চিন্তিত ভঙ্গিতে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইলেন চাচা। তারপর বললেন, 'এখন ওসব আলোচনা বাদ দিয়ে চলো সবাই ঘুমোতে যাই। সকালবেলা ফ্রেশ মাইন্ডে কথা বলা যাবে।'

*

বিছানায় শুয়েও আর ঘুম এল না কিশোরের। পুরো সজাগ।

চিন্তার গতি রুদ্ধ করতে পারছে না। ট্রিশ আসার পর থেকে যা যা ঘটেছে, সব খেলে যেতে থাকল মনের পর্দায়। কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পেল, মাটির এক ফুট ওপরে খাড়া হয়ে আছে ট্রিশ।

শূন্যে ভাসমান।

সত্যি কি?

এ রকম একটা অবাস্তব পাগলামির কথা বিশ্বাস না করার জন্যে চাচা-চাচীকে দোষ দেয়া যায় না।

আলো নিভিয়ে অন্ধকার ঘরে পড়ে পড়ে ভাবছে আর ঝিঁঝির ডাক শুনছে কিশোর। জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরে এসে পড়ছে সরু একফালি চাঁদের আলো। বিচিত্র আলো-আঁধারি সৃষ্টি করেছে মেঝেতে।

হঠাৎ একরাশ ক্লান্তি এসে চেপে ধরল কিশোরকে। মনে হতে লাগল সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে তার।

কিন্তু ঘুমাতে পারছে না। ঘুমাতে ভয় লাগছে। আবার যদি দুঃস্বপ্ন দেখে? ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন!

তবে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়। অস্থির ঘুম। ভেঙে গেল একটু পরেই। ঘড়িতে দেখল দুটো বিশ বাজে।

বালিশে মাথা রাখতে ভাল লাগছে না। উঠে বসল বিছানায়। ঝিঁঝির ডাক থেমে গেছে। অন্য একটা শব্দ কানে এল তার।

জেগে আছে কেউ। ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা বাড়িতে।

শরীরের সমস্ত স্নায়ু টানটান হয়ে গেল। বিছানায় থাকতে পারল না আর। কৌতূহল দমাতে না পেরে পায়ে পায়ে বেরিয়ে এল আবার ঘরের বাইরে।

কে হাঁটে?

জানা দরকার।

দেয়াল ঘেঁষে এগোনো শুরু করল সে। ট্রিশের ঘরের দিকে। দরজাটা খোলা দেখে হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল তার।

দৌড়ে নিজের ঘরে ফিরে আসার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করল সে। ট্রিশের ঘরে উঁকি দিয়ে আবার কোন্ ভয়ানক দৃশ্য দেখতে পাবে, জানে না।

সাহস করে উঁকি দিয়ে ফেলল ঘরের ভেতর। বিছানা শূন্য। চাঁদের আলো এসে পড়েছে। দেখা যাচ্ছে এলোমেলো চাদর।

গভীর দম নিল কিশোর। ট্রিশ গেল কোথায়?

রান্নাঘরে শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। পা টিপে টিপে নেমে এল সে। আলো জ্বলছে রান্নাঘরে।

ট্রিশকে দেখতে পেল। পরনে নাইট-গাউন। ফ্রিজ থেকে খাবার বের করে খাচ্ছে। রাত দুপুরে খিদে পাওয়ার স্বভাব।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।

চিন্তামুক্ত হয়ে সিঁড়ি বেয়ে আবার উঠে এল দোতলায়। ট্রিশের দরজার সামনে দিয়ে এগোতে গিয়ে থেমে গেল।

খবরের কাগজের কাটিংগুলো!

ট্রিশের বিছানার মাঝখানে পড়ে আছে।

আগে দেখলাম না কেন? অবাক হলো কিশোর। বুঝতে পারল, কেন

দেখেনি। অন্ধকারে ছিল তখন ওগুলো। চাঁদের আলো সরে গিয়ে এখন কাগজগুলোর ওপর পড়েছে।

কি লেখা আছে দেখতেই হবে। ওর কাছ থেকে কি জিনিস লুকিয়ে রেখেছে ট্রিশ, না জানা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল। ট্রিশ নেই। এখনও রান্নাঘরেই আছে।

এটাই সুযোগ। ঢুকে পড়ল ট্রিশের ঘরে। বিছানার দিকে এগোল।

ঝুঁকে একখানে জড় করল কাগজগুলো। চোদ্দ-পনেরোটা টুকরো হবে।

কাঁপা হাতে একটা টুকরো তুলে নিয়ে চাঁদের আলোয় হেডলাইনটা পড়ল: হাসপাতালেই রয়েছে এখনও বেচারি লীলা।

সেটা ফেলে দিয়ে আরেকটা টুকরো তুলে নিল।

কিন্তু চোখের সামনে আনার আগেই ঠাণ্ডা স্পর্শ পেল ঘাড়ে। ঘাড় চেপে ধরেছে বরফের মত শীতল কতগুলো আঙুল।

আট

সরে গেল কিশোর। হাত থেকে খসে পড়ল খবরের কাগজের কাটিং। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। 'ট্রিশ!'

একটা কথাও বলল না ট্রিশ। রাগে জ্বলছে চোখ।

ঘাড় ডলতে লাগল কিশোর। না দেখেও বুঝতে পারল লাল দাগ পড়ে গেছে। ভয়ানক শক্তি ট্রিশের গায়ে। আঙুল তো নয়, যেন সাঁড়াশির চাপ। একজন মেয়েমানুষের গায়ে এত শক্তি! অবিশ্বাস্যই লাগল তার কাছে।

খোলা জানালা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল দমকা বাতাস। কাগজের টুকরোগুলোকে এলোমেলো করে দিল। উড়িয়ে নিয়ে মেঝেতে ফেলল কয়েকটা।

এক পা পিছিয়ে গেল ট্রিশ। মেঝেতে পড়া টুকরোগুলোকে পাহারা দিতে লাগল। যাতে তুলতে না পারে কিশোর।

'বেরোও, আমার ঘর থেকে!' প্রচণ্ড রাগে হিসিয়ে উঠল ট্রিশ। 'আরেকবার ধরতে পারলে ভাল হবে না বলে দিলাম!'

'না না, আর হবে না,' তাড়াতাড়ি জবাব দিল কিশোর। ভয় পাচ্ছে ট্রিশকে। তাকাতে পারছে না ভয়ঙ্কর চোখ দুটোর দিকে। একটা সেকেন্ড আর দেরি না করে বেরিয়ে চলে এল ঘর থেকে।

দড়াম করে ঘরের দরজা লাগিয়ে দিল ট্রিশ।

দৌড়ে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল কিশোরের। ট্রিশকে ভয় পেতে শুরু করেছে। কিন্তু একটা জিনিস চোখে

পড়ায় পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে।

পাশের আরেকটা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে মেঝেতে। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে একটা খবরের কাগজের কাটিং। বাতাসে ট্রিশের ঘর থেকে উড়িয়ে এনে ফেলেছে।

ছোঁ মেরে কাগজটা তুলে নিয়েই দৌড়ে ঘরে এসে ঢুকল কিশোর। এক হাতে দরজা লাগিয়ে অন্য হাতে আলোর সুইচ টিপে দিল।

উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে সে। কাগজটার দিকে তাকাল। নাম দেখা যাচ্ছে: হেরিং বীচ টাইমস।

রকি বীচ থেকে বেশি দূরে না জায়গাটা। বিশ মিনিটের রাস্তা। কিন্তু ওশনসাইড থেকে যথেষ্ট দূরে। হেরিং বীচের খবরে আগ্রহী কেন ট্রিশ?

এই কাটিংটাও দুই বছরের পুরানো।

বুকের কাঁপুনি বেড়ে যাচ্ছে কিশোরের। পড়তে শুরু করল।

মর্মান্তিক একটা দুর্ঘটনার কথা লেখা রয়েছে কাগজে। হেরিং বীচের একটা বাড়িতে এক সকালে মৃত পাওয়া যায় মিস্টার অ্যান্ড মিসেস অ্যান্ডারসন নামে এক দম্পতিকে। বেঁচে যায় কেবল তাদের মেয়ে, লীলা অ্যান্ডারসন। তারমানে ট্রিশের বোন—ভাবল কিশোর। যে এখনও হাসপাতালে বেহুঁশ হয়ে রয়েছে।

কাগজের কথামত, মৃত্যুটাকে দুর্ঘটনা ভাবছে পুলিশ। বাড়ির গ্যারেজে ভুল করে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে রেখে দেয়া হয়েছিল। প্রথমে বিষাক্ত কার্বন মনক্সাইড গ্যাসে ভরে যায় গ্যারেজ। সেখান থেকে হীটিং আর কুলিং সিসটেমের পাইপের ভেতর দিয়ে ঘরে এসে ঢোকে। ঘুমের মধ্যে সেই গ্যাস ফুসফুসে ঢুকে মৃত্যু ঘটায় অ্যান্ডারসন দম্পতির। বাবা-মা'র মত মারা যায়নি লীলা, তবে গভীর ঘুমও ভাঙছে না আর।

হাঁ করে কাগজটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর।

ট্রিশের নাম লেখা নেই কোথাও।

কেন নেই? ও তখন কোথায় ছিল? খালার বাড়িতে? বেঁচে আছে, এটা তো রিপোর্টারদের জেনে যাওয়ার কথা। উল্লেখ করেনি কেন?

এর একটা জবাব হতে পারে, প্রচুর নতুন নতুন পত্রিকার জন্ম হচ্ছে। তাতে কাজ করছে নতুন রিপোর্টার, যারা এখনও দক্ষ হয়ে ওঠেনি। খবরটা অসমাপ্ত রয়ে গেছে সে-কারণেই। ভাবল বটে কিশোর, কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না।

ভাবতে ভাবতে আরেকটা কথা মনে পড়ল ওর। ট্রিশ বলেছিল, তার বাবা-মা কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।

মিথ্যে কথা বলল কেন?

সবগুলো কাটিং পড়তে পারলে হয়তো এ সব প্রশ্নের জবাব জানা যাবে

হাই উঠতে লাগল কিশোরের। কিন্তু শুতে ইচ্ছে করছে না

জানালার কাছে এসে দাঁড়াল সে। পর্দা সরিয়ে দিল চাঁদের আলোয়

নেয়ে যাচ্ছে বনভূমি। খুবই সুন্দর। চুটিয়ে উপভোগ করতে পারত, যদি কেবল ট্রিশ এসে না ঢুকত বাড়িতে।

অশুভ মনে হচ্ছে ওকে। ভাগানো দরকার। কাটিংগুলো জোগাড় করা গেলে সেগুলো দেখিয়ে চাচা-চাচীকে বিশ্বাস করানো যাবে—এরিক আর বেকির জন্যে ট্রিশ বিপজ্জনক। আপাতত যে কাটিংটা পেয়েছে, সকালবেলা উঠে সেটাই দেখাবে। ট্রিশ যে অন্তত একটা মিথ্যে কথা বলেছে, প্রমাণ করা যাবে এ কাটিংটা দিয়েই।

জানালার কাছ থেকে সরে এল কিশোর। টান দিয়ে কেবিনেটের ওপরের ড্রয়ারটা খুলল। রাখতে গেল ভেতরে।

গরম লাগছে আঙুলে। দেশলাইয়ের কাঠি ধরালে যেমন আঁচ লাগে। আঙুলের দিকে তাকিয়ে তাজ্জব হয়ে গেল। আগুন ধরে গেছে কাটিংটায়। আঙুলে লাগতে সামান্যই বাকি আছে।

অস্ফুট চিৎকার দিয়ে কাগজটা হাত থেকে ফেলে দিল সে। পড়ল ওটা কার্পেটের ওপর। মুহূর্তে আগুন ধরে গেল কার্পেটে।

চিৎকার করে পা দিয়ে মাড়ানো শুরু করল সে। কিন্তু নিভতে চাইল না আগুনটা। বেড়ে গিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

বিছানা থেকে একটানে চাদরটা তুলে এনে সেটা দিয়ে বাড়ি মারতে শুরু করল আগুনে।

অদ্ভুত আরেকটা কাণ্ড ঘটল এ সময়।

হাসি!

কানে বাজছে অট্টহাসির শব্দ। কে হাসে?

ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল সে। কাউকে দেখা গেল না। আতঙ্কিত হয়ে বুঝতে পারল, হাসিটা বাজছে তার নিজের মগজের মধ্যে।

দুই হাতে মাথা টিপে ধরল।

হাসি থামছে না।

ভয়ঙ্কর, শয়তানি হাসি।

চোখ বুজে, মাথা ঝাঁকিয়ে হাসিটা দূর করার চেষ্টা করল।

লাভ হলো না। থামল না হাসিটা।

চিনতে পারছে। এ হাসি আগেও শুনেছে সে। ট্রিশের কণ্ঠ! নিজের ঘরে চাঁদের আলোয় শূন্যে ভেসে থেকে কিশোরকে দেখে এ রকম হাসিই হেসেছিল সে।

'থামো!' সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'দোহাই তোমার! হাসি থামাও!'

নয়

পরদিন সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে সাবধানে আগে ট্রিশের ঘরে উঁকি দিল কিশোর। দরজা বন্ধ।

যা করার এখনই করতে হবে। সবাই উঠে পড়ার আগেই।

ঘণ্টা দুয়েকের বেশি ঘুমায়নি সে। কিন্তু পুরোপুরি সজাগ হয়ে আছে। দেহের প্রতিটি স্নায়ু সতর্ক। যেন নতুন কোন শক্তি এসে ভর করেছে শরীরে।

দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে পা টিপে টিপে রান্নাঘরে ঢুকল সে। আস্তে করে লাগিয়ে দিল দরজাটা। রিসিভারটা তুলে নিয়ে নম্বর টিপল। রবিনদের বাড়ির নম্বর।

ওপাশে রিঙ হতে থাকল। অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কিশোর।

চার বার রিঙ হলো। পঞ্চমবারে জবাব দিল একটা ঘুম জড়িত কণ্ঠ, 'হ্যালো?'

ধড়াস করে উঠল কিশোরের বুকের মধ্যে। অন্য কেউ নয়, রবিনই ধরেছে।

'রবিন? আমি। কিশোর।'

'কিশোর! এত সকালে! ইস্, কি ঘুমটা যে ভাঙালে! একটা দারুণ স্বপ্ন দেখছিলাম। একটা পালতোলা নৌকায় করে তুমি, আমি, মুসা সাগরে বেরিয়েছি। সূর্য অস্ত যাচ্ছে...'

'রবিন! ব্যাপারটা খুব জরুরী!' অধৈর্য হয়ে উঠছে কিশোর।

'ফিসফিস করে কথা বলছ কেন? কি হয়েছে?'

'একটা সাহায্য দরকার।'

'চলে আসতে বলছ ওশনসাইডে?'

'না না, তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরী। লাইব্রেরিতে গিয়ে পুরানো খবরের কাগজ ঘাঁটতে হবে। হেরিং বীচে গিয়ে মিস্টার অ্যান্ডারসন নামে একটা লোকের পরিবার সম্পর্কে যত খবর ছাপা হয়েছে, বের করতে হবে। পারবে?'

'কিছু ঘটেছে?'

'ঘটেছে। সাংঘাতিক ঘটনা। এখন সব বলার সময় নেই,' ঘন ঘন রান্নাঘরের দরজার দিকে তাকাচ্ছে কিশোর। ভয়, ট্রিশ না এসে পড়ে। 'সব জানলে পিলে চমকে যাবে তোমার। হেরিং বীচ টাইমস পত্রিকাটা দিয়ে শুরু করবে। দুই বছর আগের পত্রিকাগুলো দেখলেই চলবে। তার পরেরগুলো সব দেখতে পারো, তবে আগেরগুলো দরকার নেই।'

'কি ঘটেছে, সেটা অন্তত বলবে তো?'

'এরিক আর বেকিকে দেখাশোনার জন্যে একটা মেয়েকে চাকরি দিয়েছে চাচী। মেয়েটা অদ্ভুত।'

'এ দুনিয়ায় কে অদ্ভুত নয়?' শুকনো কণ্ঠে জবাব দিল রবিন। কণ্ঠ শুনেই বোঝা যাচ্ছে পুরোপুরি জেগে গেছে এখন সে। 'মুসা কোথায়? তোমার পাশেই আছে নাকি?'

'না। হোটেলে। বাড়িতে ঢোকাইনি ওকে। আমি চাইছি বাইরে বাইরে থেকেই তদন্ত করুক...'

ওপরতলায় নড়াচড়ার শব্দ হচ্ছে। উঠে গেছে কেউ। ফোন রেখে দেয়া দরকার।

'কিশোর, শুনছ?' ওপাশ থেকে ভেসে এল রবিনের কণ্ঠ।

'শুনছি। রাখি, রবিন। সবাই উঠে পড়েছে।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও, একটা কথা ভুলে গেছি,' রবিন বলল। 'মেরিচাচীর সুন্দরী বোনের মেয়েটা গিয়েছে তোমাদের ওখানে?'

থমকে গেল কিশোর। 'বোনের মেয়ে?'

'হ্যাঁ। তোমরা যাওয়ার পর পরই একটা মেয়ে গিয়েছিল তোমাদের রকি বীচের বাড়িতে। আমি তখন ও পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, ঢুঁ মেরে দেখে যাই তোমরা গেলে কিনা। মেয়েটা পড়ল সামনে। কাকে খুঁজছে জিজ্ঞেস করলাম তোমাদের কথা বলল। আমি বললাম, তোমরা ওশনসাইডে বেড়াতে চলে গেছ।'

'ও দেখতে কেমন?' গলা কাঁপতে শুরু করেছে কিশোরের।

'খুব সুন্দরী...'

ঝটকা দিয়ে কানের ওপর থেকে রিসিভারটা সরিয়ে ফেলল কিশোর। ছ্যাঁকা লাগল কানে। প্রচণ্ড গরম হয়ে গেছে। অবাক হয়ে রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে র[illegible] সে।

রক্ত বেরোতে শুরু করল ছিদ্রগুলো থেকে।

ওর আঙুল, হাত বেয়ে গড়িয়ে নামতে শুরু করল।

নিজের অজান্তেই অস্ফুট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। নিজেকেই বোঝাল, 'না না, রক্ত নয়। রিসিভারটা লাল বলেই মনে হচ্ছে রক্ত।'

কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, রক্তই।

রিসিভারের ভেতর শোনা যাচ্ছে রবিনের চিৎকার, 'কিশোর! কিশোর! কি হয়েছে?'

কানের ওপর রিসিভার ধরতে গেল আবার কিশোর। গরম ছ্যাঁকা লাগতে আবার সরিয়ে আনল। কোনমতে কানের কাছে ধরে রাখল। গরম আঁচ লাগছে। 'রবিন, অদ্ভুত কাণ্ড! প্রচণ্ড গরম হয়ে গেছে রিসিভারটা! কানে লাগালেই ছ্যাঁকা লাগে।...হ্যাঁ, জলদি বলো, মেয়েটা দেখতে কেমন!'

'খুব সুন্দরী!' জবাব এল। সেই সঙ্গে খিলখিল হাসি।

আতঙ্কে জমে গেল যেন কিশোর।

রবিনের কণ্ঠ নয় এটা। ট্রিশের।

কিন্তু কি করে সম্ভব? বাড়িতে তো ফোনের এক্সটেনশন নেই। একটামাত্র ফোন, রান্নাঘরেই আছে।

'আমার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া ছাড়ো, কিশোর পাশা। সেটাই এখন ভাল হবে তোমার জন্যে।'

কানের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটাল ট্রিশের খিলখিল হাসি। জ্যান্ত হয়ে উঠেছে যেন রিসিভারটা। জীবন্ত প্রাণীর মত ছটফট করছে। ধরে রাখতে পারল না কিশোর। হাত থেকে ছেড়ে দিল। মাটিতে পড়েও ডাঙায় তোলা মাছের মত লাফালাফি করতে লাগল যন্ত্রটা। রক্তে মাখামাখি।

চোখ বড় বড় করে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল সে।

লাউডস্পীকারের মত ওটার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে ট্রিশের কণ্ঠ, 'মেয়েটাকে নিয়ে এত কৌতূহল কেন তোমার, কিশোর? ও দেখতে কেমন, কেন এত জানার আগ্রহ? তোমাকে আর কষ্ট করে খুঁজে বের করতে হবে না, সময়মত মেয়েটাই তোমার কাছে হাজির হয়ে যাবে। তবে, মাই ডিয়ার কিশোর, সেটা তোমার জন্যে সুখকর হবে না মোটেও।'

দশ

বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ডটা। রান্নাঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে দুড়দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল কিশোর। দোতলায় উঠে হল ধরে ছুটল চাচা-চাচীর ঘরের দিকে।

বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকতে লাগল সে, 'চাচী, ওঠো! ফোনটার অবস্থা দেখে যাও!'

জবাব না পেয়ে দরজায় ঠেলা দিল। খুলে গেল পাল্লা। খালি ঘর।

বাইরে থেকে ঝনঝন আর নানা রকম ধাতব শব্দ কানে এল।

ঘরে ঢুকে জানালা দিয়ে উঁকি দিল। অবাক হয়ে দেখল একটা টো ট্রাক এসে ওদের দোমড়ানো গাড়িটাকে গ্যারেজে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছে। ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে দেখছেন চাচা-চাচী। কখন বেরোলেন? টেরই পায়নি সে।

জানালার কাছ থেকে সরে আসতেই ছোট একটা টেবিলের ওপর ট্রিশের দেয়া ফোন নম্বর আর ঠিকানা লেখা কাগজটা চোখে পড়ল ওর। ছোঁ মেরে সেটা তুলে নিয়ে ভাঁজ করে পকেটে রাখল।

চাচীকে দিয়ে ট্রিশের রেফারেন্সগুলোতে আরেকবার ভালমত খোঁজ নেয়ানো দরকার। তবে বিকৃত টেলিফোন সেটটার অবস্থা দেখলে বোধহয় তার আর প্রয়োজন হবে না। ট্রিশকে বিদেয় করে দেবে চাচী।

নিচে নেমে সামনের দরজার দিকে যাওয়ার আগে কৌতূহলী হয়ে উঁকি দিল আবার রান্নাঘরে, ফোনটার অবস্থা দেখার জন্যে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে। অস্ফুট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল আপনাআপনি।

ফোনটা ওটার ক্রেডলে স্বাভাবিক ভাবে বসে আছে।

প্রচণ্ড হতাশায় আরেকবার চিৎকার করে উঠল সে।

ঘটনাটা কি?

মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল ভয়ের শীতল শিহরণ।

মাথা কি সত্যি সত্যি খারাপ হয়ে গেছে আমার? ভাবল সে। ভুলভাল দেখছি? কিন্তু তাহলে খবরের কাগজের কাটিংটার ব্যাপারটা কি? ওটা তো সত্যি সত্যি পুড়েছে। তার প্রমাণ কার্পেটের পোড়া দাগটা। ওটা তো আছে।

এ সব কথা যদি চাচা-চাচীকে বলতে যায় এখন, পাগল হয়ে গেছে ভেবে তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখবে।

ক্লাউড আর থান্ডারের কিচির মিচির। মুখ ফিরিয়ে তাকাল সে। আনন্দে আছে পাখি দুটো। তারমানে বাড়িতে নেই এখন ট্রিশ। তাহলে আর আনন্দের গান বেরোত না ওদুটোর।

নিজের ঘরে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে বাইরে বেরিয়ে এল। ছাউনি থেকে সাইকেলটা বের করে নিয়ে বাড়ির পাশ ঘুরে চলে এল সামনের দিকে।

ভাঙা গাড়িটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখল টো ট্রাকটাকে।

চাচী জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছিস এখন?'

'ভাল,' জবাব দিয়ে সাইকেলে চেপে বসল কিশোর।

শহরে এসে একটা টেলিফোনের দোকান থেকে রবিনদের বাড়িতে ফোন করল আবার। ধরলেন রবিনের আম্মা। জানালেন, 'ও তো বেরিয়ে গেছে। বলল, পাবলিক লাইব্রেরিতে নাকি যাবে। তা তোমরা কেমন আছ?'

'ভাল।' বলে লাইন কেটে দিল কিশোর। কোনও ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে চায় না।

ফোনের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে মুসার হোটেলে রওনা হলো।

এগারো

হোটেলের সামনে সাইকেল রেখে ভেতরে ঢুকল কিশোর। ওয়েইটিং রূমে বসে থাকতে দেখল মুসাকে। কিশোরকে দেখে উঠে দাঁড়াল। কাছে এসে কোন রকম ভূমিকা না করে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের ট্রিশ বিড়ালের খবর

কি?'

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর। মাথা নেড়ে বলল, 'ওর কথা আর বোলো না। শুনলে বিশ্বাস করবে না।...চলো, বাইরে গিয়ে কথা বলি।'

হাঁটতে হাঁটতে মুসাকে সব জানাল কিশোর। তারপর বলল, 'আমার ধারণা আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল মুসা। 'তোমাকে পাগল মনে হচ্ছে না আমার। আগের বার যখন পাগল হয়েছিলে, অন্য রকম আচরণ করতে।'

মুসার কথায় অনেকটা স্বস্তি পেল কিশোর। 'একটা কথাও মিথ্যে বলিনি, বিশ্বাস করো। প্রতিটি ঘটনা ঘটেছে। কি করে ঘটল, এর কোন ব্যাখ্যা আমি দিতে পারব না। কিন্তু ঘটেছে।'

'মেয়েটাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া উচিত,' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে এমন করে বলল মুসা, যেন ট্রিশ শুনে ফেলবে।

'সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি,' কিশোর বলল। 'কিন্তু কি ভাবে?'

'বের করতে হবে কোন একটা বুদ্ধি,' তারের জালের মত চুলগুলোকে হাত দিয়ে ডলে নিজের অজান্তেই আরও চ্যাপ্টা করে দিল মুসা। 'কাল থেকে বহু লোককে জিজ্ঞেস করেছি, ট্রিশ নামে কাউকে চেনে কিনা। ওকেও চিনল না, ওর আন্ট জিরা কিংবা তার মেয়ে শীলাকেও না।'

পকেট থেকে ঠিকানা লেখা কাগজটা টেনে বের করল কিশোর। 'এই যে দেখো, ঠিকানা আছে।'

কাগজটার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে ফেলল মুসা। 'এ বাড়িতে থাকে বলেছে? অসম্ভব! কালকেই সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম ওখানে। বাড়ির কেয়ারটেকারের ছেলে প্রিটোর সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে আমার। বহুদিন নাকি খালি পড়ে আছে বাড়িটা। অনেক বছর আগে কয়েকজন লোক খুন হয়েছিল ওখানে, তারপর থেকে আর কেউ টিকতে পারে না ওখানে। লোকে বলে ভূত আছে। বদনাম হয়ে গেছে বাড়িটার। কেউ আর থাকতে চায় না ওখানে।' কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'বাড়িটা দেখতে চাও? হাতে সময় আছে? চলো তাহলে।'

'আছে। চলো। কিন্তু যাব কি ভাবে? বেশি দূরে?'

'হ্যাঁ, দূরেই। রেন্ট আ কার থেকে একটা গাড়ি ভাড়া নেয়া যেতে পারে।'

এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। মাথা ঝাঁকাল, 'বেশ, চলো নিয়ে নেয়া যাক। হোটেলেই দেখলাম রেন্ট আ কারের অফিস।'

শহর থেকে বেরিয়ে আসতে সময় লাগল না ওদের। উঁচু-নিচু পাহাড়ী পথ ধরে এগিয়ে চলল। একটা পুরানো নীল গাড়ি ভাড়া নিয়েছে। পুরানো হওয়াতে ভাড়া কম। কিন্তু ইঞ্জিনটা মন্দ না। মোটামুটি নিঃশব্দেই চলে।

কয়েক মিনিট পর একটা গেটের সামনে এনে গাড়ি রাখল মুসা বড়

একটা পুরানো বাংলো টাইপের বাড়ি দেখা গেল গেটের ওপাশে।

'বাপরে! চেহারা দেখেই তো মনে হচ্ছে পোড়ো বাড়ি! দিন দুপুরেই গা ছমছম করে,' কিশোর বলল।

'তাহলেই বোঝো,' মাথা দুলিয়ে বলল মুসা। 'দু'জন মেয়েমানুষ একা একা থাকতে আসবে এখানে কোন্ সাহসে? তার ওপর যদি বাড়ির বদনাম থাকে?'

আশেপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখল না কিশোর। একেবারে নির্জন।

'প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার জন্যে কিন্তু খুব সুন্দর জায়গা,' মুসা বলল। 'যে লোক বানিয়েছিল, বুঝে শুনেই বানিয়েছে। প্রিটোর কাছে শুনলাম, নিজে এসে মাঝে মাঝে থাকত। বাকি সময় ট্যুরিস্টদের কাছে ভাড়া দিয়ে রাখত। নামবে নাকি?'

'হুঁ,' ঘাড় কাত করে বলল কিশোর, 'নামা যায়।'

গাড়িটা রাস্তার এক পাশে রেখে নেমে পড়ল মুসা। কিশোরও নামল। রাস্তার অন্য পাশে খাড়া নেমে গেছে ঢাল। ঢালের গায়ে বড় বড় পাথর দেখা গেল। নিচে পাহাড়ের দেয়ালের কাছে আছড়ে পড়ছে সাগরের ঢেউ।

'কেমন লাগছে?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'দারুণ!'

'বোটে করে বেড়ানো যায়। একটা দ্বীপ আছে। নিয়ে গিয়েছিল প্রিটো। অনেক কিছু দেখিয়ে এনেছে।'

'বাপরে! একদিনেই অত? বহুত খাতির করে ফেলেছ দেখছি।'

হাসল মুসা। 'নাহলে তদন্ত করতাম কি করে? গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে লোকের সঙ্গে পরিচয় করতেই হয়।'

কিশোরও হাসল, 'আমার কথাই আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ মনে হচ্ছে?'

আবার এসে গাড়িতে উঠল ওরা। কয়েক মিনিট চলার পর ঢালু হয়ে এল পাহাড়ী রাস্তা। একপাশে সাগর চোখে পড়ছে। আরও মিনিট পাঁচেক পর সৈকতের ধারে একটা ছোট কাঠের কেবিন দেখা গেল। সামনে সাইনবোর্ডে লেখা: এখানে বোট ভাড়া দেয়া হয়।

ওদের দেখে বেরিয়ে এল একজন লোক। কিশোরকে দেখে হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কি, মুসা, বন্ধু?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'একটা বোট নেব?'

'প্রিটো এল না?'

'না, আমরাই এসেছি আজ।...ও কিশোর পাশা। রকি বীচ থেকে বেড়াতে এসেছে চাচা-চাচীর সঙ্গে।'

'ও। তা দেখো, কোন বোটটা নেবে।'

'কাল যেটা দিয়েছিলেন, সেটা নেই?'

'আছে।'

ঘরে গিয়ে আবার বেরিয়ে এল লোকটা। হাসিমুখে একটা চাবি বাড়িয়ে দিল।

কিশোরকে নিয়ে জেটির দিকে এগোল মুসা। দশ-বারোটা নানা আকারের বোট বাঁধা রয়েছে ঘাটে। একটাতে গিয়ে উঠল সে। কিশোরকে উঠতে ডাকল।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা। দেখা যাচ্ছে দ্বীপটা। সেদিকে বোট ছোটাল সে।

দ্বীপটার কাছে আসতে আধঘণ্টার বেশি লাগল না। প্রচুর পাথর দেখা যাচ্ছে সৈকতে। ছোট একটা খাঁড়িতে বোট ঢোকাল সে। নোঙর ফেলল। লাফ দিয়ে বোট থেকে নামল সে আর কিশোর।

'এটা আসলে একটা উপদ্বীপ,' মুসা বলল। 'সরু এক চিলতে উঁচু জায়গা দিয়ে যুক্ত।'

গাছপালার মধ্যে দিয়ে এগোল দু'জনে। তীর থেকে সামান্য দূরে বনের মধ্যে একটা কাঠের কেবিন। সেটা দেখিয়ে মুসা বলল, 'ওটা এক শিকারীর কেবিন। শীতকালে এসে থাকে। ফাঁদ পেতে শিয়াল ধরে। শিয়ালের চামড়ার ব্যবসা করে।'

কেবিনটার সামনে এসে দাঁড়াল দুজনে।

'ঢুকবে নাকি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

দ্বিধা করল কিশোর। 'অন্যের ঘরে ঢুকব?'

'অসুবিধে নেই,' মুসা জানাল। 'কাল প্রিটোর সঙ্গে ঢুকেছি। শিকারী নাকি তার বন্ধু। এক মৌসুমে প্রিটোও এসে শিকারীর সঙ্গে ছিল কিছুদিন শিয়াল ধরা দেখেছে।'

ঘরে ঢুকে চারপাশে তাকাতে লাগল কিশোর। একটা বড় চৌকি আছে। দু'জন ঘুমানোর উপযোগী। একটা চেয়ার, একটা ছোট টেবিল আছে। এক কোণে ভারী একটা কাঠের সিন্দুকও আছে।

ডালা তুলে দেখা গেল, তার মধ্যে চাদর, বালিশ, মশারি থেকে শুরু করে শাবল, বেলচা, ছুরি, হ্যারিকেন সব আছে। শিকারীর জিনিস। রেখে গেছে। শিকারে এলে তখন কাজে লাগে ওর।

'বেড়ায় ওটা কিসের দাগ?' আঙুল তুলে দেখাল কিশোর। 'রক্ত নাকি?'

মাথা ঝাঁকাতে গিয়ে হঠাৎ বলে উঠল মুসা, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। ট্রিশের হাত থেকে মুক্তির উপায়।'

আবার সিন্দুক খুলল সে। বড় একটা ছুরি বের করে এনে তুলে ধরল কিশোরের দিকে। 'ইচ্ছে করলে এটা ব্যবহার করতে পারো।'

'মানে!' চমকে গেল কিশোর।

মুসা বলল, 'ভয় লাগছে? বেশ। তুমি না করতে চাইলে নেই। আমিই করব।'

বারো

'কি বলছ তুমি?' চোখ বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের।

বিচিত্র হাসি ফুটল মুসার মুখে।

'তুমি···তুমি ওকে খুন করতে বলছ!'

'না,' মাথা নাড়ল মুসা। হাসিটা বাড়ল। 'ট্রিশের ঘরে কোথাও রেখে দেবে এটা। ড্রেসারের ড্রয়ারে কিংবা ওরকম কোন জায়গায়। তারপর কোন ভাবে রাশেদ আঙ্কেল আর মেরিআন্টিকে সেটা দেখানোর ব্যবস্থা করবে। ট্রিশের ড্রয়ারে এত্তবড় ছুরি লুকানো দেখলে একটা সেকেন্ড আর ওকে থাকতে দেবেন না ওঁরা।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। মুসার বুদ্ধিটা মন্দ না।

ছুরিটা ওর হাতে তুলে দিল মুসা।

ধারাল ফলাটার দিকে তাকিয়ে গা-টা কেমন শিরশির করে উঠল কিশোরের।

বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'এ কাজ করতেও ভয় লাগছে?'

'না, তা লাগছে না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'কিন্তু মিথ্যে দোষে দোষী করে ওকে বিদেয় করার কথা ভাবতে নিজেকে কাপুরুষ মনে হচ্ছে।'

'কাপুরুষ ভাবা যেত, যদি ও মানুষ হত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ট্রিশ ডাইনী। শয়তানের পূজা করে। ওকে এখন বাড়ি থেকে ভাগানোটাই আসল কথা। যে কোন কৌশলেই হোক।'

*

অনেকক্ষণ বনে-বাদাড়ে ঘোরাঘুরি করে আবার খাঁড়িতে বেরিয়ে এল ওরা। বোটে চাপল।

শহরে ফিরেও বাড়ি যেতে ইচ্ছে করল না কিশোরের। বাড়ির কথা, ওখানে ট্রিশ আছে–এ কথা মনে পড়লেই দমে যাচ্ছে কিশোর। মনে চাপ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু যেতেই হবে। কতক্ষণ আর বাইরে থাকবে?

একবার মনে হলো, হোটেলেই থেকে যায়। বাড়িতে ফোন করে দেবে মেরিচাচীকে। কিন্তু তাহলে আর ট্রিশের সঙ্গে বোঝাপড়া হবে না। অদ্ভুত, জটিল একটা রহস্যের সমাধানও হবে না। অগত্যা মুসার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাইকেলে চাপল কিশোর। বাড়ি ফিরে চলল।

বাড়ির গেটটা চোখে পড়তেই অস্বস্তি বোধটা বাড়ল তার। একটা অজানা ভয় চেপে ধরতে শুরু করল।

গেটের ভেতরে ঢুকল গাড়ি। দেখল, বাগানে এরিক আর বেকির সঙ্গে রয়েছে ট্রিশ।

কিশোরকে দেখে হেসে জিজ্ঞেস করল ট্রিশ, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

'বেড়াতে,' নীরস কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। সাইকেলটা স্ট্যান্ডে তুলে ট্রিশের দিকে এগোল।

লাল একটা ঢোলা শার্ট গায়ে দিয়েছে ট্রিশ। পরনে সাদা প্যান্ট। চুলগুলো ছেড়ে দেয়া। সুন্দর লাগছে ওকে। সুন্দরী ডাইনী!–ভাবল কিশোর।

'তোমার খালার বাড়িটা দেখে এলাম,' বলল কিশোর। 'পাহাড়ের গায়ে, সাগরের ধারে। ওখানে তো মনে হলো ভূত ছাড়া আর কিছু নেই। একজন মানুষও দেখলাম না।'

'মাত্র কয়েক দিন আগে বাড়িটা কিনেছে আন্ট জিরা,' সামান্যতম মলিন হলো না ট্রিশের হাসি। 'কিন্তু এখনও ওঠেনি ওখানে। মেরিআন্টিকে ঠিকানাটা যখন দিয়েছিলাম, মনে করেছিলাম দু'এক দিনের মধ্যেই ওই বাড়িতে উঠে যাবে আন্ট জিরা। কিন্তু একটা ভেজাল হয়েছে। বাড়ি বদলাবদলি নিয়ে কি রকম ঝামেলা বাধে, জানোই তো।'

'এখন কোথায় আছেন তোমার আন্ট জিরা?'

'প্যাসিফিক কাউন্টিতে। ওশনসাইডের পরের শহরটাই।'

'নাকি হেরিং বীচে?'

'উঁহু, ওশনসাইডেই।' দমল না ট্রিশ। আচমকা কিশোরের পকেটের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'ওটা কি? ছুরি মনে হচ্ছে?'

ঝট করে পকেটের দিকে তাকাল কিশোর। প্যান্টের পকেট থেকে বেরিয়ে আছে ছুরির মাথাটা। বড় বলে পুরোপুরি জায়গা হয়নি পকেটে। অসাবধান হওয়ার জন্যে মনে মনে নিজেকে একশো একটা গালি দিল কিশোর। শুকনো কণ্ঠে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ছুরি।...যাই।' চুরি করে ধরা পড়ে গেছে যেন এমন ভঙ্গিতে তাড়াহুড়ো করে সরে এল সেখান থেকে। সদর দরজার দিকে হাঁটতে লাগল। ঘরে ঢোকার আগে ফিরে তাকাল একবার। দেখল, তখনও তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ট্রিশ।

*

ঘরে ঢুকল কিশোর। ট্রিশ বাইরে। সুযোগটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। বরং এত সহজে ট্রিশের ঘরে ছুরি লুকানোর সুযোগ পেয়ে যাবে কল্পনাই করেনি।

চাচা-চাচী কাউকে দেখল না। বোধহয় নিজেদের বেডরূমে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

একটা সেকেন্ডও সময় নষ্ট না করে ছুটতে ছুটতে এসে ট্রিশের ঘরে ঢুকল কিশোর। টান দিয়ে খুলল ড্রেসারের ওপরের ড্রয়ারটা। সুন্দর ভাঁজ করে কাপড়-চোপড়গুলো গুছিয়ে রেখেছে ট্রিশ।

ব্যাগ থেকে ছুরিটা বের করল কিশোর। হাত কাঁপছে। জানালা দিয়ে এসে পড়া রোদের আলোয় ঝিক করে উঠল ছুরিটা।

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল কিশোরের। জিনিসটা ধরে রাখতে ভাল লাগছে না তার।

অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটল এ সময়। ছুরির ডগায় ধীরে ধীরে ফুটে উঠল এক বিন্দু রক্ত।

হাঁ হয়ে গেল কিশোর। বিশ্বাস করতে পারছে না।

চোখের আরও কাছে নিয়ে এল ছুরিটা, ভাল করে দেখার জন্যে।

ওকে চমকে দিয়ে বিন্দুটা যেখানে ফুটেছে সেখান থেকে আচমকা ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করল তাজা রক্ত।

আতঙ্কে অবশ হয়ে গেল সে।

ছুরি থেকে রক্ত বেরিয়েই ক্ষান্ত হলো না। ছরছর করে তার সমস্ত শরীরে ছিটানো শুরু করল।

তেরো

আতঙ্কিত চিৎকার করে উঠল কিশোর। ছুরিটা ছুঁড়ে ফেলল ড্রয়ারের মধ্যে।

ফোয়ারার মত রক্ত ছিটাতে ছিটাতে কাপড়-চোপড়ের মধ্যে ডিগবাজি খেয়ে পড়ল ছুরিটা।

অসহায় ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল কিশোর। বরফের মত জমে গেছে যেন। ছুরি থেকে রক্ত বেরিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে ট্রিশের কাপড়গুলো।

'অসম্ভব! এ অসম্ভব!' চিৎকার করে উঠল সে। স্বর বেরোতে চাইছে না। 'এ হতে পারে না!'

কখন যে দৌড়াতে শুরু করল নিজেও বলতে পারবে না। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল লিভিং রুমে। শূন্য ঘর।

পাখির খাঁচাটার দিকে চোখ পড়তে আরেকটা আতঙ্কিত চিৎকার বেরিয়ে এল কিশোরের মুখ থেকে।

এক পা এগোল। আরও এক পা। দাঁড়িয়ে গেল।

চিৎকার করে উঠল আবার।

থরথর করে কাঁপছে।

খাঁচার মধ্যে পড়ে রয়েছে ক্লাউড আর থান্ডার। দুটোরই গলা কাটা।

ঝটকা দিয়ে নিজের দুই হাত গলার কাছে উঠে এল কিশোরের। যেন তার গলাও কাটতে আসবে, সে-জন্যে গলা বাঁচাচ্ছে।

কিশোরের চিৎকার শুনে ওপর থেকে দৌড়ে নেমে এলেন মেরিচাচী। 'কিশোর, কি হয়েছে তোর? সারা গায়ে এত রক্ত কিসের?'

গলা থেকে একটা হাত সরিয়ে এনে খাঁচার দিকে দেখাল কিশোর।

'সর্বনাশ! এ কি করেছিস?'

চুপ করে রইল কিশোর। ভারী নীরবতা বিরাজ করতে থাকল ঘর জুড়ে।

সামনের দরজা দিয়ে কেউ ঢুকল বলে মনে হলো কিশোরের। দ্রুত চলে

গেল সিঁড়ি বেয়ে ওপরে। কিন্তু তাকাল না কিশোর। কে এল, সেটা নিয়েও কোন কৌতূহল নেই। সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে। কোন অনুভূতিও যেন নেই।

মেরিচাচী বললেন, 'আমার মাথায় ঢুকছে না, কিশোর, এমন একটা কাণ্ড তুই করলি কি ভাবে?'

চাচীর দিকে তাকাল কিশোর। চোখে শূন্য দৃষ্টি।

খানিক পরেই দুপদাপ করে দোতলা থেকে নেমে এল ট্রিশ। হাতে সেই ছুরিটা। রক্তে মাখামাখি।

'আন্টি,' চিৎকার করে উঠল ট্রিশ। ছুরিটা তুলে দেখাল। 'আমার ড্রয়ারের মধ্যে পড়ে ছিল এটা। দেখুন, রক্ত। আমার কাপড়-চোপড় সব শেষ। সব কিছুতে রক্ত লেগে গেছে...'

কিশোরের রক্ত লেগে থাকা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল সে। ধীরে ধীরে দৃষ্টি সরে গেল পাখির খাঁচার দিকে।

'এ কি!' ঝট করে ট্রিশের একটা হাত মুখের কাছে উঠে গেল। 'পাখিগুলো...পাখিগুলো...' চোখের পাতা আধবোজা করে কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'আমার ড্রয়ারে রক্ত...তারমানে পাখিগুলোর?'

'খবরদার, আর ভালমানুষ সাজতে হবে না!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। মুঠো হয়ে গেল হাতের আঙুল। 'ভান করে লাভ নেই। তুমি এ কাজ করেছ। তুমি। কি ভাবে করেছ, জানি না। কিন্তু এটা জানি, তুমিই খুন করেছ পাখি দুটোকে।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল ট্রিশের। 'কি বলছ তুমি, কিশোর? আমাকে তুমি দেখতে পারো না, জানি। কিন্তু এত বড় একটা দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে কল্পনাও করতে পারিনি।'

আরেকবার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করল কিশোর। কোনমতেই থামাতে পারল না নিজেকে। পাগলের মত চিৎকার করে উঠল, 'শয়তান! ডাইনী! বেরো আমার বাড়ি থেকে! বেরো! এক্ষুণি!'

হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকল বেকি আর এরিক। চেঁচামেচি কানে গেছে ওদেরও। খেলা বাদ দিয়ে ছুটে এসেছে।

ওপর থেকে নেমে এলেন রাশেদ পাশা। কিশোরের কথা কানে গেছে। 'চুপ কর, কিশোর!' ধমকে উঠলেন তিনি। 'আর একটা কথাও বলবি না বলে দিলাম।'

'দেখো, চাচা, দোহাই তোমাদের!' মরিয়া হয়ে বলল কিশোর, 'আমার কথা শোনো! বিশ্বাস করো! ট্রিশ একটা ডাইনী! সে যে কি সব কাণ্ড করছে...'

তার কথা শুনলেন না রাশেদ পাশা। স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'কি হয়েছে?'

'পাখি দুটোকে জবাই করা হয়েছে,' মৃদু কণ্ঠে স্বামীকে জানালেন মেরিচাচী। 'ছুরিটা পাওয়া গেছে ট্রিশের ড্রয়ারে।'

কিশোরের রক্তমাখা কাপড়ে চোখ বোলালেন রাশেদ পাশা। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আর দেরি করা যায় না। কালই ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

চোদ্দ

পরদিন সকাল। ডাক্তার রবার্টসনের অফিসে বসে আছে কিশোর।

ডা. রবার্টসন মানসিক রোগের চিকিৎসক। বয়েস ষাট। চুল পেকে গেছে প্রায় সবই। চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখলে মনে হয় ভেতরটা পর্যন্ত দেখে নিচ্ছেন।

কিশোরকে প্রায় জোর করে ধরে এনেছেন তার চাচা-চাচী।

কথাবার্তা বিশেষ বলছেন না ডাক্তার। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছেন। দুই হাত কোলের ওপর। কিশোরের কথা শুনছেন। মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন।

প্রথমে কথা বলতে চায়নি কিশোর। কিন্তু একবার শুরু করার পর আর থামতেও চাইছে না। পুরো ঘটনাটা গড়গড় করে আউড়ে দিয়ে ভারমুক্ত হতে চাইছে। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে। ট্রিশ আসার পর থেকে যা যা ঘটেছে সব বিস্তারিত বলে যাচ্ছে ডাক্তারকে।

কথা শেষ করে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে রইল জবাবের আশায়।

'হুঁ,' চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন অবশেষে ডাক্তার। 'বহু কাণ্ডই ঘটে গেছে।'

'তারমানে আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেছেন?' আশা বাড়ল কিশোরের।

'করেছি। তোমার মনে হয়েছে, যা যা ঘটেছে সবই বাস্তবে, তাই না?' জবাব দিলেন ডাক্তার।

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল কিশোর। ঠাস করে এক চড় মারা হলো যেন তাকে।

ডাক্তার ওকে মিথ্যুক ভাবছেন না। ভাবছেন বদ্ধ পাগল।

'তুমি কি বুঝতে পারছ,' কোমল স্বরে বললেন ডাক্তার, 'তোমার পাগল হয়ে যাওয়া নিয়ে চিন্তিত তোমার চাচা-চাচী? আগেও একবার হয়েছিলে তুমি, খুনে মগজ হয়ে গিয়েছিল, সে-জন্যেই তাঁরা এত বেশি চিন্তিত।'

'পাগল আমি হইনি, ডাক্তার সাহেব,' মরিয়া হয়ে বলল কিশোর। 'সত্যিই এ সব ঘটনা...'

'তোমাকে কয়েকটা কথা বলি, কিশোর,' ডাক্তার বললেন, 'ভাল করে ভেবে দেখো। তোমার আসলে কি হয়েছে শোনো। ট্রিশ আসার পর থেকেই

তোমার মনে হচ্ছে তোমার চাচা-চাচী আর আগের মত ভালবাসেন না তোমাকে। তাঁদের সব ভালবাসা চলে গেছে ট্রিশের ওপর। ট্রিশের সঙ্গে তাঁদেরকে ভাল আচরণ করতে দেখে তাকে ঘৃণা শুরু করেছ তুমি...'

হতাশ কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলল কিশোর, 'আপনিও বুঝতে পারলেন না, ডাক্তার সাহেব। একটা ভুল ধারণা করে বসলেন। মস্ত বড় ভুল।'

চেয়ার থেকে উঠে টেবিল ঘুরে এসে কিশোরের কাছে দাঁড়ালেন ডাক্তার। ওর কাঁধ চাপড়ে দিতে দিতে কোমল কণ্ঠে বললেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন তুমি বাইরে যাও। তোমার চাচা-চাচীকে পাঠিয়ে দাও। তাঁদের সঙ্গে কথা আছে আমার।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। ক্লান্ত ভঙ্গিতে পা টানতে টানতে ফিরে এল ওয়েইটিং রুমে। অস্থির, উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছেন চাচা-চাচী। মুখ তুলে তাকালেন।

'ডাক্তার সাহেব যেতে বলেছেন তোমাদের,' কিশোর বলল।

'কি হয়েছে? তোর মুখটা এত শুকনো লাগছে কেন?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন চাচী।

'জানি না,' মুখ কালো করে রাখল কিশোর।

ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে ঢুকলেন চাচা-চাচী। বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগল কিশোর। কি বোঝাচ্ছেন তাঁদেরকে ডাক্তার? ওকে ঘরে তালা আটকে রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন?

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। প্রচণ্ড রাগ হতে লাগল। কাউকে বিশ্বাস করাতে পারছে না।

সময় কাটছে। কিশোরের মনে হতে লাগল, অনন্তকাল ধরে ডাক্তারের চেম্বারে বসে আছেন চাচা-চাচী।

অবশেষে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলেন দু'জনে। থমথমে চেহারা। তাঁদের পেছনে বেরোলেন ডাক্তার।

'কিশোর,' কোমল স্বরে বললেন তিনি, 'পাঁচ দিন পর আবার আমার সঙ্গে দেখা করবে তুমি, ঠিক আছে? তার আগেই যদি আমার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন মনে করো, ফোন কোরো। রিসিপশন থেকে আমার কার্ড নিয়ে যাও। যা যা করতে বলেছি, মনে থাকে যেন। সমস্ত দুশ্চিন্তা মগজ থেকে বের করে দিয়ে শরীরটাকে আরাম দেয়ার চেষ্টা করবে। ঠিক হয়ে যাবে সব।'

প্রবেশ মুখের কাছে ছোট ডেস্কে বসা মেয়েটার কাছ থেকে ডাক্তারের ফোন নম্বর লেখা কার্ড নিয়ে নিল কিশোর। মেজাজ খারাপ লাগছে তার, শুধু শুধু চাচা-চাচী এতগুলো টাকা ডাক্তারের পেছনে খরচ করতে এসেছেন বলে। ঘোড়ার ডিমের ডাক্তার! কিচ্ছু ধরতে পারেনি!

'আমার সম্পর্কে কি বলেছে হাঁদা বুড়োটা?' বাইরে বেরিয়ে ওদের গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'যা ঠিক তা-ই বলেছেন,' রাশেদ পাশা বললেন। 'প্রচণ্ড স্নায়বিক চাপের

মধ্যে আছিস তুই। ভাবছিস, আমরা তোর পর হয়ে গেছি। অন্যের মেয়েকে তোর জায়গায় ঠাঁই দিচ্ছি বলে তার ওপর ঘৃণা জন্মেছে তোর।'

'আমাকেও এ কথাই বলেছে। কিন্তু মোটেও ঠিক নয় তার কথা।'

'তোর অবচেতন মনে চলছে এ সব, কিশোর,' মেরিচাচী বললেন, 'সে-জন্যেই তুই বুঝতে পারছিস না। ডাক্তার সাহেব ঠিকই ধরে ফেলেছেন। এত লেখাপড়া তো আর শুধু শুধু করেননি। নিজেকে সামলানোর চেষ্টা কর তুই, কিশোর। মগজটাকে শান্ত করার চেষ্টা কর। চিন্তা-ভাবনা সব দূর করে দে। তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে সব।'

'হুঁ, হবে! তুমিও তো দেখি ডাক্তারটার মত কথা বলছ! তোতাপাখির শেখানো বুলি।'

গাড়ির পেছনের সীটে উঠে বসল কিশোর। হেলান দিয়ে চোখ বুজল। আগের রাতে ঘুম হয়নি ভাল। ঘুমানোর চেষ্টা করল এখন। গাড়িতে বসে ঘুমানোটা তার ছোট বেলার অভ্যাস।

কিন্তু ঘুম এল না এখন। কয়েক মিনিট পর চাচীর ফিসফিসে ডাক কানে এল, 'কিশোর, ঘুমিয়েছিস?'

জবাব দিল না কিশোর। চাচীর সঙ্গে কথা বলতেও ভাল লাগছে না আর। চোখ মেলল না।

'ঘুমিয়ে পড়েছে,' নিচুস্বরে স্বামীকে বললেন মেরিচাচী। 'আচ্ছা, ট্রিশকে বিদেয় করে দিলে কেমন হয়?'

'এখন আর সম্ভব না,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন চাচা। 'ডাক্তার কি বললেন শুনেছ।'

'হ্যাঁ,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মেরিচাচী। 'ট্রিশকে বিদেয় করে দেয়ার অর্থ হলো কিশোরের মিথ্যে সন্দেহকে সাপোর্ট দেয়া। সেটা করাটা ঠিক হবে না, তাই না? কিশোরকে ধারণা দেয়া চলবে না কোনমতেই, যে তার কথাই ঠিক—ট্রিশ আমাদের জন্যে একটা হুমকি।'

'হ্যাঁ,' রাশেদ পাশা বললেন। 'ট্রিশকে বিদেয় করে দিয়ে লাভ নেই। ট্রিশ গেলে অন্য কাউকে রাখতে হবে আমাদের। তখন তার সঙ্গেও একই আচরণ শুরু করে দেবে কিশোর। তাকেও শত্রু ভেবে বসবে। তার পাগলামি নতুন করে শুরু করবে আবার।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি,' বিষণ্ন কণ্ঠে জবাব দিলেন মেরিচাচী। 'তারচেয়ে ট্রিশই থাক। নিজের আচরণ বদলে তার সঙ্গে মানিয়ে নিক কিশোর।'

'হ্যাঁ। কিশোরের ভালর জন্যেই এখন ট্রিশকে আর বিদেয় করা যাবে না।'

পেছনে বসে সব কথাই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে কিশোর।

চিৎকার করে বলে উঠতে ইচ্ছে করছে, কেন বুঝতে পারছ না তোমরা, ট্রিশ একটা অশুভ হুমকি আমাদের জন্যে। হাঁদা ডাক্তারটার বানোয়াট কথাগুলো কেন বিশ্বাস করছ তোমরা!

ট্রিশ অশুভ। ট্রিশ শয়তান। প্রচণ্ড তার ক্ষমতা। কোন সন্দেহই নেই

তাতে।

সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে চলল কিশোর। কি করব? কি করা যায়? ভাবতে ভাবতে একটা বুদ্ধি এল মাথায়। সবাইকে বুঝতে দিতে হবে, ডাক্তারের কথা মেনে নিয়েছে সে। তাতে চাচা-চাচীকে ঘাড় থেকে নামানো যাবে। ট্রিশকেও অসতর্ক করা যাবে।

এতক্ষণে চোখ মেলল কিশোর। বড় করে হাই তুলল। হাত-পা টানটান করল।

বাড়ির গাড়িবারান্দায় এসে গাড়ি থামতে সবার আগে নেমে পড়ল কিশোর। ঘরে ঢুকল।

হলঘরে মেঝেতে বসে বেকি আর এরিকের সঙ্গে লুডো খেলছে ট্রিশ। গোলাপী শার্ট আর প্যান্টে চমৎকার লাগছে ওকে। চুলগুলো পেছনে টেনে নিয়ে গিয়ে গোলাপী রঙের ফিতে দিয়ে বেঁধেছে। নিষ্পাপ মুখটা দেখে এখন কে বলবে তার মধ্যে বাস করে এক ভয়াবহ শয়তান।

'আরি, এসে গেছ,' কিশোরকে দেখে বলে উঠল ট্রিশ। 'তা কেমন কাটল?'

'ভাল,' হাসি হাসি কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'ট্রিশ, তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। কোন অসুবিধে আছে?'

'আরে না না, কি বলো, অসুবিধে কি?…এই এরিক, বেকি, ঘুঁটি নাড়বে না। কোনটা কোথায় আছে মনে আছে কিন্তু আমার। চুরি করে সুবিধে করতে পারবে না।'

'ঠিকই পারব। চুরি করলে তুমি ধরতেই পারবে না,' জবাব দিল এরিক। 'তবে আমি করব না।' কিশোরের দিকে তাকাল, 'কিশোর ভাই, তোমার অসুস্থতা একটু কমেছে?'

বেচারা এরিক। ওর জন্যে দুঃখ হলো কিশোরের। ও ভাবছে সত্যি সত্যি আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার জন্যে কষ্ট পাচ্ছে সে।

পেছনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল কিশোর আর ট্রিশ। চমৎকার বাতাস বইছে। চুল উড়তে লাগল দু'জনের।

'ট্রিশ,' কিশোর বলল, 'ডাক্তার বলেছেন, দোষটা আমার মগজে। এখন বুঝতে পারছি, অকারণে তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও। সত্যি, এ সব কি করলাম আমি গত কদিন ধরে! এত খারাপ লাগছে আমার…'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। নিজের অভিনয়ে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেল।

'না না, ঠিক আছে,' ট্রিশ বলল। 'এতে দুঃখ পাওয়ার কি হলো। এখন থেকে বন্ধু হয়ে যেতে পারি আমরা। এ কথা বলার জন্যেই আমাকে এখানে ডেকে এনেছ। ঘরে বললেও তো পারতে। যাকগে। চলো, লুডো খেলি।'

'না, এখন ভাল লাগছে না। মাথার মধ্যে কেমন করছে। শরীরটাও অবশ অবশ লাগছে। শুয়ে থাকিগে।'

'ঠিক আছে,' ট্রিশ বলল। 'যাও। ঘুমালেই সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখবে অনেক ভাল লাগছে।'

নিজের ঘরে চলে এল কিশোর। কাপড়-চোপড় ছেড়েই সোজা চিত হয়ে পড়ল বিছানায়।

মেরিচাচীর ডাকে ঘুম ভাঙল তার

উঠে বসল বিছানায়।

জানালা দিয়ে আসছে ধূসর আলো

দিনের বেশির ভাগটাই ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে।

'কিশোর, ওঠ,' মেরিচাচী বললেন । 'তোর ফোন।'

'মুসা?'

'না, রবিনের আম্মা।'

মুহূর্তে চোখ থেকে ঘুম উধাও হয়ে গেল কিশোরের। সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নেমে এসে রান্নাঘরে ঢুকল। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। 'আন্টি? কি খবর? রবিন কোথায়?'

'সেটা বলার জন্যেই তো ফোন করলাম,' কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন রবিনের আম্মা।

শঙ্কিত হলো কিশোর। 'কি হয়েছে ওর? খারাপ কিছু?'

'খারাপ মানে! ও এখন হাসপাতালে। বাঁচবে কিনা সন্দেহ!'

ধড়াস করে এক লাফ মারল কিশোরের হৃৎপিণ্ড। 'কি হয়েছে ওর?'

পনেরো

'গতকাল লাইব্রেরিতে হঠাৎ করেই একটা পত্রিকার ফাইলের ওপর ঢলে পড়ে সে,' রবিনের আম্মা জানালেন। 'নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে

'বলেন কি!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। রিসিভারে চেপে বসল আঙুল 'তারপর?'

'হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার কিছু বুঝতে পারছেন না কেন এমন হলো। নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এখন'

পেটের মধ্যে যেন খামচি দিয়ে ধরল কিশোরের ট্রিশের কাজ, কোন সন্দেহ নেই তার। আগের দিন ভোরবেলা রবিনের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রিশ শুনে ফেলেছে। তারপর কোন অদ্ভুত উপায়ে ফোনের লাইনকে মীডিয়াম বানিয়ে কিংবা অন্য কোন উপায়ে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে এ অবস্থা করেছে রবিনের।

'কিশোর, শুনতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করলেন রবিনের আম্মা।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আন্টি সরি এতটাই খারাপ লাগছে, কি বলব বুঝতে পারছি

না।'

'হ্যাঁ, তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। তোমাকে ফোন করার আরেকটা কারণ, তুমি কি জানো, কি খুঁজতে পত্রিকার অফিসে গিয়েছিল সে?'

'জানি। কিন্তু তার সঙ্গে নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরোনোর কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না,' আসল জবাবটা এড়িয়ে গেল কিশোর। দিয়েও কোন লাভ নেই। বিশ্বাস করবেন না মিসেস মিলফোর্ড। আর সবার মত তিনিও তাকে পাগল ভেবে বসবেন। কাঁপতে শুরু করেছে সে। হাতটা এত কাঁপছে, রিসিভার ধরে রাখতে পারছে না ঠিকমত।

'ড্রাগে আসক্ত হয়ে পড়েনি তো তোমার বন্ধু?' জানতে চাইলেন মিসেস মিলফোর্ড।

'প্রশ্নই ওঠে না। কোন রকম বদভ্যাস নেই রবিনের।'

'সেটা তো আমিও জানি। তবু জিজ্ঞেস করলাম, বলা তো যায় না—কোন অসৎসঙ্গে পড়ে যদি…যাকগে, তোমার কথাই বিশ্বাস করলাম।…রাখি এখন?'

'ঠিক আছে, আন্টি। কি হয় জানাবেন। আমি খুব দুশ্চিন্তায় রইলাম।'

'জানাব।'

লাইন কেটে গেল। রিসিভারটা ক্রেডলে রাখতে গিয়ে দেখল অতিরিক্ত হাত কাঁপছে। ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে মগজে। রবিনের এই অ্যাক্সিডেন্ট থেকে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল সে, পুরানো খবরের কাগজ ট্রিশের জন্যে বিপজ্জনক। ওর ঘরে ঢুকে বাকি কাটিংগুলো দেখতেই হবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। যে করেই হোক। ওই কাটিঙেই রয়েছে সমস্ত প্রশ্নের জবাব এবং সূত্র। ট্রিশের বিরুদ্ধে কিছু করতে হলে আগে ওর সম্পর্কে জানতে হবে ভালমত। জানতে হবে ওর আসল পরিচয়।

রান্নাঘরে ঢুকলেন মেরিচাচী। 'কিশোর, কি হয়েছে তোর? এত কাঁপছিস কেন?'

'চাচী, রবিন হাসপাতালে,' কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

অবাক হলেন মেরিচাচী। 'কি হয়েছে ওর?'

'শিওর না, চাচী। ডাক্তাররাও কিছু বুঝতে পারছে না।'

আর কিছু বলার সাহস পেল না কিশোর। যদি বলে ট্রিশকে সন্দেহ করছে সে, সকালে উঠেই ধরে নিয়ে রওনা হবে আবার ডাক্তারের কাছে।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মেরিচাচী জিজ্ঞেস করলেন, 'ট্রিশের সঙ্গে নাকি ভাব হয়ে গেছে তোর?'

'কে বলল?'

'ট্রিশ।'

'হ্যাঁ। ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি আমি।'

'ভাল করেছিস।'

'ওকে জানালাম, ডাক্তারের কাছে গিয়ে আমার ভুলটা ভেঙেছে বুঝতে

পারলাম, আমার নিজের মগজের মধ্যেই দোষ। চিন্তা কোরো না, চাচী। ট্রিশের সঙ্গে আর বাধবে না আমার।'

খুশি হতে পারলেন না মেরিচাচী। চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'না বাধলেই ভাল।'

'না, চাচী, বাধবে না। বলছি তো।'

'ঠিক আছে। ও, কিশোর, আমি আর তোর চাচা একটু বেরোব আমার এক পরিচিত লোকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। পার্টি দিচ্ছে বাড়িতে দাওয়াত করেছে আমাদের। ফিরতে দেরি হবে। বলা যায় না, রাতে আজ আর না-ও ফিরতে পারি। আজকে তো ট্রিশের ছুটি। আমরা যতক্ষণ না আসি এরিক আর বেকিকে দেখে রাখতে পারবি না?'

পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকাল কিশোর। ট্রিশ এসে দাঁড়াল দরজায়। 'কিশোরের শরীর খারাপ যখন, থাক না আন্টি, আজকে নাহয় সাপ্তাহিক ছুটিটা না-ই নিলাম।'

'না না, আমি ঠিক হয়ে গেছি,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। উষ্ণ হাসি হাসল ট্রিশের দিকে তাকিয়ে। 'আমিই ওদের দেখতে পারব। তোমার ছুটি তুমি নিয়ে নাও। ইচ্ছে করলে বাইরে থেকে ঘুরে আসতে পারো।'

ট্রিশকে বিদেয় করতে চাওয়ার দুটো কারণ। তার ঘর খুঁজে বাকি কাটিংগুলো পড়তে পারবে। সেই সঙ্গে যে দুটো ফোন নম্বর দিয়েছে সেগুলোতে আরেকবার ফোন করার চেষ্টা করে দেখতে পারবে।

'তা ছাড়া,' কিশোর বলল, 'ওদের তো ঘুমানোর সময়ই হয়ে গেছে। তেমন কিছু করা লাগবে না আমার। তা সন্ধেটা তুমি কি করে কাটাতে চাও, ট্রিশ?'

'ভাবিনি এখনও,' ট্রিশ জবাব দিল। 'তোমার শরীরটা খারাপ, অনেক ধকল গেছে, যদি চাও তো তোমাকেও সঙ্গ দিতে পারি।'

'যাক, মনে হচ্ছে মিলটা হয়েই যাচ্ছে দুজনের,' হেসে বললেন মেরিচাচী। ট্রিশের দিকে তাকালেন, 'তাহলে নিশ্চিন্তে বেরোতে পারি এখন আমি আর তোমার আঙ্কেল?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলে যান।'

'অকারণে আমার জন্যে তোমার ঘরে বসে থাকার দরকার নেই, ট্রিশ' কিশোর বলল। 'এরিক আর বেকিকে আমি সামলাতে পারব।'

'বেশ,' ট্রিশ বলল, 'বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আসি ওদের। ঘুমানোর আগে আমাকে না দেখলে শেষে ঘুমাতেই চাইবে না। দু-দিনেই নেওটা হয়ে গেছে।'

আহা, ন্যাকা! ট্রিশের কথা শুনে আর ভঙ্গি দেখে রাগে পিত্তি জ্বলে গেল কিশোরের। কোনমতে মুখের ভাব স্বাভাবিক রাখল সে।

তাড়াহুড়া করে চলে গেল ট্রিশ।

কিশোরের কপালে চুমু খেলেন মেরিচাচী। 'তোরা দুজনে মিল করে নিচ্ছিস, একটা ভার নেমে যাচ্ছে আমার মাথা থেকে। এত খুশি লাগছে

আমার। ট্রিশ যদি থাকেও ঘরে, দেখিস, ঝগড়া-টগড়া করিসনে আর।'

'না, করব না।'

কয়েক মিনিট পর রাশেদ পাশা ও মেরিচাচী গাড়িতে করে চলে গেলেন। নিজের ঘরে ফিরে চলল কিশোর। যাওয়ার সময় এরিক ও বেকির ঘরটা পড়ে। খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল, গল্পের বই পড়ে শোনাচ্ছে দুজনকে ট্রিশ।

তারমানে কিছুক্ষণ থাকতে হবে এখানে ট্রিশকে। এই সুযোগে ফোনটা করে ফেলা যায়। নিজের ঘরে ঢুকে, ট্রিশের দেয়া ফোন নম্বর লেখা কাগজটা নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল আবার কিশোর। ফিরে চলল রান্নাঘরে। এরিকদের ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কানে এল ট্রিশের পড়ার শব্দ।

রান্নাঘরে ঢুকে আস্তে করে দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর। এগিয়ে গেল ফোনের দিকে। দ্বিতীয় নম্বরটাতে ফোন করল, যেটাতে রিংই হয় না।

একবার। দুবার। তিনবার। পর পর সাতবার চেষ্টা করল কিশোর। আগের মতই অবস্থা। রিং হলো না।

'হুঁ, এটা আর কোনদিনই বাজবে না,' আনমনে মাথা দুলিয়ে বিড়বিড় করে অন্য নম্বরটার বোতাম টিপতে শুরু করল কিশোর। যেটা সব সময় বিজি পেয়েছে।

এবার উল্টো ফল ঘটল। একবার বাজতেই তুলে নিল রিসিভার ছেলেকণ্ঠে জবাব এল, 'হালো?'

'হ্যালো!' চমকে গেল কিশোর। জবাব পাবে আশা করেনি। 'আমি ট্রিশ অ্যান্ডারসনের ব্যাপারে খোঁজ নিতে ফোন করেছি। এ নাম্বারটা ট্রিশই দিয়েছে আমাদের।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ওপাশের ছেলেকণ্ঠ। ভীত মনে হচ্ছে কণ্ঠটাকে। 'আমি মিস্টার ব্রনসনের প্রতিবেশী। আমি আর আমার বাবা ঢুকেছি এ বাড়িতে। অনেক দিন ব্রনসনদের কোন খোঁজ নেই, দেখা পাচ্ছি না। তাদের ছেলেটাকেও দেখছি না। প্রথমে ভেবেছিলাম, বেড়াতে গেছে সবাই। কিন্তু আজকে সামনের দরজাটা হাঁ হয়ে খুলে থাকতে দেখে কৌতূহল হলো। তাই দেখতে এসেছি। দরজায় তালা ছিল না। বোধহয় বাতাসেই খুলে ফেলেছে।' একটু থামল ছেলেটা। 'বাড়িতে ঢুকে কি দেখেছি জানো? বললে বিশ্বাস করবে না!' গলা কেঁপে উঠল ছেলেটার। 'উহ্, কি ভয়ানক দৃশ্য! তিনটা লাশ…বীভৎস!…দুর্গন্ধে বমি আসছে আমার…বাবা পুলিশকে ফোন করছে মোবাইলে…'

টেলিফোনে ভেসে এল একজন লোকের গলা, 'কে রে, টবি?'

'ট্রিশের ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছে, বাবা!' জবাব দিল লাইনে থাকা ছেলেটা।

'ছাড়! জলদি ছেড়ে দে!' ধমকে উঠল পুরুষ কণ্ঠ।

'না না, প্লীজ!' অনুরোধ করল কিশোর। 'ছেড়ো না! আমার কথা

শোনো...'

'ট্রিশ তোমাকে এ নম্বর দিয়েছে? ও কোথায় এখন, জানো?' টবি জিজ্ঞেস করল।

'জানি। আমাদের এখানে। দুটো ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দেখাশোনার জন্যে রাখা হয়েছে ওকে...'

'তোমাদের বাড়িতে! মিস্টার ব্রনসনের ছেলেকে দেখাশোনার জন্যেও ওকেই রাখা হয়েছিল। ছেলেটার পচা বিকৃত মুখটা যদি এখন দেখতে। নাম কি তোমার?'

'কিশোর।'

'জলদি ভাগো, কিশোর! যদি বাঁচতে চাও! সবাই পালাও তোমরা! এক্ষুণি!'

'কেন? কেন পালাব?...হালো!...হালো!'

কেটে গেছে লাইন।

ষোলো

নীরব রিসিভারটা চোখের সামনে নামিয়ে আনল কিশোর। বোবা হয়ে তাকিয়ে রইল ওটার দিকে।

দরজার কাছে শব্দ শুনে ধড়াস করে উঠল তার বুক। চমকে উঠল ভীষণ ভাবে। ফিরে তাকাল।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ট্রিশ। ঠোঁটে বিচিত্র হাসি। 'কি হয়েছে ফোনটার?'

'না না, কিছু হয়নি,' তাড়াতাড়ি রিসিভারটা ক্রেডলে রেখে দিল কিশোর। 'একজনকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। তারপর মনে হলো, থাক।'

'কাকে? রবিনকে?'

কুঁচকে গেল কিশোরের ভুরু। 'ওর কথা তুমি জানলে কি করে?'

নির্বিকার থাকল ট্রিশ। রেফ্রিজারেটরের দিকে এগোল। 'আন্টি বলেছেন।'

'চাচী! রবিনের কথা তোমাকে বলতে যাবে কেন চাচী?'

'বলেছেন। কথায় কথায়।'

ট্রিশ যে মিথ্যে বলছে, তার বলার ভঙ্গিতেই বুঝতে পারল কিশোর।

রেফ্রিজারেটরের ডালা খুলে পানির বোতল বের করল ট্রিশ। ধীরে সুস্থে পানি ঢালতে শুরু করল গেলাসে।

টবির কথা কানে বাজতে লাগল কিশোরের: জলদি ভাগো, কিশোর! যদি বাঁচতে চাও! সবাই পালাও তোমরা! এক্ষুণি!

'আমি যাই।'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। তার কেবলই মনে হচ্ছে, এরিক আর বেকিকে···আর ভাবতে চাইল না।

মগজে চিন্তার ঝড় বইছে। তিনটা অপরিচিত বিকৃত লাশ কল্পনায় ভেসে উঠল। ওগুলোর সঙ্গে যুক্ত হতে দেখল আরও দুটো–এরিক আর বেকি। এবং তারপর আরও তিনটে···

দৌড়ে এসে দাঁড়াল এরিকদের ঘরের সামনে। দেখল এরিক আর বেকি ভালই আছে। এরিকের হাতে একটা কমিকের বই। পাশের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছে বেকি।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন কিশোরের। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। জিজ্ঞেস করল, 'এরিক, তোরা ভাল আছিস?'

'ভাল থাকব না কেন?' অদ্ভুত দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল এরিক। কিশোর বুঝতে পারল, তাকে এখনও পাগল ভাবছে এরিক।

'কিশোর ভাই, ট্রিশ আপা কই?' এরিক জিজ্ঞেস করল। 'আমার জন্যে দুধ আনতে গেছে বলে গেল। এত দেরি করছে কেন?'

'রান্নাঘরে,' জবাব দিল কিশোর। 'মনে হয় দুধ বানাচ্ছে।'

টবির কথা কি শোনা উচিত? ভাবছে কিশোর।

বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাবে এরিক আর বেকিকে?

কোথায় যাবে?

চাচা-চাচীর কাছে চলে যেতে পারে। কিন্তু তাতে আরও খেপে যাবেন তাঁরা। সবাইকে সহ আবার বাড়ি ফিরে আসবেন। কিশোরকে ধরে নিয়ে যাবেন ডাক্তারের কাছে। মাঝখান থেকে ট্রিশের সঙ্গে তার ভাব করার অভিনয়টা যাবে ফাঁস হয়ে।

উঁহু, ওদেরকে বের করে নিয়ে গিয়ে লাভ নেই। বরং আজ রাতে ট্রিশকেই বিদেয় করার চেষ্টা করতে হবে। তারপর খবরের কাগজের কাটিংগুলো বের করে দেখাবে চাচা-চাচীকে। ওগুলো পড়লে আর কিশোরের কথায় অবিশ্বাস করতে পারবেন না তাঁরা। এ কাজে মুসার সাহায্য দরকার তার। হোটেলে ফোন করতে চলল কিশোর।

রান্নাঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখল, ট্রিশের হাতে একটা ছোট প্যাকেট। সেটা থেকে বাদামী রঙের পাউডার ঢালছে দুধের গ্লাসে।

বুকের মধ্যে কাঁপুনি বেড়ে গেল কিশোরের। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল।

কি রয়েছে প্যাকেটে?

বিষ?

ওই দুধ কোনমতেই এরিককে খেতে দেয়া যাবে না।

ভারী দম নিয়ে ঠেলে পাল্লাটা পুরো খুলে ফেলল কিশোর। ট্রিশের

সামনে এসে কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তারপর? কি সিদ্ধান্ত নিলে?'

'কিসের সিদ্ধান্ত?' ভুরু নাচাল ট্রিশ।

'ওই যে, তোমার ছুটির। রাতটা কি করে কাটাবে?'

'কিছুই ঠিক করিনি,' জবাব দিল ট্রিশ। 'কোথায় আর যাব একা একা। তারচেয়ে ঘরে বসে বসে লেখার চেষ্টা করিগে।'

'লেখা মানে?'

'গল্প লিখছি। পত্রিকায় পাঠাব। শেষ হয়ে এসেছে। আর ঘণ্টা দু'তিনেক খাটলেই শেষ হয়ে যাবে।'

ভেতরে ভেতরে দমে গেল কিশোর। কিন্তু হাসিটা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল। 'ও, তাই নাকি? তোমার যে লেখার হাতও আছে তা তো জানতাম না। আমার অবশ্য ওসব ট্যালেন্ট একেবারেই নেই। তোমার জায়গায় আমি হলে এখন রাত-দিন মানতাম না। বেরিয়ে চলে যেতাম। শহরে গিয়ে ফাস্ট ফুডের দোকানে ঢুকতাম। কাবাব খেতাম। তারপর সিনেমা দেখতে যেতাম।'

'ওসব আমারও খারাপ লাগে না। কিন্তু একা একা যেতে ইচ্ছে করছে না এখন।' কিশোরের দিকে মুখ তুলে তাকাল ট্রিশ। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। 'কিন্তু তুমি আমাকে বিদেয় করার জন্যে এমন পাগল হয়ে উঠলে কেন?'

রক্ত সরে গেল কিশোরের মুখ থেকে। জোর করে হেসে রসিকতার চেষ্টা করল, 'আ-আমি তো পাগলই!...আসলে, ভাবলাম, কাজটাকে যাতে তুমি চাকরি মনে না করো...ছুটির স্বাধীনতাটা পুরোপুরি ভোগ করতে পারো...বিরক্ত হয়ে চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে তুমি চলে গেলে এরিক আর বেকিকে দেখবে কে?'

ব্যস্ত হয়ে উঠল ট্রিশ। 'এহ্‌হে, দিলে তো দেরি করিয়ে। এরিক নিশ্চয় অস্থির হয়ে গেছে...'

দুধের গ্লাসটা ধরতে গেল ট্রিশ।

তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে গ্লাসটা চেপে ধরল কিশোর। 'আমিই নিয়ে যাচ্ছি। যত যা-ই বলো, তোমার আজকে ছুটি। কোনমতেই কাজ করতে দেব না। বাইরে যেতে ইচ্ছে না করলে ঘরে বসে গল্পই লেখোগে।'

গ্লাসটা নেয়ার জন্যে চাপাচাপি করল না ট্রিশ। বলল, 'হ্যাঁ, তা-ই করিগে।'

'হ্যাঁ, যাও,' বলল বটে, কিন্তু মনে মনে একেবারে দমে গেছে কিশোর। কোনমতেই বের করা গেল না ট্রিশকে। এত সহজে গ্লাসটা তাকে দিয়ে দেয়ার কারণটাও অনুমান করতে পারছে। বিষ দিয়ে নিজের এরিককে খুন করার দায়টা পড়বে কিশোরের ঘাড়ে। পাগল হয়ে গিয়ে ছেলেটাকে খুন করেছে কিশোর—ডাক্তার, পুলিশ সবাই একবাক্যে বলবে সে-কথা।

'গ্লাসটা নিয়ে যাও তুমি,' ট্রিশ বলল। 'আমি আসছি। আমার এঁটো

বাসন-পেয়ালাগুলো ধুয়ে রেখে আসি।'

গ্লাসটা নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। কি করবে এখন? গ্লাসটা যদি এরিককে না দেয় নেমে চলে আসবে সে। দুধের জন্যে চেঁচানো শুরু করবে। আরেক গ্লাস বিষ মেশানো দুধ বানিয়ে দেবে ট্রিশ।

দুধটা না ফেলার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। ট্রিশ তার ঘরে গিয়ে দরজা লাগিয়ে না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। দেখা যাক, দুধ না পেয়ে এরিক কি করে।

এই সময় দরজার ঘণ্টা বাজল। দুধের গ্লাসটা হাতে নিয়েই গিয়ে দরজা খুলে দিল সে। মুসাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল।

'কি ব্যাপার, তোমার কোন খবরই নেই?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'ভাবলাম কি জানি কি অঘটন ঘটে গেল। তাই দেখতে এলাম। বাড়িটা খুঁজে বের করে নিতে অসুবিধে হয়নি...'

হাত ধরে মুসাকে একটানে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, 'তুমি এসে বাঁচালে আমাকে। তোমাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।' গ্লাসটা দেখিয়ে বলল, 'আমি শিওর, এর মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে ট্রিশ। কায়দা করে ওর কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছি। এরিককে খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছিল...'

'বলো কি!' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। 'দুধের মধ্যে বিষ! তারমানে তাড়ানো যায়নি এখনও ওকে। ছুরিটার কি খবর?'

'আস্তে বলো! কি যে ঘটেছে, বললে বিশ্বাস করবে না। এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড...'

কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই আচমকা তার পাশ কাটানোর চেষ্টা করল মুসা। ধাক্কা লেগে কিশোরের হাত থেকে গ্লাসটা পড়ে ভেঙে গেল।

'এহ্হে,' চিৎকার করে উঠল মুসা, 'কি করলাম, দিলাম সর্বনাশ করে!'

রান্নাঘরের দরজার দিকে ওকে তাকিয়ে থাকতে দেখে কিশোরও ঘুরে তাকাল। ট্রিশ বেরিয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। 'অসুবিধে নেই। আমি এখুনি ন্যাকড়া নিয়ে এসে মুছে দিচ্ছি।'

'থ্যাংকস,' কিশোর বলল।

মুসার দিকে তাকিয়ে রইল ট্রিশ। কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বন্ধু বুঝি?'

'হ্যাঁ। মুসা আমান। আজই রকি বীচ থেকে এসেছে।'

'হাই,' হাত বাড়িয়ে দিল ট্রিশ। 'আমি ট্রিশ।'

'হাই,' হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল মুসা।

ট্রিশ আবার রান্নাঘরে চলে গেলে ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'বুদ্ধিটা ভালই করলে।...ছুরিটার কথা পরে বলব। জলদি আরেকটা বুদ্ধি বের করো। ট্রিশকে খানিকক্ষণের জন্যে আমার ঘাড় থেকে নামাও। ওর ঘর তল্লাশী করতে হবে আমার। বেড়াতে নিয়ে যাও, কিংবা যা খুশি করো। যত বেশি

সময় দিতে পারবে আমাকে...'

'কি করে নেব?'

'আজ ওর ছুটি। সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে দেখতে পারো।'

'যদি না যায়?'

'দেখই না চেষ্টা করে।'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল ট্রিশ। হাসিমুখে এগিয়ে এসে ন্যাকড়া চেপে ধরল মাটিতে। দুধ শুষে নিল কাপড়। সেটা নিয়ে গিয়ে দরজার বাইরে চিপে ফেলে দিয়ে এল ট্রিশ। দুধে ভেজা মেঝেটা মুছে দিতে লাগল। মোছা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে হাসল মুসার দিকে তাকিয়ে। কিশোরের দিকে ফিরল। 'যাই, এরিককে আরেক গ্লাস দুধ বানিয়ে দিয়ে আসি। মুশকিল হলো, চকলেট পাউডার শেষ। সব ঢেলে দিয়েছিলাম এ গ্লাসটাতে। দেখি, খালি দুধ খেতে যদি রাজি হয় সে।'

'চকলেট!' নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করল কিশোর। তারমানে কি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি? ভাবল সে। চকলেট পাউডারকে ভাবছি বিষ?

মুসাকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল কিশোর। মুসার চোখেও প্রশ্ন।

'থাক, তোমার যেতে হবে না,' ট্রিশকে বাধা দিল কিশোর। 'আমিই যাচ্ছি দুধ বানাতে। তুমি মুসার সঙ্গে কথা বলো।'

'এসেছিলাম কিশোরকে নিয়ে যেতে,' মুসার কথা কানে এল কিশোরের। 'সিনেমা দেখতাম। ও তো রাজি হলো না। নতুন জায়গা। একা একা যেতে ভালও লাগছে না আমার। তুমি যাবে? গাড়ি আছে আমার সঙ্গে।'

'তারচেয়ে বরং চলো গাড়িতে করেই ঘুরে আসি খানিক,' মুসা আর কিশোর দু'জনকেই অবাক করে দিয়ে রাজি হয়ে গেল ট্রিশ। 'রাতের বেলা গাড়িতে চড়তে ভাল লাগে আমার।'

উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল কিশোরের। রান্নাঘর থেকে শুনতে পেল ট্রিশের কথা, 'তুমি এক মিনিট দাঁড়াও। আমি চট করে শার্টটা বদলে আসি।'

ট্রিশ ওপরে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিভিং রুমে ফিরে এল কিশোর। মুসাকে বলল, 'দেখো, তোমার ওপর না আবার আসর করে বসে!'

'ভয় দেখিও না, প্লীজ! তাহলে কিন্তু যেতে পারব না বলে দিলাম!' মুসা বলল। 'কতক্ষণ বাইরে থাকব। ঘণ্টা দুয়েকে হবে?'

'হবে। কিন্তু সাবধান, মুসা। খুব সাবধানে থাকবে। আমার ভয় লাগছে।'

'তুমি যখন ভয় পাচ্ছ, সাংঘাতিক মেয়েই ও, বোঝা যাচ্ছে। ঠিক আছে, সাবধানেই থাকব...'

'এই যে, মুসা,' সিঁড়ির ওপর থেকে বলল ট্রিশ, 'আমি চলে এসেছি।' কিশোরের দিকে ফিরল সে। 'কিশোর, আমরা বাইরে যাচ্ছি। নিশ্চয় বলেছে

তোমাকে মুসা। গাড়িতে করে একটু-পাহাড়ের ওদিক থেকে ঘুরে আসিগে।'

বাইরে ওদের গাড়ির শব্দটা গেটের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিল কিশোর। রান্নাঘরে ঢুকে দুধের গ্লাসটা নিয়ে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি বেয়ে প্রায় দৌড়ে উঠে এল দোতলায়। এরিকদের ঘরে ঢুকে বলল, 'এই যে, নাও তোমার দুধ।...এরিক, ও ঘুমিয়ে পড়েছে...'

গ্লাসটা টেবিলে রেখে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল সে। কমিকের বইটা এরিকের বুকের ওপর পড়ে আছে। আস্তে করে হাত তুলে বইটা সরিয়ে রাখল কিশোর। বেকির মাথাটা কাত হয়ে পড়ে আছে। বালিশটা ঠিক করে দিল ওর মাথার নিচে। আলো নিভিয়ে, ডিম লাইটটা জ্বেলে দিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। টেনে ভেজিয়ে দিল দরজাটা।

রান্নাঘরে ফিরে এল কিশোর। সেই নম্বরে ফোন করল আবার, যেটাতে সাড়া দিয়েছিল টবি নামের ছেলেটা। মিস্টার ব্রনসনের বাড়িতে কি ঘটছে জানা দরকার।

কিন্তু বার বার চেষ্টা করেও আর লাইন পেল না কিশোর। বিজি হয়ে আছে ফোন। সময় দ্রুত কেটে যাচ্ছে। ফোনের পেছনে আর সময় নষ্ট না করে কাটিংগুলো খুঁজে বের করা দরকার।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আবার দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল কিশোর। ট্রিশের ঘরে ঢুকল। ছুরি থেকে বেরিয়ে পড়া রক্তের দাগ লেগে আছে এখনও কার্পেটে।

টান দিয়ে ড্রেসারের ড্রয়ার খুলল সে। রক্ত লাগা কাপড়গুলো সরিয়ে ফেলেছে ট্রিশ। এটা একটা স্বস্তি। কিন্তু ড্রয়ারের গায়ে রক্তের দাগ রয়েছে। ছুরি থেকে রক্ত বেরোনোর দৃশ্যটা কল্পনা করে শিউরে উঠল কিশোর।

আতিপাতি করে খুঁজেও ওপরের ড্রয়ারটায় একটা কাটিংও পাওয়া গেল না। দ্বিতীয়টা খুলল। একের পর এক ড্রয়ার খুঁজে চলল সে। কোনটাতেই পেল না।

শুধু কাপড়-চোপড়।

কাগজের চিহ্নও নেই।

ড্রেসারের ড্রয়ার, ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার, সব জায়গায় খুঁজল বিছানার তলায় খুঁজল। কোথাও নেই। চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকাতে লাগল চারপাশে। কোথায় রাখল? জুতোর শেলফটার দিকে তাকাল। দু'তিন জোড়া লেডিস জুতো আর স্যান্ডেলের নিচে একটা জুতোর বাক্স।

বাক্সটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে এগিয়ে গেল সেদিকে। বাক্সটা বের করে এনে ডালা খুলল। চামড়ার একজোড়া গোড়ালি-ঢাকা নতুন বুট। আশা করেছিল, বাক্সের মধ্যে দেখতে পাবে কাগজগুলো। কিন্তু নিরাশ হতে হলো।

বুট দুটো আবার বাক্সে ভরে রাখতে গিয়ে কাত হয়ে গেল একটা বুট। খোলা মুখটা নিচের দিকে। ঝরঝর করে ভেতর থেকে ঝরে পড়ল কয়েকটা কাগজ।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিশোরের মুখ। এই তো পাওয়া গেছে।

জুতোটাকে ভালমত উপুড় করে ধরে ঝাঁকি দিতেই বাকি কাগজগুলোও পড়ল। আর আছে কিনা দেখার জন্যে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল সে। আর নেই।

মাটিতে পড়ে থাকা কাটিংগুলো থেকে একটা কাটিং তুলে নিল সে। লেখাগুলো ট্রিশ কিংবা লীলা সংক্রান্ত নয়। ওল্টাল কাগজটা। স্থির হয়ে গেল।

বক্স করে ছাপা লেখাটার ওপরে একটা ছবি। তাতে তিনজন লোকের যৌথ ফটো। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তিনজনেই হাসিমুখে তাকিয়ে আছে ক্যামেরার দিকে।

কিশোরের স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ, মাঝখানের ছবিটা তার পরিচিত।

বেকি আর এরিকের বাবা মিস্টার হোমার।

সতেরো

কম্পিত হাতটাকে যতটা সম্ভব স্থির রাখার চেষ্টা করতে করতে কাটিংটা পড়ল কিশোর:

রকি বীচের সরকারি উকিল মিস্টার হোমার হেরিং বীচের জনৈক ভবঘুরে মিস্টার ডাভ মিলারের পক্ষ নিয়ে আদালতে লড়ছেন। আগুন লাগানোর অভিযোগ আনা হয়েছে মিস্টার মিলারের বিরুদ্ধে।

গত মঙ্গলবার সিক্সথ জুন স্ট্রীটের পার্কিং লটের কাছ থেকে তাকে দৌড়ে পালাতে দেখা গেছে। ওই সময় আগুন দেখা যায় অ্যান্ডারসন কোম্পানির অফিস থেকে। মিস্টার অ্যান্ডারসন একজন বিখ্যাত উকিল।

মিস্টার অ্যান্ডারসন!

ট্রিশ আর লীলার বাবা! ভাবছে কিশোর। পড়তে লাগল আবার:

মিস্টার ডাভ মিলার দাবি করেছে, ওই সময় সস্তা খাবারের দোকান থেকে বার্গার কিনে পার্কিং লটে বসে খাচ্ছিল সে। এ সময় আগুন দেখতে পায় মিস্টার অ্যান্ডারসনের অফিসের জানালায়।

কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করেনি পুলিশ। রেল লাইনের পাশে একটা ভাঙা বাড়িতে থাকে মিস্টার মিলার তার বাড়িতে গ্যাসোলিনের খালি টিন পেয়েছে। তাতে খানিকটা পেট্রল তখনও ছিল। সে জানিয়েছে, অ্যান্ডারসনের কাছে একদিন টাকা ভিক্ষে চাইতে গিয়ে অপমানিত হয়েছে। পুলিশের দৃঢ় বিশ্বাস, অপমানের প্রতিশোধ নিতেই আগুন লাগিয়ে অফিস পুড়িয়ে দিয়েছে মিস্টার মিলার। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

বোঝা যাচ্ছে না কিছু। একজন ভবঘুরের পক্ষে লড়াই করেছেন মিস্টার হোমার, তাতে ট্রিশের কি?

আরেকটা কাটিং তুলে নিতে যাবে কিশোর, বাইরে গাড়ি থামার শব্দ হলো। জানালার কাছে দৌড়ে এসে উঁকি দিল নিচে।

মুসা আর ট্রিশ। এত তাড়াতাড়ি চলে এল!

গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে ততক্ষণে ট্রিশ।

কি করবে এখন? কি করা যায়? আতঙ্কে জমে গেল যেন কিশোর।

কাগজের টুকরোগুলো তুলে নিল মুঠো করে। জুতোর বাক্সটা খুলে পড়ে আছে। বুট দুটো মেঝেতে।

কি করবে?

বুট দুটো প্রথমে বাক্সে ঢুকিয়ে ফেলতে হবে। তারপর বাক্সটা রেখে দিতে হবে জায়গামত।

বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। পাগলের মত বুট দুটো বাক্সে ভরতে শুরু করল সে। তাড়াহুড়োয় ভেতরে রাখতে পারছে না ঠিকমত। যতখানি পারল, ঠেসে ভরে ডালাটা চেপে বসিয়ে দিল ওপরে। বাক্সটা তুলে রেখে দিল যেখান থেকে নামিয়েছিল।

নিচে সদর দরজা লাগানোর শব্দ হলো। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। ওপরে উঠে আসছে ট্রিশ।

ওর অলক্ষে কোনমতেই এখন আর এ ঘর থেকে বেরোতে পারবে না সে। সামনের বারান্দা ছাড়া বেরোনোর আর কোন পথ নেই।

কাটিংগুলো হাতে নিয়ে খাটের নিচে ঢুকে গেল কিশোর। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। শব্দ কমানোর জন্যে হাতে কামড় বসাল।

'আলোটা জ্বেলে রেখেই বেরিয়েছিলাম নাকি?' আনমনে বিড়বিড় করল ট্রিশ। ওর পায়ের নড়াচড়া দেখেই বোঝা গেল, সারা ঘরে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে।

স্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ কিশোর। একটা কাটিং পড়ে আছে কার্পেটের ওপর। দেখতে পায়নি সে। ঠিক ওটার কয়েক ইঞ্চির মধ্যে চলে গেল ট্রিশের পা।

ঝুঁকে কাটিংটা তুলে নিল ট্রিশ।

জুতোর বাক্সটা টেনে নামাতে দেখল কিশোর। পরক্ষণে সোজা হয়ে গেল ট্রিশ। দরজার দিকে ছুটল।

'কিশোর! কিশোর?' বলে ডাকতে শুরু করল দরজার বাইরে গিয়ে।

ট্রিশের কণ্ঠস্বর শুনেই অনুমান করতে পারল কিশোর, কোথায় আছে ও পায়ের শব্দ বুঝিয়ে দিল কিশোরের ঘরের দিকে যাচ্ছে।

এটাই সুযোগ, ভাবল কিশোর।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে বেরিয়ে চলে এল খাটের নিচ থেকে। লাফ দিয়ে উঠে দরজার দিকে ছুটল।

চাচা-চাচীকে দরকার এখন তার। কাটিংগুলো ওদেরকে দেখিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে, ট্রিশের এখানে আসার অন্য উদ্দেশ্য আছে।

এতটাই ভয় পেয়ে গেছে কিশোর, চিন্তা করতে পারছে না ঠিকমত।

এরিক আর বেকিকে একলা বাড়িতে ফেলে যাওয়া কি এখন ঠিক হবে?

ওরা ঘুমিয়ে আছে, নিজেকে বোঝাল কিশোর। অল্পক্ষণের মধ্যেই চাচা আর চাচীকে নিয়ে ফিরে চলে আসবে। তারপর ঠিক হয়ে যাবে সব।

বড় করে দম নিয়ে বারান্দা ধরে দৌড় মারল কিশোর।

দেখে ফেলল ট্রিশ। রাগে চিৎকার করে উঠল, 'কিশোর! কি করছ···অ্যাই!'

কিন্তু ফিরল না কিশোর। সোজা ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বেরিয়ে চলে এল বাড়ির সামনের দরজা দিয়ে বাইরে।

সামনের লনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল মুসাকে। কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর, 'মুসা, তুমি আছ! বাঁচলাম!'

'শহরে ঢুকতে না ঢুকতেই মত বদলে ফেলল ট্রিশ,' মুসা জানাল। 'যেতে চাইল না আর। বলল, বাড়ি ফিরে যাবে···'

'মুসা, কথা পরে হবে!' কিশোর বলল। 'জলদি স্টার্ট দাও। চাচা-চাচীর কাছে যেতে হবে আমাকে। এক্ষুণি।'

আধ সেকেন্ড দ্বিধা করল মুসা। দৌড় মারল গাড়ির দিকে। কিশোর আর সে প্রায় একই সঙ্গে দু'দিক থেকে গাড়িতে উঠে বসল।

ইঞ্জিন চালু হলো। টায়ারের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলে নাক ঘোরাল গাড়ি। গেটের দিকে ছুটল।

'আমি···আমি কাটিংগুলো নিয়ে এসেছি!' কিশোর বলল। 'চাচা-চাচীকে দেখাতে হবে এগুলো। আমি···' মুসাকে দেখাতে গিয়ে একটা কাটিঙের লেখায় চোখ পড়তে থেমে গেল সে। জোরে জোরে পড়তে শুরু করল:

'···ভবঘুরে মিস্টার মিলার আজ ছাড়া পেয়েছে। তার আগুন লাগানোর অভিযোগটা মিথ্যে প্রমাণ করেছেন মিস্টার মিলার। বরং অভিযোগটা জোরাল করে তুলেছেন মিস্টার অ্যান্ডারসনের বিরুদ্ধেই। তিনি অভিযোগ এনেছেন, মিস্টার অ্যান্ডারসন কোন কারণে নিজের অফিস নিজে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছেন···'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা।

'এতক্ষণে বুঝলাম!' উত্তেজিত শোনাল কিশোরের কণ্ঠ।

'কি?' সামনের রাস্তার দিকে মুসার চোখ। সরু, আঁকাবাঁকা রাস্তা। সামনে তীক্ষ্ণ মোড়। অসতর্ক হলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ষোলো আনা।

'বুঝতে পারছ না?' কিশোর বলল। 'নিজের অফিসে নিজে আগুন লাগানোর জন্যে মিস্টার অ্যান্ডারসনকে দায়ী করেছেন মিস্টার হোমার।'

'তারমানে বলতে চাইছ, বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার কারণে মিস্টার হোমারের প্রতি আক্রোশ জন্মেছে ট্রিশের? এরিক আর বেকিকে খুন করে তার শোধ নিতে চাইছে?'

'হ্যাঁ। এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মুসা বলল, 'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না, এই ক্ষমতা পেল কোথায় ট্রিশ? ভূতে আসর করেনি তো?'

'আল্লাহ্ই জানে।'

ড্যাশবোর্ডের আলোয় কাটিঙের একটা ছবির দিকে তাকিয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে থাকল কিশোর। চেঁচিয়ে উঠল আচমকা, 'অ্যাই শোনো, লীলা বলে কোন বোন নেই ট্রিশের। এখানেও সে মিছে কথা বলেছে। ট্রিশই লীলা। লীলাই ট্রিশ!'

আঠারো

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে ফেলল মুসা। 'কি বলছ তুমি?'

'হ্যাঁ, এই ছবিটা দেখো!'

ছাতের আলোটা জ্বেলে দিল মুসা। ভাল করে দেখার জন্যে। কাত হয়ে এল কিশোরের দিকে। ছবিটার দিকে তাকাল। 'কি করে বুঝলে ট্রিশই লীলা?'

'ছবির পোশাকটা দেখছ? লাল শার্ট, সাদা প্যান্ট। অবিকল এই পোশাকে দেখেছি আমি ট্রিশকে।'

'তাতে কি? যমজ বোনেরা এক রকমের পোশাক পরেই থাকে।'

'উঁহু, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না,' জোরে জোরে মাথা নাড়ল কিশোর। 'হাসপাতালে ফোন করে জানা দরকার, লীলা সত্যি কোমার মধ্যে আছে কিনা।...থামলে কেন? চালাও। চাচা-চাচীর সঙ্গে দেখা করা দরকার যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।'

আবার গ্যাস পেডালে চাপ দিল মুসা। গতি না কমিয়ে পেরিয়ে এল মোড়টা।

সাগর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে আসছে ঘন কুয়াশা। সামনের রাস্তার ওপর জমে থেকে দৃষ্টি অচল করে দিচ্ছে।

কোন দিকে নজর নেই কিশোরের। একের পর এক কাটিং পড়ে চলেছে সে। মনে মনে দোয়া করছে বেকি আর এরিকের জন্যে—আল্লাহ্ ওদের ভাল রেখো!

কুয়াশার কুণ্ডলীর মধ্যে ঢুকে পড়ল গাড়ি। সামনে কয়েক গজের বেশি চোখে পড়ে না। হঠাৎ আবার থামিয়ে ফেলল মুসা।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

জবাব দিল না মুসা। সামনের দিকে তাকিয়ে আছে।

'মুসা, কি হলো তোমার? কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

ফণা তোলা সাপের মত ধীরে ধীরে এ পাশ ওপাশ দুলতে শুরু করল মুসা। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। ঘোলা দৃষ্টি। ঘোরের মধ্যে চলে গেছে যেন সে।

'মুসা!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। কাঁধ ধরে জোরে জোরে ঝাঁকি দিতে লাগল। 'এমন করছ কেন? কি হয়েছে তোমার?'

চোখে পলক পড়ছে না মুসার। কিশোরের কথার জবাব দিল না। দুলেই চলেছে।

'মুসা, দোহাই তোমার!...থামো! থামো!...প্লীজ!'

দুলুনি বন্ধ হয়ে গেল মুসার।

সামনের দিকে ঢলে পড়ল মাথাটা। কপাল ঠুকে গেল স্টিয়ারিঙে।

'মুসা!' মাথাটা চেপে ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করল কিশোর।

নাক-মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে মুসার। কান দিয়েও বেরোনো শুরু করল।

মুসার মাথাটা তুলে সীটের হেলানে রাখল কিশোর। হেলে পড়ল মাথাটা। শূন্য চোখ দুটো যেন কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে।

রবিন! নিশ্চয় রবিনেরও এই অবস্থাই হয়েছে। ভাবল কিশোর।

কি করব এখন? কি করা যায়? রক্তক্ষরণ হয়ে এ ভাবে মরতে দেয়া যায় না ওকে।

মাথা ঠাণ্ডা করো! শান্ত হও! নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর।

সাহায্য দরকার এখন।

নিজের পাশের দরজাটা খুলতে গেল সে।

খুলল না।

লক আটকানো?

না

মুসার নিথর দেহটার ওপর দিয়ে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে অন্য পাশের দরজাটা খোলার চেষ্টা করল।

ওটাও খুলল না।

বহু চেষ্টা করেও দুটো দরজার একটাও খুলতে পারল না কিশোর।

বেরোতে হবে! যে করেই হোক! বার বার নিজেকে বলতে লাগল সে। ছন্দের মত মুখ থেকে বেরোতে থাকল কথাগুলো।

জানালার কাঁচ ভেঙে বেরোতে হবে। কাঁপা হাতে টান দিয়ে গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট খুলল। একটা স্ক্রু-ড্রাইভার পাওয়া গেল।

সেটার হাতল দিয়ে অনবরত বাড়ি মারতে লাগল কাঁচের গায়ে।

ভাঙতে না পেরে হতাশার চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে। চেঁচিয়ে বলল নিজেকে, 'থেমো না, কিশোর! চালিয়ে যাও! চালিয়ে যাও!'

অবশেষে মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম ফাটল দেখা দিল কাঁচের গায়ে।

নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল কিশোর। বাড়তে শুরু করল ফাটল।

জানালার বাইরে চোখ পড়তে হঠাৎ থেমে গেল সে। আবছা অন্ধকারে ফুটে উঠেছে একটা মুখ।

ট্রিশ!

উনিশ

'ট্রিশ! তুমি?' আপনাআপনি শব্দ দুটো বেরিয়ে গেল কিশোরের মুখ থেকে।

আচমকা ঝটকা দিয়ে খুলে গেল গাড়ির দরজাগুলো। যেন দমকা বাতাসের ঝাপটায়।

আতঙ্কিত চিৎকার বেরিয়ে এল কিশোরের মুখ থেকে। পড়ে গেল মুসার গায়ের ওপর। ঝাঁকি লেগে মুসার মাথাটা আবার গিয়ে পড়ল স্টিয়ারিঙে।

নিজেকে মুসার ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে এল কিশোর।

বাতাসের বেগ বাড়ছে। কুয়াশার কুণ্ডলী ঘুরতে শুরু করল বাতাসের ঘূর্ণিতে পড়ে। তার মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে ট্রিশ। ভয়ঙ্কর ভুতুড়ে দৃশ্য। খসখসে কণ্ঠে অট্টহাসি হেসে উঠল সে। 'বেরিয়ে এসো, কিশোর। পালাতে তুমি পারবে না।'

মাথা নিচু করে সীটের মধ্যে নিজেকে কুঁকড়ে গুটিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল কিশোর। লুকানোর জায়গা নেই। পালানোর পথ নেই।

ট্রিশের ঝিলমিল করতে থাকা কাঁপা কাঁপা ভুতুড়ে মুখটা এগিয়ে এল আরও কাছে। 'এসো, কিশোর। বেরোও।'

সরে যেতে চাইল কিশোর। কিন্তু কোথায় সরবে?

হারিকেনের মত জোরাল বাতাস বইতে শুরু করল। প্রবল শক্তিতে টানতে লাগল কিশোরকে।

সীট খামচে ধরে গাড়িতে থাকার চেষ্টা করতে লাগল কিশোর। ব্যথা হয়ে গেল আঙুল।

থাকতে পারল না কিশোর। বাতাসের সঙ্গে পারল না। খোলা দরজা দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল রাস্তায়। হাতে-পায়ে ভর দিয়ে উঠতে চাইল।

প্রবল বাতাস অদৃশ্য একটা হাতের মত আবার চেপে মাটিতে উপুড় করে ফেলল তাকে। ঝরা পাতার মত পিছলে সরিয়ে নিয়ে যেতে লাগল ভেজা রাস্তার ওপর দিয়ে।

সেই অদৃশ্য হাতটা আটকে ফেলল তাকে এক সময়। খাড়া করে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল।

মুখোমুখি হলো ট্রিশ। দাঁত বের করে হাসছে।

'কেন করছ এ সব?' হাঁপাতে হাঁপাতে পাগলের মত চিৎকার করে উঠল

কিশোর। 'এই ক্ষমতা তুমি পেলে কোথায়?'

কুয়াশার কুণ্ডলী ঘিরে ফেলতে শুরু করল কিশোরকে। কুয়াশার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রিশকে মনে হলো মেঘের মধ্যে ভাসছে। কিশোরের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, 'বিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষ তার পুরো মগজটার ব্যবহার জানে না। যদি কেউ জেনে যায়, অসীম ক্ষমতা জন্মায় তার। আমি জেনে গিয়েছি। তাই যা ইচ্ছে করতে পারি আমি। যা খুশি।'

যেন সেটা প্রমাণ করার জন্যেই খাড়া ভাবে শূন্যে উঠতে শুরু করল ট্রিশ। ফুটখানেক উঠে সরতে শুরু করল। গিয়ে দাঁড়াল গাড়িটার বনেটের ওপর।

হাঁ করে তাকিয়ে রইল কিশোর। চমকের ধাক্কাটা কাটাতে সময় লাগল। তারপর বলল, 'কিন্তু আমাদের ক্ষতি করতে চাইছ কেন তুমি?'

'কেন?' তিক্ত হাসি হাসল ট্রিশ। 'আমার জায়গায় তুমি হলেও এইই করতে। আমার বাবা কেন আত্মহত্যা করেছে জানো? তোমার আঙ্কেল মিস্টার হোমারের কারণে।'

'কিন্তু তোমার বাবা আত্মহত্যা করলেন কোথায়? তিনি তো নাকি কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন তুমি বললে।'

'অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়ার লোক ছিল না আমার বাবা,' রাগে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ট্রিশ। 'আমার বাবা ছিল একজন মহৎ ব্যক্তি। একজন জিনিয়াস। কিন্তু তোমার আঙ্কেল হোমার তার পেছনে লেগে তার সর্বনাশ করে দিয়েছিল। তাকে অ্যারেস্ট করিয়েছিল। তার জীবনটা ধ্বংস করে দিয়েছিল। ধ্বংস করে দিয়েছিল আমাদের সবার জীবন। আমার মা আর লীলার জীবন। সে-জন্যে আমাদের বাঁচিয়ে দিতে চেয়েছিল আমার বাবা। আমাদের সবাইকে শেষ করে দিয়ে ভোগান্তি থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল।'

'কিন্তু আঙ্কেল হোমার কেবল তার কর্তব্য পালন করেছেন,' যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইল কিশোর। 'ভবঘুরে ওই মানুষটা যদি নিরপরাধ হয়ে থাকে...'

'হয় হোকগে, তাতে আমার কি?' চেঁচিয়ে উঠল ট্রিশ। 'ওরকম একটা ভিক্ষুকের চেয়ে আমার বাবার জীবনের দাম অনেক বেশি। দু'জনের তুলনা করাটাই একটা গাধামি। তোমার আঙ্কেলের মত অতি সাধারণ লোক আমার বাবার মত ব্রিলিয়্যান্টদের ব্যাপারে জেলাস হতেই পারে। আমার বাবার মত মহৎ মানুষদেরকে ধ্বংস করার জন্যে তৈরিই হয়ে থাকে তারা।'

ট্রিশের মত এক তরফা ভাবনা যারা ভাবে, তাদের সঙ্গে তর্কে গিয়ে লাভ নেই, বুঝতে পারল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'রেফারেন্স হিসেবে যে দুটো পরিবারের ফোন নম্বর দিয়েছ, তাদেরকে কি করেছ তুমি?'

'কে? ওই জজ আর তার অ্যাসিসট্যান্টের কথা বলছ? যা ওদের পাওয়া উচিত তা-ই পেয়েছে,' নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে জবাব দিল ট্রিশ। 'এবার হোমারের পরিবারের পালা। প্রথমে ওর ছেলেমেয়ে দুটো যাবে। তোমার কিংবা তোমার চাচা-চাচীর ওপর আমার কোন আক্রোশ ছিল না। কিন্তু

এত বেশি খুঁতখুঁতি শুরু করলে তুমি, নাক গলানো আরম্ভ করলে, তোমাকে শেষ না করে এখন আর কোন উপায় নেই আমার। অনেক বেশি জেনে ফেলেছ।'

গাড়ির বনেট থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নামল ট্রিশ। এগিয়ে আসতে শুরু করল কিশোরের দিকে।

পালানোর তাগিদ অনুভব করল কিশোর। ট্রিশের সঙ্গে পারবে না বুঝে গেছে।

ঘুরে দৌড় মারতে গেল।

কিন্তু আটকে গেল পা। দশ মণ ভারী লাগছে একেকটা। মাটি থেকে তুলতেই পারছে না। ট্রিশকে ঠেকানোর শেষ চেষ্টা করল কিশোর, 'দেখো···তোমার এই সাংঘাতিক ক্ষমতা আমাদের পেছনে খরচ না করে অন্য কাজে লাগালে কোটিপতি হয়ে যেতে পারো তুমি। তুমি জানো, বেঁচে থাকতে টাকা দরকার।'

জবাব দিল না ট্রিশ। ডান হাতটা কিশোরের দিকে তাক করে ধরল বন্দুকের মত। প্রচণ্ড ঘূর্ণি বাতাস বইতে শুরু করল কিশোরকে ঘিরে।

মাটি ছেড়ে ওপরে উঠতে শুরু করল কিশোরের পা দুটো।

তার দেহটা নিয়ে লোফালুফি করতে লাগল বাতাস।

'থামো! থামো! দোহাই তোমার!' হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করতে লাগল কিশোর।

জোরাল বাতাস গাড়িটার দিকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল তাকে।

বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠল কিশোর। দুই হাতে মাথা চেপে ধরল, গাড়ির গায়ে আছড়ে পড়ে চূর্ণ হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্যে।

খোলা দরজা দিয়ে গাড়ির ভেতরে ঠেলে দেয়া হলো ওকে।

ছুঁড়ে ফেলা হলো প্যাসেঞ্জার সীটে। মুসার নিথর দেহটার পাশে।

দড়াম করে বন্ধ হলো আবার দরজা।

কট্ করে তালা লেগে যাওয়ার শব্দ হলো।

জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ট্রিশ। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে।

দরজা খোলার চেষ্টা করতে গেল কিশোর।

অদৃশ্য শক্তি সীটের সঙ্গে ঠেসে ধরে রাখল তাকে। নড়তেও দিল না।

আতঙ্কিত হয়ে দেখল রিলিজ হয়ে গেল ইমার্জেন্সি ব্রেক। আপনাআপনি চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন।

'হেরে গেলে তুমি, কিশোর,' উল্লসিত সুরে বলে উঠল ট্রিশ।

চলতে শুরু করল গাড়ি।

নাক ঘুরে গেল রাস্তার পাশের খাদের দিকে।

বিশ

পড়ে যাচ্ছে গাড়ি। চারপাশে অন্ধকার।

নিজের দেহটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফেলল কিশোর। মাথা ঢেকে ফেলল দুই হাতে।

বহু নিচে আছড়ে পড়ার অপেক্ষায় আছে।

হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকি লাগল। ছাতে গিয়ে বাড়ি খেল কিশোরের মাথা। চিৎকার বেরিয়ে এল আপনাআপনি।

মুসার দেহটা বাড়ি খেয়ে এসে একপাশে কাত হয়ে গেছে। কিশোরকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলল প্যাসেঞ্জার ডোরের ওপর। এত জোরে, হুঁক করে একটা শব্দ বেরোল তার মুখ থেকে। ফুসফুস থেকে বেরিয়ে গেল সমস্ত বাতাস।

গাড়ির সামনের দিকটা নিচু হয়ে যেতে শুরু করেছে। বেশ কিছুটা ঝুঁকে থেমে গেল।

হাঁসফাঁস করে ব্যথা হয়ে যাওয়া ফুসফুসে দম টানতে টানতে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকাল কিশোর।

বেঁচে আছি আমি, ঘোরের মধ্যে কথাটা মনে হলো তার।

বেঁচে আছি, যে কোন ভাবেই হোক।

কিন্তু কি ভাবে?

প্যাসেঞ্জার ডোর খোলার চেষ্টা করল সে। পারল না। লেগে গেছে শক্ত হয়ে।

মুসার দিকে তাকাল সে। চোখ ভরে এল পানিতে। বেচারা মুসা! কিছু একটা করা দরকার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

মুসার দেহের ওপর দিয়ে গিয়ে ড্রাইভারের পাশের দরজাটা খোলার চেষ্টা করল। তাকে অবাক করে দিয়ে খুলে গেল ওটা। তারমানে গাড়িটাকে ফেলে দিয়ে এটার ওপর থেকে প্রভাব তুলে নিয়েছে ট্রিশ। ধরে নিয়েছে মুসা আর কিশোর দুজনেই মারা গেছে।

নিচে তাকাল কিশোর। অনেক নিচে অস্পষ্ট ভাবে পানি চোখে পড়ছে। অবাক হলো সে। মাঝপথে আটকে গেছে গাড়িটা। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল। এখনও বিপদমুক্ত নয় সে।

কিসের মধ্যে গাড়ি আটকেছে দেখার চেষ্টা করল। পাহাড়ের গা থেকে চাতালের মত বেরিয়ে থাকা বড় বড় পাথরের খাঁজে আটকে গেছে গাড়িটা।

কতক্ষণ থাকবে?

তার প্রশ্নের জবাবেই যেন নড়ে উঠল গাড়িটা। আরও কয়েক ইঞ্চি

সামনে ঝুঁকে আবার থেমে গেল। তারমানে যে কোন মুহূর্তে নিচে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ওটার।

মুসার বুকে কান পাতল। হার্টবীট আছে কি নেই। বাঁচবে তো?

আবার নড়ে উঠল গাড়ি। গাড়ির সঙ্গে সামনের দিকে ঝুঁকে গেল কিশোরের দেহ।

বেরোনো দরকার। দ্বিতীয়বার পড়লে আর বাঁচবে না। এত নিচে পড়বে গাড়ি, দুমড়ে মুচড়ে অবশিষ্ট বলতে আর কিছু থাকবে না। সেই সঙ্গে ভর্তা হয়ে যাবে সে আর মুসা।

আরেকটু নড়ে আবার থেমে গেল গাড়ি। খোলা দরজাটা দিয়ে, মুসার দেহের ওপর দিয়ে বহু কষ্টে নিজেকে টেনে বের করল সে। অল্প একটুখানি জায়গা। সরে গেল গাড়ির কাছ থেকে। টেনে হিঁচড়ে মুসাকে বের করল গাড়ি থেকে।

আবার নড়ে উঠল গাড়ি। এবার আর থামল না। ক্রমশ নাক নিচু করতে করতে, শেষে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল। পাহাড়ের দেয়ালে বাড়ি খেতে খেতে নেমে চলল। নিচের পাথরে গিয়ে আছড়ে পড়ার বিশ্রী শব্দ কানে এল। সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ল সাগরের পানিতে।

শিউরে উঠল কিশোর। অল্পের জন্যে বেঁচেছে। তবে বিপদ এখনও কাটেনি, বুঝতে পারছে। ওপর দিকে তাকাল। ট্রিশ কি আছে এখনও? ওকে গাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে?

কি জানি, হয়তো দেখেছে। তবে কিশোর দেখতে পেল না ওকে। চাতালে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগোল। কিনারের কাছে এসে গলা বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে তাকাল নিচের দিকে।

অনেক নিচে পানি।

মুসা এখনও বেহুঁশ হয়ে আছে। তাকে নিয়ে নামা সম্ভব না। টেনেটুনে তাকে যতটা সম্ভব চাতালের গোড়ার দিকে এনে আরাম করে শুইয়ে দিল।

খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল কিশোর। খাড়া ঢাল। বৃষ্টিতে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে গেছে। নামা খুব কঠিন। কখনও মাটিতে নখ বসিয়ে দিয়ে, কখনও ছোট ছোট ঝোপ বা গাছ আঁকড়ে ধরে খুব ধীরে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে নেমে চলল নিচে।

তার বিপদ আর অসুবিধে বাড়িয়ে দেয়ার জন্যেই যেন ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হলো। কুয়াশা তো আছেই। সেই সঙ্গে বইতে শুরু করল ঝোড়ো বাতাস।

বেশ কিছুটা নামার পর হঠাৎ করে হাতের আঙুলগুলো পিছলে গেল তার। থাবা দিয়ে একটা ছোট গাছ আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করল মাটি থেকে উপড়ে চলে এল গাছটা।

ধরে ঝুলে থাকার আর কোন অবলম্বন পেল না কিশোর। ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল সে। নিচে পড়ল। প্রচণ্ড জোরে পাথরে ঠুকে গেল মাথা। গাঢ় অন্ধকার নেমে এল চোখের সামনে।

একুশ

চোখ মেলল কিশোর। আকাশ চোখে পড়ল। বুঝতে পারল না কোথায় রয়েছে। চোখ বন্ধ করে আবার মেলল। আবার চোখে পড়ল আকাশ। মেঘে ঢাকা। ভোর হয়েছে। কিন্তু মেঘের জন্যে আলো ছড়াতে পারছে না। অন্ধকার হয়ে আছে এখনও।

কনুইয়ে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঁচু করল নিজেকে। সাগরের গর্জন কানে আসতে মনে পড়ল কোথায় রয়েছে। কি ভাবে এসেছে এখানে, তা-ও মনে পড়ল।

ঠাণ্ডা, ভেজা পাথরে চিৎ হয়ে পড়ে থেকে শীত লাগছে। চুল, মুখ, সারা গা ভেজা। মাটি আর কাদায় মাখামাখি। মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিল এক গুচ্ছ ভেজা চুল। ক্লান্ত ভঙ্গিতে চার পাশে তাকাল। একটা চ্যাপ্টা পাথরের ওপর পড়ে আছে; আরেকটু সরে পড়লেই সাগরের পানিতে গিয়ে পড়ত।

বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। তবে যে কোন মুহূর্তে নামবে আবার। ভাঙা গাড়িটা কোথাও দেখতে পেল না। পানিতে তলিয়ে গেছে।

মুসা কি বেঁচে আছে? ওপরের চাতালের দিকে তাকাল। মুসার নাম ধরে বার বার ডাকতে লাগল। অনেক ওপরে। শব্দ বোধহয় পৌঁছায় না ওখানে। জবাব এল না মুসার কাছ থেকে।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল কিশোর। যেখান দিয়ে নেমেছে সেখান দিয়ে ওঠার আর সাধ্য নেই ওর। পাথরটা থেকে নেমে এসে ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলল সরু সৈকত ধরে। মানুষজনের দেখা পেলে সাহায্য চাইবে। বাড়ি পৌঁছে দিতে বলবে ওকে।

বাড়ির কথা ভাবতেই ট্রিশের ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা চেহারাটা মনে পড়ল। ওকে ঠেকানো দরকার। নইলে চাচা-চাচী, এরিক, বেকি কাউকে রেহাই দেবে না। চাচা-চাচী কি ফিরেছে? বলে গেছে রাতে না-ও ফিরতে পারে। এরিক আর বেকির জন্যে শঙ্কাটা আরও বেড়ে গেল ওর।

এক ঘণ্টা ধরে একটানা হেঁটেও কারও দেখা পেল না কিশোর। তারমানে এদিকে খুব একটা আসে না কেউ। একটা জিনিস লক্ষ করল, নিচু হয়ে আসছে পাহাড়ী খাদের পাড়। যেটার ওপর রাস্তাটা রয়েছে।

আরও কিছুদূর এগোনোর পর পরিচিত লাগল ঢালটা। ভাল করে তাকাতে চিনতে পারল। এখান থেকে ওদের বাড়িটা বেশি দূরে না।

বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে বুঝে শক্তি বেড়ে গেল তার। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। আরও কয়েক মিনিট হাঁটার পর সাগরকে পেছনে রেখে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল সে। বন-জঙ্গলে ভরা। পায়েচলা পথ চলে গেছে।

সেটা ধরে এগিয়ে এসে পৌছল মিস্টার ডেভিলের কবরটার কাছে। ফুলগুলো আছে এখনও। তবে মরে গেছে। বৃষ্টির পানি লেগে, আছে পাপড়িগুলোতে।

কবরটা দেখে রাগ মাথা চাড়া দিল কিশোরের মগজে। কতগুলো খুন করেছে ট্রিশ! এখনও ওকে ঠেকাতে না পারলে আরও অনেককে মরতে হবে।

খুব সাবধানে পা টিপে টিপে কটেজের সামনে এসে দাঁড়াল সে। কাউকে চোখে পড়ল না। মনে হচ্ছে বাড়িতে লোক আছে।

বড় বেশি নীরব।

গেল কোথায় সবাই?

সামনে দিয়ে ঢোকার সাহস পেল না সে। ঘুরে চলে এল কটেজের পেছনে। নিঃশব্দে উঠে এল বারান্দায়। দরজার কাচের ভেতর দিয়ে উঁকি দিল।

লিভিং রুমে কাউকে দেখতে পেল না।

দরজার নব ধরে মোচড় দিল। খোলা। আস্তে করে ঠেলা দিয়ে ফাঁক করল পাল্লা। ঢুকে পড়ল ভেতরে।

রান্নাঘর থেকে ভেসে এল ট্রিশের কণ্ঠ।

চট করে দরজার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল কিশোর।

'এখনও তো আসেনি, আন্টি,' টেলিফোনে কথা বলছে ট্রিশ। 'ঠিক আছে, কিশোর এলেই সঙ্গে সঙ্গে ফোন করতে বলব আপনাদের।...না না, বেকি আর এরিককে নিয়ে এক বিন্দু চিন্তা করবেন না। রাখি? বাই।'

পর্দার নিচে দেয়ালের সঙ্গে গা মিশিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল ট্রিশ। কাঁধে তোয়ালে। নিশ্চয় গোসল করতে যাচ্ছিল, এমন সময় ফোন আসাতে বাথরুমে না ঢুকে ফোন ধরেছে। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে গিয়ে লিভিং রুমের বাথরুমটায় ঢুকে পড়ল সে। কিশোর, কিংবা চাচা-চাচী কেউ না থাকায় পুরো বাড়িটাই এখন ওর হয়ে গেছে। যথেচ্ছ বিচরণ করে বেড়াচ্ছে।

শাওয়ারের শব্দ কানে এল কিশোরের। কয়েক মিনিটের জন্যে নিশ্চিন্ত গোসল করতে যখন ঢুকেছে ট্রিশ, বেরোবে না এত তাড়াতাড়ি

এরিক আর বেকি কোথায়? অজানা আশঙ্কায় দুরুদুরু করে উঠল কিশোরের বুক। পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল একেক লাফে দুটো-তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঠে এল ওপরের বারান্দায়।

এরিকদের ঘরের দরজা বন্ধ। তাড়াতাড়ি এসে দরজায় ঠেলা দিল কিশোর। খুলে গেল দরজা। বিছানায় দেখতে পেল দু'জনকে কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারল না সে। কাছে এসে দুজনের নাকের কাছে হাত দিয়ে যখন বুঝতে পারল নিঃশ্বাস পড়ছে, হাঁপ ছাড়ল

মোচড় দিয়ে উঠল পেটের মধ্যে। গুড়গুড় শব্দ হলো খিদেটা টের পেল এতক্ষণে।

আবার নেমে এল নিচে। বাথরুমের দরজা বন্ধ। ট্রিশ বেরোয়নি। রান্নাঘরে ঢুকল কিশোর।

ফ্রিজ খুলে কমলার রসের বোতল, পাঁউরুটি আর জেলির বয়াম বের করল সে। গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল।

পেটে খাবার পড়তে শান্ত হয়ে এল মগজটা। গুছিয়ে ভাবতে পারল আবার। ট্রিশ বাথরুমে। কোনমতে ওকে আটকে ফেলতে পারলে এরিক আর বেকিকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। সোজা চলে যাবে থানায়। পুলিশকে নিয়ে চলে যাবে গাড়িটা যেখানে ফেলে দিয়েছে ট্রিশ, সে-জায়গাটাতে।

ট্রিশ এখনও বাথরুমে। রুটি চিবাতে চিবাতে লিভিং রুমে ফিরে এল কিশোর। আস্তে করে লাগিয়ে দিল বাথরুমের বাইরের দিকের ছিটকানিটা। তারপর দৌড় দিল আবার দোতলায়। এরিকদের ঘরে ঢুকল।

এক ডাক দিতেই জেগে গেল এরিক। কিন্তু বেকিকে নিয়ে হলো সমস্যা। ঘুম ভাঙল বটে। কিন্তু তুলে বসানো সহজ হলো না।

'জলদি এসো আমার সঙ্গে!' বেকির হাত ধরে টেনে-হিঁচড়ে খাট থেকে নামাল কিশোর। এরিকের দিকে ফিরল। 'বসে আছ কেন? এসো না!'

বিমূঢ়ের মত খাট থেকে নামল এরিক। কিশোর ভাই আবার পাগল হয়ে গেছে কিনা ভাবছে হয়তো।

দুজনের হাত ধরে টানতে টানতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে চলে এল কিশোর। গোসল শেষ হয়ে গেছে ট্রিশের। বাথরুমের দরজায় থাবা মারছে আর চিৎকার করে ডাকছে, 'এরিক? বেকি? দরজাটা আটকেছে কে? জলদি খোলো।'

ঠোঁটে আঙুল রেখে ওদেরকে কথা বলতে নিষেধ করল কিশোর।

ট্রিশের চিৎকার শোনা গেল, 'কিশোর, তুমি ফিরে এসেছ, তাই না? হুঁ, তারমানে তুমি মরোনি···ঠিক আছে, আমি আসছি। আমাকে আটকে রাখতে পারবে না।'

মড়মড় করে উঠল বাথরুমের দরজা। কজার কাছে ভেঙে যাচ্ছে। বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের, তার ভয়ানক ক্ষমতা ব্যবহার করতে শুরু করেছে ট্রিশ। পালাতে আর পারবে না বুঝে গিয়ে মরিয়া হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে শুরু করল কিশোর। ভারী একটা পিতলের ফুলদানী তুলে নিয়ে এসে দাঁড়াল বাথরুমের দরজার এক পাশে।

প্রচণ্ড শক্তির চাপে ভেঙে পড়ল দরজার পাল্লা। সেটা ডিঙিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল ট্রিশ তার মাথাটা দরজার এ পাশে আসতেই ধাঁ করে চাঁদিতে বসিয়ে দিল কিশোর

এ রকম কিছু আশা করেনি ট্রিশ। তৈরি ছিল না। টলে উঠল সে। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

বাইশ

স্টোর রুম থেকে দড়ি জোগাড় করে এনে ট্রিশের হাত-পা বেঁধে ফেলল কিশোর।

বোবা হয়ে তাকিয়ে আছে এরিক। কাঁদতে শুরু করেছে বেকি। কিশোর ভাই যে পুরো পাগল হয়ে গেছে, বেকিরও যেন সেটা বুঝতে বাকি নেই আর। কল্পনাই করতে পারল না, কি কারণে ট্রিশ আপুকে মেরে বেহুঁশ করে তার হাত-পা বাঁধছে কিশোর।

বাঁধা শেষ করে ভাই-বোনের দিকে তাকাল সে। চিৎকার করে উঠল, 'জলদি বেরিয়ে যাও! গ্যারেজের মধ্যে, বনের ভিতর, যেখানে পারো গিয়ে লুকিয়ে পড়ো। খবরদার, আমি না ডাকলে আর ঘরে আসবে না। যাও!'

ভয় পেয়ে গেছে এরিক আর বেকি। অমান্য করার সাহস পেল না। বেকিকে টানতে টানতে নিয়ে বেরিয়ে গেল এরিক।

রান্নাঘরে এসে ঢুকল কিশোর। ফোনের রিসিভার তুলে নিল। দ্রুত হাতে বোতাম টিপল। 'হালো···হালো···অপারেটর?···আমাকে থানার নম্বরটা দিতে পারেন, প্লীজ!'

অপারেটরকে ধন্যবাদ দিয়ে আবার বোতাম টিপতে শুরু করল কিশোর। 'হালো? পুলিশ? একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে কাল রাতে।···আমি হিল কটেজ থেকে বলছি···এখান থেকে শহরে যাওয়ার রাস্তায় যেখানে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে, সেখানে পাড় খুব উঁচু। ঢালের গায়ে চাতালের মত পাথর বেরিয়ে আছে। সেখানে একজন মানুষ পড়ে আছে। নিচের সাগরে পড়ে আছে গাড়িটা···'

লিভিং রুমে ট্রিশের গলা শুনে থেমে গেল কিশোর। সে আচমকা থেমে যাওয়ায় ওপাশ থেকে ভেসে আসতে লাগল, 'হালো হালো, শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা?'

কিন্তু জবাব দেয়ার অবস্থা নেই কিশোরের। হাঁ করে তাকিয়ে আছে ট্রিশের দিকে। অবিশ্বাস্য কাণ্ড করছে ট্রিশ। হাত-পাগুলো টানটান করে দিয়েছে। মটমট করে ছিঁড়ে যাচ্ছে শক্ত দড়ির বাঁধন।

এখানে থাকলে বাঁচতে পারবে না। ট্রিশ উঠে দাঁড়ানোর আগেই পালাতে হবে। রিসিভার ফেলে বেরোনোর দরজার দিকে দৌড় দিল কিশোর একটানে দরজা খুলে লাফ দিয়ে পড়ল বাইরে। চারপাশে তাকিয়ে কাছাকাছি লুকানোর কোন জায়গা না দেখে দৌড় দিল গ্যারেজটার দিকে।

চারপাশে তাকিয়ে কোনখানে দেখতে পেল না এরিক কিংবা বেকিকে

গাড়ি না থাকায় গ্যারেজের দরজা খোলা। একপাশে শোফারের ঘর।

হুড়মুড় করে এসে ঢুকল শোফারের ঘরে। ভেতর থেকে দরজার ছিটকানি আটকে দিল।

ভাবতে লাগল কিশোর। আচমকা কথা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পুলিশ নিশ্চয় অবাক হবে। খোঁজ করতে আসবে হিল কটেজ, অর্থাৎ ওদের বাড়িটাতে। ওদের সামনে ট্রিশ আর কিছু করতে সাহস পাবে না।

দুরুদুরু বুকে পুলিশ আসার অপেক্ষা করতে লাগল কিশোর।

তেইশ

আচমকা ঘটে গেল ঘটনাটা।

কোন রকম আগাম সঙ্কেত না দিয়ে মড়মড় করে ভেঙে পড়ল গ্যারেজের সামনের দিকের দরজা।

ভীষণ চমকে গেল কিশোর।

দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ট্রিশকে। দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে সে। হাসি হাসি মুখ। কিশোরকে দেখে বলল, 'তোমাকে বলেছি না আমি, পালাতে পারবে না। বেহুঁশ করে দিয়ে আমার উপকারই করেছ বরং। মনটা পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়লে শক্তি সঞ্চয় হয় আমার। ব্যাটারি রিচার্জের মত। অনবরত অ্যাকশনে গিয়ে কিছুটা কাহিল হয়ে পড়েছিলাম। আবার পুরোপুরি তাজা হয়ে গেছে আমার মগজের শক্তি। তোমাকে মরতে হবে এখন, কিশোর...'

'প্লীজ, ট্রিশ! আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি...'

'মরতে তোমাকে হবেই,' কিশোরের কথা যেন কানেই ঢোকেনি ট্রিশের। 'নিশ্চয় অবাক হচ্ছ, কাল তোমাকে পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে এসেও কেন বেকি আর এরিককে মারিনি? ওরাও দুর্ঘটনায় মারা গেছে, এটা দেখাতে চাই আমি। সে-জন্যে বাঁচিয়ে রেখেছি। ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করব। তবে সবার আগে তোমাকে খতম করা দরকার। কারণ তুমি এখন শুধু আমার শত্রু নও, প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেছ। আর কাউকে মারতে এত ঝামেলা পোহাতে হয়নি আমার। তোমার ব্যাপারে আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল।...যাকগে, যা হবার হয়েছে। পালাতে তো আর পারছ না। শেষ পর্যন্ত মরতেই হচ্ছে তোমাকে...'

ধীরে সুস্থে ঘরে ঢুকল ট্রিশ।

হাঁটু ভাঁজ হয়ে আসতে লাগল কিশোরের।

আরেক পা আগে বাড়ল ট্রিশ। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে। চোখ জ্বলছে।

পালাতে হবে আমাকে, ভাবছে কিশোর। সরে যেতে হবে দানবটার কাছ

থেকে।

'উঁহু, তুমি নড়বে না,' যেন তার মনের কথা পড়তে পেরে বলে উঠল ট্রিশ। সম্মোহন করার মত মোলায়েম কণ্ঠস্বর। আচমকা চোখ ফেরাল ছোট টেবিলে রাখা একটা ধুলো পড়া কাঁচের ফ্লাওয়ার ভাসের দিকে।

লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে গেল সেটা। ছুটে এল কিশোরকে লক্ষ্য করে। চিৎকার করে উঠল কিশোর। ঝট করে মাথা সরিয়ে ফেলল। দৌড় মারল দরজার দিকে। দেয়ালে বাড়ি লেগে ঝনঝন করে ভাঙল ভাসটা।

চোখের পলকে সামনে চলে এসে কিশোরের পথরোধ করল ট্রিশ। লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে গেল টেবিলের একপাশে রাখা একটা পুরানো চেয়ার। তারপর দল বেঁধে উড়তে শুরু করল যেন টেবিলে রাখা জিনিসপত্র—অ্যাশট্রে, মোমবাতি, পুরানো ম্যাগাজিন। সাইক্লোনে পড়ে ঘুরতে শুরু করল যেন সেগুলো।

দেয়ালে টাঙানো একটা ছবির ফ্রেম খুলে এসে মাটিতে আছড়ে পড়ে ভাঙল। কাঁচ আর কাঠের টুকরো ছড়িয়ে গেল মেঝেতে।

কিশোরের মনে হলো পুরো ঘরটাই বনবন করে ঘুরতে শুরু করেছে। দুই হাতে মাথা ঢাকল সে। ভাবছে, আটকা পড়েছি আমি ভালমত! আর বেরোতে পারব না!

উড়তে থাকা জিনিসপত্রগুলোর ঘোরার গতি বেড়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে জানালার কাছে সরে যেতে লাগল কিশোর।

'পালাতে তুমি পারবে না, কিশোর, যত চেষ্টাই করো!' কানে এল ট্রিশের কঠিন কণ্ঠ।

দপ করে জ্বলে উঠল জানালার পুরানো পর্দাটা। আগুন ধরে গেল একপাশে ফেলে রাখা কাঠের বাংকটাতে। চেয়ার, টেবিল, সব কিছুতে আগুন ছড়িয়ে পড়তে লাগল দ্রুত। আগুন লেগে গেল কাঠের বেড়ায়।

'ট্রিশ, পাগল হয়ে গেলে নাকি তুমি!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'এখানে থাকলে আমার সঙ্গে তুমিও পুড়ে মরবে!'

'মরবে শুধু তুমি,' যান্ত্রিক কণ্ঠে জবাব দিল ট্রিশ।

ধোঁয়া বাড়তে লাগল। তার মধ্যে দিয়ে কাঁপা কাঁপা ভাবে ট্রিশকে দেখতে পেল কিশোর।

ক্রমেই ঘন হচ্ছে ধোঁয়া। আগুনের তেজ বাড়ছে। সহ্য করতে পারছে না কিশোর। চামড়া পুড়ে যাওয়ার অবস্থা। আরেকটু বাড়লে কাবাব হয়ে যেতে হবে। কাশতে শুরু করল সে।

ধোঁয়ার মধ্যে আরও অস্পষ্ট হয়ে আসছে ট্রিশ। ছায়া ছায়া দেখা যাচ্ছে এখন।

কাশি থামাতে পারছে না কিশোর। চোখে যেন মরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

'গুড-বাই, কিশোর,' বেরোনোর জন্যে দরজার দিকে ঘুরতে শুরু করল ট্রিশ।

দরজার দিকে দৌড় মারল কিশোর।

দেখে ফেলল ট্রিশ। চিৎকার করে ধরতে এল কিশোরকে।

সাঁৎ করে সরে গেল কিশোর।

তাল সামলাতে না পেরে সামনের দিকে ঝুঁকে গেল ট্রিশ। পা বেধে গেল উল্টে পড়ে থাকা চেয়ারটায়। হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ল ঘরের ভেতরে একেবারে আগুনের মধ্যে। মেঝেতে পড়ল দড়াম করে। মাঝপথে চিৎকারটা থেমে গেল ট্রিশের।

ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করল কিশোর। কিন্তু এত বেশি আগুন, কাছেও যেতে পারল না। সমানে কাশছে। চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে। আর কোন আশা নেই। ট্রিশ শেষ হয়ে গেছে। খারাপ লাগল কিশোরের। কিন্তু কি করবে? নিজের এ পরিণতির জন্যে ট্রিশ নিজেই দায়ী।

আর অপেক্ষা করলে কিশোরও মরবে। ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে।

এরিক আর বেকিকে চোখে পড়ল। বনের দিক থেকে দৌড়ে আসছে।

কাছে চলে এল ওরা।

'কি হয়েছে, কিশোর ভাই?' এরিক জিজ্ঞেস করল। 'আগুন লাগল কি ভাবে?'

'ট্রিশ আপু কোথায়?' জানতে চাইল বেকি।

জবাব না দিয়ে দু'জনের হাত চেপে ধরে দৌড় মারল কিশোর। আগুনের প্রচণ্ড আঁচ লাগছে গায়ে।

নিরাপদ জায়গায় এসে ফিরে তাকাল কিশোর। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে চালার ওপর উঠে গেছে আগুন। দরজার ফাঁক দিয়েও বেরিয়ে আসছে লেলিহান শিখা।

ধসে পড়তে শুরু করল ঘরের কড়িকাঠ, চালা। ভাঙা চালার ফাঁক দিয়ে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল আগুন।

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে কিশোর।

ট্রিশ শেষ! আবার ভাবল সে। নিজের অজান্তেই বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস।

গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে ফিরে তাকাল সে।

'গেট দিয়ে ঢুকতে দেখল পুলিশের গাড়ি।

চব্বিশ

ডেস্কে কনুই রেখে সামনে ঝুঁকলেন ডক্টর মানরো। দুই হাতের তালু দৃঢ়বদ্ধ। 'তোমাকে আরেকটা সুযোগ দিতে চাই, কিশোর পাশা।' তীক্ষ্ণ দুই চোখের দৃষ্টি যেন অন্তর ভেদ করে যাচ্ছে কিশোরের। 'সব কথা খুলে বলো আমাকে

'নতুন আর কি বলব?' অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল কিশোর। কাঁধ চুলকাল। 'এই ইউনিফর্মগুলো অতি জঘন্য! এত বেশি মাড় দেয়া। খালি চুলকায়...'

মাথা ঝাঁকালেন ডাক্তার। মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে কেন অ্যারেস্ট করেছে পুলিশ, জানো তো?'

বিরক্তি ফুটল কিশোরের চেহারায়। 'জানি। ওরাও আর সবারই মত। আমার কথা এক বর্ণ বিশ্বাস করেনি কেউ।'

'বিশ্বাস ওরা ঠিকই করেছিল, পুড়ে মারা গেছে ট্রিশ,' কিশোরের চোখে চোখ রেখে বলতে লাগলেন ডাক্তার। 'তারপর চোখে পড়ল মাথার ক্ষতটা। প্রথমে বাড়ি মেরে বেহুঁশ করা হয়েছিল, তারপর ঠেলে দেয়া হয়েছিল আগুনের মধ্যে। পুলিশের তখন সন্দেহ হলো, ওকে আগে বাড়ি মেরে খুন করেছ তুমি, তারপর সেটা লুকানোর জন্যে বাড়িটায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছ। যাতে ঘটনাটাকে একটা অ্যাক্সিডেন্ট মনে হয়।'

'মিথ্যে কথা!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'ফুলদানী দিয়ে বাড়ি মেরেছি, এটা ঠিক, কিন্তু তাতে মারা যায়নি ট্রিশ। বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল কেবল। তারপর আবার উঠেছে। সেটা কটেজে থাকতেই। শেষমেষ শোফারের ঘরে আমাকে মারতে গিয়ে চেয়ারে পা বেধে উল্টে পড়েছিল আগুনের মধ্যে। এমন জায়গায়, ওকে বাঁচানোর কোন উপায়ই ছিল না আমার।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন ডাক্তার। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল মুখে, 'কিশোর, তোমার জন্যে একটা সুসংবাদ আছে। তোমার বন্ধু রবিন আর মুসার জ্ঞান ফিরেছে। মুসাকে রকি বীচে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে হাসপাতালের গাড়িতে করে। দু'জনেই স্বীকারোক্তি দিয়েছে পুলিশের কাছে। তাদের কথার সঙ্গে মিলে গেছে তোমার কথা। টবি নামে যে ছেলেটা জজ ব্রনসন সাহেবের বাড়ির পাশে থাকে, সে-ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছে। ট্রিশের কথা জানিয়েছে।...যা-ই বলো, ট্রিশের ক্ষমতাটা কিন্তু বিস্ময়কর। মানুষের এ রকম ক্ষমতা জন্মাতে পারে, বিশ্বাস করা কঠিন।'

আবার একটা মুহূর্ত নীরব থাকার পর ডাক্তার বললেন, 'বোঝা যাচ্ছে, তুমি নির্দোষ। তোমাকে ছেড়ে দেয়ার অর্ডার সকালেই পেয়েছি। তবু শেষবারের মত আরেকবার কথা বলে নিলাম তোমার সঙ্গে, সত্যটা যাচাইয়ের জন্যে।...একটা কথা শুনলে চমকে যাবে।'

কৌতূহল ফুটল কিশোরের চোখে। সামনে ঝুঁকে এল, 'কি কথা?'

'ওর নাম ট্রিশ নয়। লীলা।'

চমকাল না কিশোর। চেয়ারে হেলান দিল আবার। 'এটা আমি আগেই সন্দেহ করেছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না কোমার মধ্যে থেকে পালাল কি ভাবে।'

'আমি খানিকটা পারছি,' ডাক্তার বললেন। 'আমাজনের জঙ্গলে গিয়েছিলাম একবার। আদিবাসীদের ব্ল্যাক আর্টের চর্চা করতে দেখেছি

ওখানে। মৃত জানোয়ারের প্রেতাত্মাকে ডেকে এনে মিডিয়ামের দেহে প্রবেশ করাতে দেখেছি। প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী হয়ে উঠত তখন মিডিয়াম।...বিশ্বাস করছ আমার কথা?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'করছি। কারণ নিজের চোখেই দেখেছি ট্রিশের ক্ষমতা। কিন্তু তার দেহে আবার কোন জানোয়ারের প্রেতাত্মা প্রবেশ করল?'

'ও ট্রিশ নয়, লীলা,' শুধরে দিলেন ডাক্তার। 'লীলার দেহে ট্রিশের প্রেতাত্মা ঢুকেছিল। এ সব খোলাখুলি বলতে গেলে তোমার মতই আমাকেও পাগল ভেবে পাগলা গারদে ভরে দেয়া হবে। তোমাকে বলতে ভরসা পাচ্ছি, কারণ তুমি নিজের চোখে দেখেছ লীলার ক্ষমতা।'

'দেখেছি। আপনার কথা সে-জন্যেই বিশ্বাস করলাম আমিও। কিন্তু ট্রিশটা কে?'

'লীলার বিড়াল,' ডাক্তার জানালেন। 'ওদের বাড়িতে ছবির অ্যালবামে একটা গ্রুপ ফটোগ্রাফ পেয়েছে পুলিশ। তাতে লীলার বাবা-মা, লীলা আর তার পোষা বিড়ালটার ছবি আছে। শুধু বিড়ালটারও ক্লোজআপ ছবি পাওয়া গেছে অ্যালবামে। নিচে নাম লেখা: ট্রিশ।'

*

কিশোরের মনে হতে লাগল, জড়িয়ে ধরার যেন শেষ হবে না আর। হাসপাতালের ওয়েইটিং রূমে তার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন রাশেদ পাশা, মেরিচাচী, এরিক আর বেকি। সে বেরোতেই উঠে এসে দু'দিক থেকে তাকে আঁকড়ে ধরল ছেলে-মেয়ে দুটো। মেরিচাচী আর রাশেদ পাশাও উঠে এলেন।

কি সাংঘাতিক একটা পুনর্মিলন!

ওর কথা বিশ্বাস করেনি বলে বার বার মাপ চাইতে লাগলেন রাশেদ পাশা আর মেরিচাচী। মাপ চাওয়া যখন থামল, কাঁদতে শুরু করলেন মেরিচাচী। একবার হাসেন একবার কাঁদেন, জড়িয়ে ধরেন কিশোরকে।

বাইরের উজ্জ্বল রোদে বেরিয়ে এল ওরা। তাজা বাতাসে বুক ভরে দম নিল কিশোর। পার্কিং লটে রাখা ওদের গাড়িটাতে গিয়ে উঠল। গ্যারেজ থেকে মেরামত করিয়ে আনা হয়েছে গাড়িটা।

'কোথায় যাবে এখন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বাড়ি চলে যাব। রকি বীচে,' জবাব দিলেন চাচা। 'ওই কটেজটাতে ফিরে যেতে আর ইচ্ছে করছে না এখন।'

'কিন্তু আমার যে করছে। চলো না, বাড়ি যাওয়ার আগে আরেকবার কটেজটায় ঘুরে আসি?'

আপত্তি করলেন না রাশেদ পাশা।

কটেজের গেটের কাছে এনে গাড়ি থামালেন তিনি।

গাড়ি থেকে নেমে এসে শোফারের পোড়া ঘরটার সামনে দাঁড়াল কিশোর। মাটির সঙ্গে মিশে গেছে ঘরটা। কিছু পোড়া ছাই আর কড়ি-বরগার কাঠ বাদে কিছুই নেই। কিশোরের মনে হতে লাগল, এই বুঝি ছাইয়ের নিচ

থেকে লাফ দিয়ে উঠে আসে ট্রিশ। ভয়ঙ্কর হাসি হেসে বলে: এবার মরতে হবে তোমাকে, কিশোর পাশা!

কড়া রোদের মধ্যেও গায়ে কাঁটা দিল কিশোরের। আর দাঁড়াতে সাহস পেল না। পায়ে পায়ে ফিরে এল গাড়ির কাছে। গাড়িতে উঠল।

'কি, যাব এখন?' জিজ্ঞেস করলেন রাশেদ পাশা।

'হ্যাঁ, চলো,' বিষণ্ন কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

গাড়ি ঘোরালেন রাশেদ পাশা।

ফিরে তাকাল কিশোর। পোড়া ঘরটার দিকে। আশা করেছিল হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে ট্রিশকে।

কিন্তু হতাশ হতে হলো তাকে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। অকালে এভাবে মেয়েটা মারা না গেলেই ভাল হত।

-: শেষ :-

পোষা ডাইনোসর

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

'খবরদার! সরাসরি তাকাবে না!' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'ডাইনোসর!'

থমকে দাঁড়াল কিশোর। আস্তে করে ফিরে তাকাল। গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে উঁকি মারছে সাপের গলার মত একটা গলা।

একটা মুহূর্তের জন্যে চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার। পরক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মুসার দিকে ফিরল। 'অতিরিক্ত হরর ছবি দেখো মনে হয় আজকাল, সে-জন্যেই এ রকম চমকাও। ওটা ডাইনোসরই, অ্যাপাটোসরাস। তবে সচল হবে না কখনও।'

হাসল মুসা, 'অ, মূর্তি। দারুণ বানিয়েছে কিন্তু। একেবারে আসলের মত লাগে।'

রকি বীচ শহরের প্রান্তে একটা আধপুরানো বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে আছে দু'জনে। মূল বাড়িটা প্রাসাদের মত। গাছপালায় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। তার ওপাশ থেকে নীরব প্রহরীর মত উঁকি দিচ্ছে অ্যাপাটোসরাস।

'নাহ্, সত্যি, নতুন এই মিউজিয়ামটা শেষ হলে দেখার মত জিনিস হবে,' মুসা বলল। 'আমাদের বায়োলজি স্যার সেজন্যেই এটার কথা আর মুখ থেকে ফেলেন না।'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল কিশোর। 'বায়োলজি স্যারের লেকচারও তাহলে শোনো তুমি?'

'হাহ্-হা, শুনব না কেন?' গেটের ভেতরে উঁকি দিয়ে গাড়ি ঢোকার পথটার দিকে তাকাল মুসা। 'কবে খুলবে এটা?'

'আরও হপ্তা দুই অপেক্ষা করতে হবে,' জবাব এল পেছন থেকে।

ফিরে তাকাল দু'জনে। হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। হাতে একটা ক্লিপবোর্ড। সেটা তুলে তাক করে দেখাল প্রাসাদের ওপাশে ফেলে রাখা কনস্ট্রাকশনের জিনিসপত্রগুলোর দিকে। বেশ কিছু মালবাহী ট্রাক দাঁড়ানো। শ্রমিকেরা ব্যস্ত ভাবে কাজ করছে।

'এত কাজ! মাত্র আর চোদ্দদিন বাকি মিউজিয়াম উদ্বোধনের,' রবিন বলল। 'এর মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। দম ফেলার ফুরসত নেই। চব্বিশ ঘণ্টাই থাকতে হচ্ছে এখন। অ্যাসিসট্যান্ট এক্সিবিশন ডিরেক্টর বানিয়ে দেয়া হয়েছে আমাকে।'

'খাইছে!' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। 'এত বড় পদ?'

হাসল রবিন। 'শুনতে বেশ গালভরা, মনে হয় না জানি কি, আসলে সাধারণ সুপারভাইজার ছাড়া কিছু না আমি। জিনিসপত্রের হিসেব রাখি, আর কনস্ট্রাকশন কাজের তদারকি করি।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'অতিরিক্ত ব্যস্ত। এ জন্যেই ফোন করে বাড়িতে পাওয়া যায় না। আজ সকাল থেকে কয়েকবার ফোন করেছি। আন্টি বললেন, এখানে আছ। তাই চলে এলাম দেখতে, কি এত কাজ তোমার।'

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'মিউজিয়াম তো এখনও দর্শকদের জন্যে খোলোনি। ভেতরে ঢোকা যাবে? অ্যাপাটোসরাসটাকে ভালমত দেখতে ইচ্ছে করছে।'

ঘড়ি দেখল রবিন। 'কয়েক মিনিটের ছুটি পাব এখন। চলো, তাড়াহুড়ো করে যতটা দেখানো যায়।'

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছি কেন তাহলে? জলদি চলো,' খুশি হলো কিশোর।

'এসো,' রবিন বলল। 'এদিক দিয়ে। এটা স্টাফদের ঢোকার পথ।'

'কোথায় যাচ্ছি জানিয়ে যেতে হবে আমার ডিরেক্টরকে। অফিসেই আছেন। এসো।'

প্রাসাদের একপাশ দিয়ে ওদেরকে নিয়ে এসে একটা দরজার সামনে এসে থামল রবিন। পুরানো বাড়িটার এদিকটাকে অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

'এক মিনিট দাঁড়াও,' রবিন বলল। 'চট করে আমার ডিরেক্টরকে জানিয়ে আসি, আমি কোথায় আছি।'

দরজা দিয়ে ঢুকল আর বেরোল রবিন। হাতের ক্লিপবোর্ডটা রেখে এসেছে।

'এদিকটায় রান্নাঘর ছিল আগে,' রবিন জানাল। 'বাড়িটা মিস্টার জেরাল্ডব্রুক নামে এক বিরাট বড়লোকের। মিউজিয়ামের জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর যত প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ ছিল, সব দিয়ে দিয়েছেন। বেশ কিছু টাকাও দান করেছেন। কিন্তু একটা বসতবাড়িকে মিউজিয়াম বানানো বড় শক্ত কাজ।'

একটা দরজা খুলে কিশোর আর মুসাকে নিয়ে হলওয়েতে ঢুকল রবিন। ধনুকের মত বেঁকে যাওয়া হলওয়েটা দিয়ে এসে মস্ত এক হলঘরে ঢুকল। বলরুম ছিল এটা। দেয়াল ঘেঁষে বানানো বড় বড় সব ডিসপ্লে। প্রতিটি ডিসপ্লেতে থাকবে একটা করে প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর দৃশ্যাবলী। কিছু কিছু তৈরি হয়ে গেছে। বাকিগুলোও হবে।

প্রথম ডিসপ্লেটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল মুসা। 'খুব সুন্দর বানিয়েছে। জ্যান্ত মনে হচ্ছে একেবারে।'

হাতুড়ি-বাটালি আর বৈদ্যুতিক করাতের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেদিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল সে ওখানে কি বানাচ্ছে?'

'প্রিক্যামব্রিয়ান যুগের দৃশ্যাবলী তৈরি করা হচ্ছে ওখানে,' রবিন বলল। 'পৃথিবীর তখন একেবারেই আদিম অবস্থা। ভূপৃষ্ঠের বেশির ভাগই হ্রদ-পুকুর আর ডোবায় ভরা। পানির পরিবর্তে সে-সব ডোবায় টগবগ করে ফুটত তরল লাভা। ওপরে ভাসত মিথেন গ্যাস আর বাষ্প।'

ডিসপ্লেগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কিশোর বলল, 'ছবি যে, বোঝাই যাচ্ছে না কিন্তু।'

'কেরামতিটাই তো এখানে,' মাথা দুলিয়ে জবাব দিল রবিন। 'বোঝা গেলে তো সাদামাঠা হয়ে গেল। আকৃষ্ট হবে না দর্শক।' খানিকটা সরে গিয়ে আরেকটা ডিসপ্লে দেখিয়ে বলল, 'এটা হলো প্রিক্যামব্রিয়ানের শেষ অবস্থা। যখন সেই আদিম সাগরে সবে এককোষী প্রাণীরা জন্ম নিতে শুরু করেছে।

একটা ডিসপ্লেতে কালো, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে তুলির শেষ টানগুলো দিচ্ছে একজন শিল্পী। রবিনের দিকে ফিরে হাত নাড়ল।

সরে এসে কিশোর আর মুসাকে জানাল রবিন, 'ও ডিক কারসন। সাধারণ আর্টিস্ট ভেবো না ওকে। আর্কিওলজিতে ডক্টরেট নিতে যাচ্ছে। ইউনিভার্সিটির অনেক ছাত্রই এখানে হাতে-কলমে কাজ শিখতে এসেছে।'

এক ডিসপ্লে থেকে আরেক ডিসপ্লেতে মুসা আর কিশোরকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল সে। অনেক লোক কাজ করছে। কেউ রঙ করছে, কেউ ডিসপ্লে বানাচ্ছে, কেউ পরিষ্কার করছে। প্যালিওজোয়িক যুগের মডেল দেখল গোয়েন্দারা, যখন সরীসৃপেরা আবির্ভূত হতে শুরু করেছে পৃথিবীতে। তারপর দেখল মেসোজোয়িক যুগ, যখন চলছে ডাইনোসরদের রাজত্ব। সবশেষে সেনোজোয়িক, স্তন্যপায়ীরা আসতে আরম্ভ করেছে যখন।

মুগ্ধ হয়ে ডিসপ্লেগুলো দেখতে দেখতে কিশোর বলল, 'সত্যিই তুলনাহীন।'

'এত প্রশংসা শুনলে আমাদের ডিরেক্টর সাহেব খুশিতে ফেটে পড়বেন,' হেসে বলল রবিন। 'তাঁর নাম জানো? ডক্টর ফারগুসন। যাকগে, পাঁচশো কোটি বছর তো পাঁচ মিনিটে পেরিয়ে চলে এলাম। এখন চলো,' হলের মাঝখানটা দেখাল সে, 'মাত্র কয়েক লক্ষ বছর আগের পৃথিবীতে। মানুষের জন্ম শুরু হয়েছে যখন থেকে।'

দেয়ালের কাছ থেকে হলের মাঝখানে ওদের নিয়ে এল সে। বিবর্তনের ধারায় পরিবর্তিত হতে থাকা বিভিন্ন সময়ের মানুষের প্রমাণ-সাইজের মূর্তি তৈরি করে রাখা হয়েছে সেখানে। কোথাও অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসে আছে মানুষ, কোথাও বা গুহামুখের সামনে দাঁড়ানো, কেউ বা হেঁটে যাচ্ছে লম্বা ঘাসে ঢাকা বিস্তীর্ণ প্রান্তর দিয়ে। দূরে দলে দলে চরে বেড়াচ্ছে রোমশ ম্যামথ হাতির দল।

শেষ এক্সিবিটটাতে কয়েকটা কাঁচের বাক্সে নানা রকমের আদিম পাথরের কুড়াল আর তীরের ফলা রাখা। একটা বাক্সে রয়েছে তিন ফুট চওড়া কঠিন মাটির টুকরোতে খোদাই করা বাইসনের মূর্তি। পাহাড়ের দেয়াল থেকে মাটি সহ কেটে সেটাকে আস্ত তুলে নিয়ে আসা হয়েছে। এত জীবন্ত লাগছে, মনে

হচ্ছে নেমে চলে আসবে।

'প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে ভীষণ মূল্যবান এ সব জিনিস,' রবিন বলল। 'এটার বয়েস পনেরো হাজার বছর। ক্রো-ম্যাগনন যুগের শিল্পীর বানানো। পাওয়া গেছে দক্ষিণ ফ্রান্সের এক গুহায়।'

ওটার কাছে দাঁড়িয়ে আবেগ মেশানো কণ্ঠে কিশোর বলল, 'পনেরো হাজার বছর আগে আমাদেরই মত একজন মানুষ বসে বসে বানিয়েছে এই মূর্তি—ভাবতে কেমন লাগে না?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'সে আজ নেই, অথচ তার বানানো মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, ভাবলেই রোমাঞ্চিত হয় শরীর। আসল বলেই হয়তো এ রকম লাগছে। নকল হলে লাগত না।'

'ওস্তাদ আর্টিস্ট ছিলেন ওই ক্রো-ম্যাগনন ভদ্রলোক,' মুসাও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছে।

দু'জনকে প্রাসাদের মাঝামাঝি অংশে নিয়ে এল রবিন। পুব দিক দেখিয়ে বলল, 'ঈস্ট উইংটাকে এখন ফসিল হল বানানো হয়েছে।'

রবিনকে অনুসরণ করে বিশাল আরেকটা হলঘরে এসে ঢুকল দু'জনে। অনেক উঁচুতে ছাত। এটা 'ফসিল হল'। এক প্রান্তে একটা দরজার গায়ে লেখা রয়েছে 'ফসিল ল্যাবরেটরি'।

মেঝেতে সাজিয়ে রাখা ডজনখানেক প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের কঙ্কাল। কোনটা দুই ফুট উঁচু, ছোট আকারের জানোয়ার। কোনটা বিশাল, বারো ফুট উঁচু, তিরিশ ফুট লম্বা।

মাঝখানে রাখা ওই কঙ্কালটা দেখিয়ে রবিন বলল, 'আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় কঙ্কাল এখন ওই অ্যানট্রোডেমাসটার জীবাশ্ম। জুরাসিক যুগের মাংসাশী ডাইনোসর ওটা। বাইরের পার্কে কিছু বড় ডাইনোসর আছে অবশ্য, কিন্তু ওগুলো সবই বানানো মডেল। আসল নয় একটাও। আর এই যে এই কাঁচের বাক্সের কঙ্কালটা, এটা খুব মূল্যবান ফসিল। আরকেইওপটেরিক্সের। পাখি আর ডাইনোসরের মাঝে বিবর্তনের ধারায় যোগসূত্র হিসেবে ধরা হয় এই জীবটাকে।'

'মেঝের এই দাগগুলো কিসের?' হলের মাঝখানে এসে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'দেখে মনে হচ্ছে তিন আঙুলওয়ালা কোন দানবীয় পাখির।'

'এটা বানানো হয়েছে ডক্টর ফারগুসনের বুদ্ধিতে,' রবিন বলল। 'টেক্সাসে পাওয়া টাইরানোসরাস রেক্সের পায়ের ছাপের অনুকরণে। দুটো পায়ের ফাঁকের মধ্যে ফারাকটা লক্ষ করেছ? এক পা থেকে আরেক পায়ের এই দূরত্ব প্রমাণ করে, ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল বেগে দৌড়াতে পারত জীবটা।'

'ওরিব্বাবা!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার।

'আর সাইজটা দেখো,' কিশোর বলল। 'এক পায়ের ওপরই আমরা তিনজনে বসে পড়তে পারব।'

'জীবটা কতবড়, একটু পরেই দেখতে পাবে,' রবিন বলল। 'পায়ের

ছাপগুলো দেখো, ওই পাশের দরজাটার দিকে গেছে। ওটা দিয়ে ডাইনোসর পার্কে বেরোনো যায়। পায়ের ছাপ অনুসরণ করে গেলেই দেখতে পাবে জানোয়ারটার মডেল।'

পায়ের ছাপ অনুসরণ করে বাইরে চলে এল ওরা। চওড়া সবুজ লনের তিন দিক থেকে ঘিরে আছে প্রাসাদ আর তার বাড়তি উইংগুলো। শেষ হয়েছে গিয়ে বাড়িটার পেছনের বনের ধারে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে। ঝোপঝাড় আর জঙ্গলের ভেতর থেকে মাথা তুলে রেখেছে চারটে বিশালতম ডাইনোসরের মডেল। দুটোর কাজ এখনও শেষ হয়নি। উঁচু উঁচু মাচা ঘিরে রেখেছে দুটোকে। ওসব মঞ্চে উঠে কাজ করে কারিগরেরা।

'ওই যে ওটা, টাইরানোসরাস রেক্স,' হাত তুলে দেখাল মুসা। 'আর ওটার পাশেরটা অ্যাপাটোসরাস। গেটের বাইরে থেকে এটাকেই দেখেছিলাম। এর আরেক নাম ব্রন্টোসরাস। আর বাকি দুটোর ডানেরটার নাম ট্রাইসেরাটপস, বাঁয়েরটা স্টেগোসরাস। ঠিক বলিনি?'

'বাপরে,' বলে উঠল রবিন, 'তুমি দেখি ডাইনোসর বিশেষজ্ঞ হয়ে বসে আছ।'

হাসল মুসা। 'টিভিতে আজকাল এত বেশি বেশি দেখায় এ সব জন্তু, চিনে রাখাটা কঠিন কিছু না।'

লনের এক ধারে ছোট, আধুনিক চেহারার একটা বাড়ি দেখা গেল। ডিশ অ্যান্টেনার তারের মত মোটা মোট প্রচুর তার গিয়ে ঢুকেছে বাড়িটার ভেতরে। কয়েকজন শ্রমিককে দেখা গেল ওটার সামনে।

'ওই বাড়িটাতে কি আছে?' তারগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ওটা কন্ট্রোল রুম,' জানাল রবিন। 'কম্পিউটারের সঙ্গে ডাইনোবটের সমন্বয় রক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে ওই ঘরে। ওখান থেকে ওগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।'

চোখ মিটমিট করতে লাগল মুসা। 'ডাইনোবট মানে?'

হাসল রবিন। 'ডাইনোসরের ডাইনো আর রোবটের বট যোগ করে হয়েছে ডাইনোবট। আমাদের অ্যানিমেশন ডিজাইনার হারভে মুরারি এই নাম রেখেছেন।'

'তারমানে তুমি বলতে চাইছ ওই মডেলগুলো নড়াচড়া করতে পারে?' চোখ কপালে উঠল মুসার।

'হ্যাঁ, তা কিছুটা পারে,' রবিন বলল। 'এই যেমন মাথা ঝাঁকানো, লেজ নাড়ানো, এ সব। তবে মুরারিকে বলতে শুনেছি, ট্রাইসেরাটপ নামের ডাইনোসরটাকে নাকি হাঁটানোও সম্ভব। সামনে পেছনে আগুপিছু করানো যেতে পারে। তবে পরীক্ষা করে দেখা হয়নি এখনও।'

'ইস, হাঁটানোর সময় যদি দেখতে পারতাম!' মুসা বলল।

মুখ ফেরাতেই একজন লোককে চোখে পড়ল রবিনের। 'সে-সুযোগ

পেয়েও যেতে পারো। ওই যে, বলতে না বলতেই মিস্টার মুরারি এসে হাজির।'

কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে এসেছেন লম্বা একজন মানুষ। মাথায় লাল চুল। বয়েস তিরিশের কোঠায়। পরনে জিনসের প্যান্ট। গায়ে সুতির শার্ট।

'মিস্টার মুরারি!' গলা চড়িয়ে ডাকল রবিন।

মুখ তুলে তাকালেন হারভে মুরারি। লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে এলেন তিন গোয়েন্দার দিকে।

'মিস্টার মুরারি, এরা আমার বন্ধু কিশোর পাশা···আর মুসা আমান,' পরিচয় করিয়ে দিল রবিন। চোখের ইশারায় ডাইনোসরগুলো দেখিয়ে বলল, 'ডাইনোবটের ব্যাপারে আগ্রহী। ওগুলোর নড়াচড়া দেখতে চায়।'

কিশোর আর মুসার সঙ্গে হাত মেলালেন মুরারি। 'কাজ শেষ হয়নি এখনও। নইলে তোমাদের দেখাতে পারতাম।'

'খুব সুন্দর হচ্ছে যা-ই বলেন,' রবিন বলল। 'শুনলাম, শেষ মঞ্চটা নাকি কাল আসছে।'

'হ্যাঁ। একেবারে ওপরের অংশটায় ফিনিশিং দেয়ার জন্যে। ভেতরের যন্ত্রগুলোও টেস্ট করা হয়নি এখনও,' মুরারি বললেন। 'কোন রকম গোলমাল চাই না আমি। সারা দেশ থেকে বিজ্ঞানীরা আসবেন উদ্বোধনীর দিনে। কোন রকম অঘটন যাতে না ঘটে সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'আমারও ভয় লাগছে, কোন অঘটন না ঘটে যায়।'

লাল চুলে চিরুনির মত করে আঙুল চালালেন তরুণ বিজ্ঞানী। 'অঘটন তো একটা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে বলা যেতে পারে। আমার অ্যাসিসট্যান্ট মেরিট অন্য জায়গায় ভাল চাকরি পেয়ে চলে গেছে।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে গেল মুসার। কারণ নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটছে গোয়েন্দাপ্রধান। নিশ্চয় কোন কথা মাথায় ঢুকেছে তার।

মুসার ধারণা অমূলক হলো না। আচমকা বলে বসল কিশোর, 'মিস্টার মুরারি, আমরা ডাইনোসর বিশেষজ্ঞ নই। কিন্তু তারপরেও বলি, আমাদের দিয়ে যদি কোন কাজ হবে মনে করেন, তাহলে আমাকে আর মুসাকে অ্যাসিসট্যান্ট রাখতে পারেন। খুশি হয়েই আপনার কাজ করব আমরা।' রবিনের দিকে তাকাল, 'যদি, রবিনেরও কোন আপত্তি না থাকে।'

'আমিও খুশি হব তোমরা আমাকে সাহায্য করলে,' জবাব দিতে এক মুহূর্ত দেরি করলেন না মুরারি। হাসিটা বদলে গেল ভ্রূকুটিতে। টাইরানোসরাস রেক্সকে ঘিরে কাজ করা শ্রমিকদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠলেন হঠাৎ, 'আরে আরে, আস্তে নড়াও না! দেবে তো নষ্ট করে!' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন, 'তোমাদের সঙ্গে পরে কথা বলব আমি।' ডাইনোবটটার দিকে দৌড় দিলেন তিনি।

'কাজটা নেয়ার কথা বলে ভালই করেছ,' রবিন বলল। 'তিনজন

একসাথে থাকতে পারব। চলো এখন, ডক্টর ফারগুসনের সঙ্গে দেখা করিগে। বাড়তি লোক পেলে তিনিও খুশি হবেন। বেতন ছাড়া কাজ করতে রাজি আছে এমন কাউকে পেলে তো কথাই নেই।'

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইঙে ফিরে চলল ওরা। লম্বা হলওয়ের ধারে একটা দরজার সামনে দাঁড়াল রবিন। দরজার নেমপ্লেটে ডক্টর এভার ফারগুসনের নাম লেখা।

টোকা দেয়ার জন্যে হাত তুলল রবিন। ভেতর থেকে ভেসে এল জোরাল, ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর। জবাব দিল অপেক্ষাকৃত শান্ত, তীক্ষ্ণ একটা মহিলা কণ্ঠ।

'ভেতরে মনে হয় মীটিং হচ্ছে,' কিশোর আর মুসাকে বলল রবিন। 'পরেই যাই। আপাতত দাঁড়াই এখানে।'

জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে উঁকি দিল কিশোর। হালকা-পাতলা একজন মহিলাকে দেখতে পেল। মাথায় লাল চুল। ঝুঁটি করে বাঁধা। ডেস্কের ওপাশে বসা টাকমাথা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছে। কথাগুলো স্পষ্ট না হলেও ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় তর্ক করছে।

ঘড়ি দেখল রবিন। 'আমার লাঞ্চের বিরতি প্রায় শেষ। আমাদের প্যালিওন্টোলজিস্ট ডিন মারটিনের সঙ্গে দেখা করা জরুরী। আসবে নাকি আমার সঙ্গে, ফসিল হলে? আমরা ফিরে আসতে আসতে ডক্টর ফারগুসনের মীটিং শেষ হয়ে যাবে।'

'চলো,' মুসা বলল, 'দাঁড়িয়ে থেকে কি করব।'

ফসিল হলে ফিরে এল তিনজনে। ঘরের পেছন দিকের ফসিল ল্যাবরেটরিতে এসে ঢুকল। লম্বা লম্বা টেবিলে প্রচুর হাড়গোড় পড়ে আছে। ঘরের কোণে কম্পিউটারের ওপর ঝুঁকে আছেন একজন লম্বা মানুষ। চুলের কয়েকটা গাছিতে ধূসর রঙের ছোঁয়া।

'মিস্টার মারটিন,' রবিন বলল, 'দেখুন কারা এসেছে আপনার সঙ্গে কথা বলতে। আমার বন্ধু মুসা আর কিশোর। ওরা আপনার কাজে সাহায্য করতে পারবে।'

ঘোঁৎ জাতীয় একটা শব্দ বেরোল ডিন মারটিনের মুখ থেকে। বাঁ হাত নাড়লেন আগন্তুকদের উদ্দেশে। কিন্তু কম্পিউটার থেকে চোখ সরালেন না। স্ক্রীনে ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল একটা ডাইনোসরের নকশা।

'জানি আপনি ব্যস্ত লোক, মিস্টার মারটিন,' রবিন বলল আবার। 'কিন্তু আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে আমার।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন মারটিন। 'এক মিনিট, হাতের কাজটা শেষ করে নিই।'

মারটিনের ডেস্কের কাছ থেকে সরে এসে ল্যাবরেটরিতে ঘোরাঘুরি শুরু করল তিন গোয়েন্দা।

অবশেষে কম্পিউটারের সুইচ বন্ধ করে মুখ তুললেন বিজ্ঞানী। ফিরে তাকালেন। 'কি বলবে?'

এগিয়ে গেল রবিন। মুসা আর কিশোরের পরিচয় দিয়ে বলল, 'বিনা বেতনে ভলান্টিয়ারের কাজ করতে চায় ওরা।'

হাত মেলালেন বিজ্ঞানী। রবিনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন বলো, তোমার জরুরী কথাটা কি?'

'আমাদের ফাইন্যাল স্কেজুলটা বানাতে বসব,' রবিন বলল। 'ফসিল কালেকশনগুলো রেডি হবে কখন?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন মারটিন। 'তাড়াহুড়া তো করছি। কিন্তু গত হপ্তায় মুরারি ঢুকে ফসিলের নেম ট্যাগগুলো একটারটা আরেকটায় লাগিয়ে সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে।'

'রসিকতাটার জন্যে অবশ্য মাপও চেয়েছেন তিনি,' রবিন বলল। 'সেগুলো ঠিক করতে অত সময় লাগার কথা নয়।'

'কিন্তু বেহুদা সময় নষ্ট তো! অত সময় আমার আছে নাকি? তা ছাড়া এটা কোন ধরনের রসিকতা? আমার এ সব মোটেও পছন্দ না।'

'জানি, চাপের মধ্যে আছেন এখন।' সুযোগটা কাজে লাগাল রবিন, 'কিশোর আর মুসাকে নিয়ে নিতে পারেন সাহায্য করার জন্যে।'

'কাজটাকে খেলা মনে করেছ নাকি? অভিজ্ঞ গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টের সাহায্য দরকার আমার।'

'কিন্তু কিছু কিছু কাজ তো আছে করার জন্যে অত অভিজ্ঞ লোকের দরকার হয় না,' হাল ছাড়ল না রবিন।

'তা ঠিক,' চোয়াল ডলতে লাগলেন মারটিন। 'দেখি কি করা যায়। জানাব তোমাকে।'

গুড-বাই জানিয়ে গটগট করে ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

মেজাজটা বড়ই কড়া, ভাবল কিশোর।

মাথা নাড়তে নাড়তে রবিন বলল, 'তাড়াহুড়ায় এমনিতেই এখন কোণঠাসা অবস্থা, তার ওপর মারটিন আর মুরারির মন কষাকষি। কোন ব্যাপারেই মতের মিল একদম হয় না,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'খোদাই জানে, উদ্বোধনীটা নির্বিবাদে হবে কিনা।'

'কোথায় এসে ঢুকলাম?' শঙ্কিত কণ্ঠে বলল মুসা। 'ঘটনা তো বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না!'

'তোমার অত চিন্তার কিছু নেই,' ঘড়ি দেখল আবার রবিন। 'আমাকে এখন যেতে হবে। ডক্টর ফারগুসনের সঙ্গে দেখা করব। তোমরা বরং মুরারির ওখানে চলে যাও।'

'ঠিক আছে, যাও তুমি,' বলে মুসাকে নিয়ে উল্টো দিকে রওনা হয়ে গেল কিশোর।

কন্ট্রোল রুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল দু'জনে। দরজায় টোকা দিল কিশোর। সাড়া পেল না। থাবা দিতে যেতেই *ঠেলা* লেগে খুলে গেল পাল্লা। উঁকি দিল সে। ভেতরে কেউ নেই। এক প্রান্তে অনেক বড় একটা জানালা।

সামনে বসানো কন্ট্রোল প্যানেল।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে ঢুকে পড়ল কিশোর। কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জানালা দিয়ে ডাইনোসরের মডেলগুলো ভালভাবেই দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

যন্ত্রপাতির প্রতি বিশেষ লোভ মুসার। নতুন কিছু চোখে পড়লেই নেড়ে দেখতে ইচ্ছে করে। 'দেখব নাকি একবার টিপাটিপি করে?'

'উঁহুঁ!' টান দিয়ে মুসাকে সরিয়ে নিয়ে এল কিশোর।

মূল ঘরটার একধারে ছোট আরেকটা কাঠের দরজা চোখে পড়ল তার। 'ওখানে থাকতে পারেন।' এগিয়ে গিয়ে দরজায় উঁকি দিয়ে ডাক দিল, 'মিস্টার মুরারি?'

আধখোলা দরজাটার ওপাশের ঘরটা ওঅর্কশপ। মস্ত কাঠের টেবিলে বসানো রয়েছে শক্তিশালী কম্পিউটার। ওটাকে ঘিরে নানা রকম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি। একটা তাকে বোঝাই বিজ্ঞান সম্পর্কিত নানা রকম পত্রপত্রিকা।

'মনে হচ্ছে মুরারির কাজের টেবিল,' মুসা বলল।

'হুঁ।'

ছোট ঘরটায় ঢুকল কিশোর। এক জোড়া বড় আকারের গগলস তুলে নিল। ওটার সঙ্গে তার দিয়ে যুক্ত সিগারেটের বাক্সের সমান একটা যন্ত্র, আর হেলমেট, তাতে ইয়ারফোন লাগানো।

ছোট বাক্সটায় টোকা দিয়ে বলল কিশোর, 'এর ভেতরে দুটো খুদে টেলিভিশন স্ক্রীন রয়েছে, একেক চোখের জন্যে একটা করে। দুটো মিলে একটা ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরি করে। যে হেলমেটটা পরবে তার চোখের সামনে ভেসে উঠবে সেই ছবি।'

চোখ চকচক করে উঠল মুসার। 'লাগিয়ে দেখলে কেমন হয়?'

বাধা দিল কিশোর, 'উঁহু। মুরারি আসুক। তাঁকে জিজ্ঞেস না করে চোখে দেয়াটা ঠিক হবে না।'

'কি আর হবে? দেখার জন্যেই তো,' তর সইল না মুসার। গগলসটা মাথার ওপর দিয়ে গলিয়ে দিল।

'কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?'

কিশোরের কথা যেন কানেই যায়নি মুসার। সে বলল, 'হেলমেটের পেছন থেকে তার গিয়ে যুক্ত হয়েছে কম্পিউটারের সঙ্গে। সুইচ টিপে দিলেই কাজ হয়ে যাবে এখন। কিশোর, দাও না সুইচটা টিপে। আমি নাগাল পাচ্ছি না।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুইচ টিপে দিল কিশোর। মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল।

'খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবী!' কয়েক সেকেন্ড মুগ্ধ হয়ে সেই দৃশ্য দেখল সে। 'কি সাংঘাতিক। চারপাশ থেকে আমাকে ঘিরে আছে দানবীয় ফার্ন। আরি, দেখো, গণ্ডারের মত দেখতে এক দল ডাইনোসর লতাপাতা ছিঁড়ে খাচ্ছে।'

'অ্যানকিসেরাটপস দেখছ হয়তো,' কিশোর বলল।

'আরি! আমার পেছনের ঝোপ থেকে তেড়ে আসছে একটা প্ল্যাটিওসরাস,' মাথাটা এমন করে ঘুরিয়ে ফেলল মুসা, যেন সত্যি সত্যি তার পেছন থেকে ছুটে আসছে দানবটা। 'আর দেখো...'

কথা শেষ হলো না তার। চিৎকার করে উঠল। গগলসটা খুলে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল। কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত তারের মাথা থেকে ছরছর করে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ ছুটছে।

চেয়ার থেকে মেঝেতে উল্টে পড়ল মুসা।

দুই

'মুসা!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। অফ বাটনটা টিপে দিয়ে মেঝেতে কুঁকড়ে পড়ে থাকা মুসাকে তোলার জন্যে ছুটল। হ্যাঁচকা টানে মাথা থেকে হেলমেট খুলে ফেলে দিয়ে তুলে ধরে তাকে বসাল।

চোখের পাতা কেঁপে উঠল মুসার। মিটমিট করে খুলে ফেলল। মাথা ঝাঁকাতে লাগল। তাকাতে শুরু করল চারপাশে। ছাই হয়ে গেছে মুখ।

'কি...' কথা জড়িয়ে যাচ্ছে তার। 'কি হয়েছিল?'

'দম নাও, দম নাও। আগে মাথাটা পরিষ্কার করো।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে আবার কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'কি হয়েছিল?'

'মনে হয় ইলেকট্রিক শক খেয়েছ,' কিশোর বলল। 'গগলসের মধ্যে শর্ট সার্কিট হয়ে ছিল।'

'শকও কি যেমন তেমন শক,' মুসা বলল। 'মনে হলো প্রাগৈতিহাসিক বাজ পড়ল মাথায়।'

কিশোরের সাহায্যে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সে।

'বোঝা গেল,' কিশোর বলল, 'যন্ত্রপাতিগুলো এখনও নিখুঁত করতে পারেননি মুরারি।' মেঝেতে পড়ে থাকা জিনিসগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে।

'তা হয়তো পারেননি। কিন্তু এমন জিনিস আছে এর মধ্যে, না দেখলে বুঝবে না। আমার মনে হচ্ছিল...মনে হচ্ছিল... প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে চলে গেছি।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু এ সব জিনিস পুরোপুরি ঠিক না করে আর কাউকে পরতে দেয়া উচিত হবে না। শক খাওয়ার ঝুঁকি থেকেই যাবে...'

'এখানে কি করছ তোমরা?' দরজার কাছ থেকে শোনা গেল গম্ভীর কণ্ঠ।

ফিরে তাকাল দুই গোয়েন্দা।

হারভে মুরারি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পেছন থেকে উঁকি দিচ্ছে রবিন।
'মিস্টার মুরারি, আমি···' বলতে গেল মুসা।
'আমার এক্সপেরিমেন্টাল গগলসে হাত দিয়েছিলে?' মাটিতে পড়ে থাকা যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছেন মুরারি। তারপর চোখে পড়ল কম্পিউটার কনসোলের গোড়া থেকে ধোঁয়া উঠছে। 'কি হয়েছিল? ভেঙে ফেলেছ নাকি?'
'না না,' তাড়াতাড়ি জবাব দিল মুসা। 'দেখুন, আমি দুঃখিত, আপনার হেলমেটটা মাথায় দিয়েছিলাম। আপনাকে খুঁজতে এসে এটা দেখে আর লোভ সামলাতে পারিনি। কিন্তু মাথায় দিয়ে খেলাম ইলেকট্রিক শক।'
'সর্বনাশ!' বলে উঠল রবিন। 'তারপর?'
দৌড়ে গিয়ে হেলমেটটা তুলে নিলেন মুরারি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বললেন, 'শর্ট সার্কিট! কোন কিছু নড়িয়ে ফেলোনি তো?'
'উঁহু,' জবাবটা দিল কিশোর। 'ও মাথায় দিয়েছে, আমি সুইচ টিপেছি। যে ভাবে স্পার্কিং শুরু করল, আমার ধারণা কম্পিউটারে কিছু হয়েছে।'
'তোমরা যখন ঢুকলে, কেউ ছিল এখানে? দরজাটা কি খোলা ছিল?' জিজ্ঞেস করলেন মুরারি। কিছু একটা মেলানোর চেষ্টা করছেন।
'না, কেউ ছিল না। দরজাটাও খোলা ছিল,' জবাব দিল কিশোর। 'ঘটনাটার জন্যে সত্যি আমরা দুঃখিত, মিস্টার মুরারি।'
হাত নেড়ে কিশোরের 'দুঃখটাকে' যেন উড়িয়ে দিলেন মুরারি। 'এখানে ঢোকা উচিত হয়নি তোমাদের। তবে সেটা নিয়ে ভাবছি না আমি। যন্ত্রপাতিগুলোতে কারসাজি করে রেখে গেছে কেউ, সেটাই আমার দুশ্চিন্তা।' রবিনের দিকে তাকালেন তিনি। 'কাকে সন্দেহ করছি, বুঝতে পারছ?'
'পারছি।' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। 'কিন্তু না দেখে এ ভাবে কারও ঘাড়ে দোষ চাপানোটা কি ঠিক হচ্ছে?'
শীতল হাসি ফুটল মুরারির ঠোঁটে। 'দেখাদেখির আর দরকার নেই। আমার কাজ যে মারটিনের পছন্দ না, এটা সে নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছে।'
চট করে মুসার দিকে তাকাল কিশোর। তারপর রবিনের দিকে। বুঝে গেছে, কোন অঘটন ঘটলেই মুরারি আর মারটিন একজন আরেকজনের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করেন।
'সমস্যাটা আমার মনে হয়েছে কম্পিউটার থেকেই হয়েছে,' কিশোর বলল। 'শর্ট সার্কিটের প্রোগ্রামিং নিশ্চয় সম্ভব না।'
'কিন্তু ডিসকানেক্ট তো করে রাখা যায়। আলগা করে লাগিয়ে রাখলেই স্পার্কিং শুরু করবে। তবে কোথায় কি করে রেখেছে, না দেখে শিওর হওয়া যাবে না।'
'তারমানে, বলতে চাইছেন, আপনি মারটিনের হাড়ের লেবেল বদলে দিয়েছিলেন বলে তিনি আপনার কম্পিউটারে গোলমাল করে রেখে গেছেন?'

কিশোর বলল।

অবাক মনে হলো মুরারিকে। 'বোধ-বুদ্ধি তো দেখছি ভালই আছে। সহজেই ধরে ফেলেছ। যা-ই হোক, ঘটনাটাতে অবাক হইনি আমি।'

'কিন্তু সত্যি সত্যি তিনি এমন একটা কাজ করবেন?'

'অবিশ্বাসের কিছু নেই।'

'কিন্তু, মিস্টার মুরারি,' রবিন বলল, 'মিস্টার মারটিন এখানে এসেছিলেন কিনা তাই তো জানি না আমরা। নিশ্চয় মেশিনেই কিছু হয়েছে। তা তো হতেই পারে, তাই না? মারটিন এ কাজ করে রেখে গেছেন, বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।'

'অ্যাক্সিডেন্ট ভাবছ?' এই প্রথম অনিশ্চিত মনে হলো মুরারিকে। 'কি জানি! তবে ভালমত না দেখে বোঝা যাবে না কিছু। ভাগ্যিস ভার্চুয়াল প্রোগ্রামের কপিগুলো সব আলমারিতে রেখে দিয়েছিলাম। তালার কম্বিনেশন আমি ছাড়া কেউ জানেও না।' কিশোর আর মুসার দিকে তাকালেন তিনি। 'হাতের কাজগুলো শেষ করে নিই। তারপর তোমাদের কাজ বুঝিয়ে দেব।'

'থ্যাংকস,' মুসা বলল। 'আমরা আসলে এখানে এসেছিলাম, ডাইনোবট টেস্টের সময় আমাদের থাকতে দেবেন কিনা জিজ্ঞেস করতে। আপনাকে ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে দরজা খোলা দেখে ঢুকে পড়েছিলাম।'

'তা থাকতে দিতে আপত্তি নেই,' মুরারি বললেন। 'তবে আজ বিকেলের আগে বোধহয় ডাইনোবট টেস্টের সময় পাব না।'

'অসুবিধে নেই,' জবাব দিল কিশোর। 'ততক্ষণ আমরা অপেক্ষা করতে পারব। ভাববেন না, জিজ্ঞেস না করে এ ভাবে আর কোন জিনিসেই হাত দেব না আমরা।'

'সত্যি আমি দুঃখিত,' আবার মাপ চাইল মুসা।

'না না, আমি কিছু মনে করিনি,' হাসলেন মুরারি। 'তুমি তো বরং আমাকে শক খাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিলে।'

'তবে যা-ই বলেন, শক ছিল বটে একখান! মরেই যেতাম আরেকটু বেশি হলে,' মুরারি কিছু মনে করেননি শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা।

'ওহ্হো,' বলে উঠল রবিন। 'ডক্টর ফারগুসনের সঙ্গে এখনও পরিচয়টা করানো হলো না তোমাদের। চলো, দেখে আসি, মীটিং শেষ হলো কিনা।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ফিরে তাকাল কিশোর। দেখল, কম্পিউটার কনসোলটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন মুরারি। নিশ্চয় পরীক্ষা করে দেখবেন এখন।

কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। ডাইনোসর পার্কের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'রবিন, মারটিন কি সত্যি সত্যি শর্ট-সার্কিট করে রেখেছিলেন? বিশ্বাস হয় তোমার?'

'কি জানি,' রবিন বলল। 'বুঝতে পারছি না । তবে মুরারি তাঁর হাড়ের লেবেল বদলে দেয়ায় প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন, এটা ঠিক। ব্যাপারটাকে মোটেও ভালভাবে নিতে পারেননি তিনি। কিন্তু তাই বলে মুরারির হেলমেটে

শর্ট-সার্কিট করে রাখবেন, এটাও বিশ্বাস করতে পারছি না।'

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইঙে ঢুকল তিনজনে। হলওয়ে ধরে এগোল। ডক্টর ফারগুসনের দরজার ওপাশ থেকে এখনও কানে আসছে চিৎকার করে কথা বলার শব্দ। জানালাটা দিয়ে উঁকি দিল কিশোর। তিনি এখন ডেস্কের সামনে একা। চিৎকার করছেন টেলিফোনে।

'ওই নামে কেউ নেই মানে?' বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে ভেসে এল ফারগুসনের চিৎকার। 'আধ ঘণ্টা আগেও তো কথা বললাম...'

ক্রেডলে রিসিভার আছড়ে রাখার শব্দ হলো। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল ফারগুসনের অফিসের দরজা। ঘর থেকে প্রায় উড়ে বেরোলেন ছোটখাট একজন মানুষ। তিনি গোয়েন্দাকে দেখে থেমে গেলেন।

'কিছু বলবে নাকি, রবিন? আমার তাড়া আছে,' ফারগুসন বললেন।

'ডক্টর ফারগুসন, ওরা আমার বন্ধু। ও কিশোর পাশা, ও মুসা আমান। উদ্বোধনীর জন্যে আমাদের সাহায্য করতে রাজি হয়েছে। কাজে কি নেব ওদের?'

'নাও না। অসুবিধে কি? ভালই তো,' দ্রুত জবাব দিলেন ফারগুসন। 'যত বেশি লোক পাব এখন, ততই ভাল। যা করার তুমিই করো, রবিন, কাজটাজ সব বুঝিয়ে দাও ওদের।' ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হচ্ছে তাঁকে। বার বার জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকাচ্ছেন। 'মারটিনকে দেখেছ?'

'এই তো খানিক আগেই ল্যাবরেটরিতে তাঁর সঙ্গে কথা বলে এলাম,' রবিন বলল। 'কি একটা জরুরী কাজে বেরিয়ে চলে গেলেন। এতক্ষণে নিশ্চয় ফিরে এসেছেন।'

হলের এদিক ওদিক চোখ বোলালেন ফারগুসন। অস্বস্তি বোধ করছেন কোন কারণে। 'যাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার। একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।' কিশোর আর মুসাকে বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

বলেই হাঁটতে শুরু করলেন।

'ঘটনাটা কি?' ফারগুসনের গমন পথের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল কিশোর। 'খুব অশান্তিতে আছেন মনে হচ্ছে!'

'বুঝতে পারছি না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল রবিন। 'কিছু একটা হয়েছে তাঁর।'

'সবাই এখানে আজ কেমন যেন একটু উত্তেজিত,' কিশোর বলল।

'উদ্বোধনীটা নিয়ে চিন্তায় আছে আরকি,' মুসা বলল।

'হতে পারে,' রবিন বলল। 'কিন্তু তোমাদের ক্ষেত্রে আরেকটু উষ্ণ অভ্যর্থনা আশা করেছিলাম আমি। মেজাজ খারাপ করে না আবার পালাও।'

'তা পালাব না,' অভয় দিল কিশোর। 'বরং আগ্রহ বোধ করছি। কৌতূহল বাড়ছে আমার। ডাইনোসরের চেয়ে মানুষ আমাকে কম আকর্ষণ করে না।'

হাসল রবিন। 'এই বিজ্ঞানীগুলো এক আজব মানুষ!'

কয়েকটা অফিস পার হয়ে এল ওরা। কর্মচারীদের কেউ কেউ রবিনের

দিকে মুখ তুলে হাসল। কেউ হাত নাড়ল।

বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। বিকেলের উজ্জ্বল রোদ। একজন লোককে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। ডিন মারটিন। কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। খুব হাঁপাচ্ছেন। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলেন, 'ফারগুসন...অফিসে আছেন?'

'না। জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। চলে গেলেন তো,' জবাব দিল রবিন।

নিজের হাতের তালুতেই চাপড় মারলেন মারটিন। 'ওই...ওই...' এতটাই রেগেছেন, কথা বের করতে পারছেন না মুখ দিয়ে।

'কি হয়েছে, মিস্টার মারটিন?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'আমি কোন সাহায্য করতে পারি?'

হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে জোরে জোরে মাথা নাড়লেন তিনি। 'কি আর হবে!...নোরাও গায়েব।...মিউজিয়ামটা যে গেছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই আমার!'

'কিসের কথা বলছেন আপনি, মিস্টার মারটিন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

শুনতেই পেলেন না যেন মারটিন। মুখ লাল। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস পড়ছে। আচমকা চিৎকার করে উঠলেন, 'যা সমস্ত কাজকারবার ঘটছে এখানে, শীঘ্রি বন্ধ করা না গেলে এই মিউজিয়াম আর জীবনেও খোলা হবে না, আমি বলে দিলাম। দেখো।'

রাগে চোখমুখ কুঁচকে রেখে ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন মারটিন। ঝড়ের গতিতে চলে গেলেন ফসিল হলের দিকে।

'এমন করলেন কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'জানলে তো ভালই হত,' বিমূঢ় হয়ে মারটিনের দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। 'এত রাগতে তাঁকে কখনও দেখিনি আমি।'

'নোরা কে?' জানতে চাইল কিশোর।

'নোরা ইভান।' ঘুরে দাঁড়াল রবিন। কুঁচকে রাখা চেহারাটা স্বাভাবিক করল। 'এই মিউজিয়ামেরই আরেক বিজ্ঞানী—প্যালিওলিথিক আর্ট অর্থাৎ গুহামানবদের শিল্পকর্মে বিশেষজ্ঞ। একটা জরুরী অভিযানে ভারতে গেছেন।'

'গায়েব বললেন কেন মারটিন?'

'কি জানি। হয়তো রাগ করে।'

'যা সব কাজকারবার ঘটছে বলে কিসের ইঙ্গিত দিলেন মারটিন?' জানতে চাইল মুসা।

'বুঝতে পারছি না। কোন কথাই তো স্পষ্ট করে বললেন না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল রবিন। 'মুরারির ওপর থেকে রাগটা বোধহয় এখনও যায়নি তাঁর।'

ফসিল হলের দিকে তাকাল কিশোর। রবিনের কথাই ঠিক: এই বিজ্ঞানীগুলো এক আজব মানুষ! তবে মারটিনের আচরণ দেখে শুধু বিজ্ঞানীর খেয়ালীপনা মনে হয়নি তার।

'তো?' রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'আজ কি কি কাজ করে দিতে হবে আমাদের?'

'কাজ আজকে বাদই দাও,' রবিন বলল। 'কাণ্ডকারখানা দেখে মেজাজ খিঁচড়ে গেছে আমারই। কাল তাজা মন নিয়ে কাজ শুরু করা যাবে।'

'হ্যাঁ, সেটাই ভাল হবে,' মুসা বলল।

'কাল সকালে সময়মত চলে এসো দু'জনে। কাজ বুঝিয়ে দেব।'

তিন

'যা ভেবেছিলাম, তারচেয়ে মিউজিয়ামটা অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং,' মুসার পুরানো জেলপি গাড়িতে করে বাড়ি ফেরার পথে বলল কিশোর।

'বলেছিলাম না, হতাশ হওয়া লাগবে না। একঘেয়েও তো লাগল না। না এলে মিস করতে।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে মুসা বলল, 'কিন্তু ডাইনোবটটাকে সচল দেখার জন্যে যে অস্থির হয়ে গেলাম আমি।'

'আমার আগ্রহ অন্য জিনিসে,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি আমি।'

'তোমার কি মনে হচ্ছে মুরারির যন্ত্রপাতিতে মারটিনই গণ্ডগোল করে রেখেছিল?'

শ্রাগ করল কিশোর। 'জানি না। কিন্তু তিনিই যদি করে থাকবেন, মিউজিয়াম খোলা যাবে না ভেবেই বা এতটা উতলা হচ্ছেন কেন?'

'আর উতলা হলেই বা সেটা ঠেকাবেন কি ভাবে?' মুসার প্রশ্ন।

এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। 'তবে একটা ব্যাপার স্পষ্ট, মারটিনকে এড়িয়ে গেছেন ডক্টর ফারগুসন। অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা বলে মারটিনের কাছ থেকে পালিয়েছেন। আর ফারগুসন চলে গেছেন শুনে মারটিন হয়েছেন প্রচণ্ড হতাশ। কেন যে এ রকম করলেন দু'জনে, বুঝলাম না।'

'তারমানে জানার জন্যে অস্থির?'

মুচকি হাসি ফুটল কিশোরের ঠোঁটে। 'তা তো বটেই।'

*

পরদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠল কিশোর আর মুসা।

মিউজিয়ামে এসে যখন পৌঁছল, কাজের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে তখন।

পার্কিং লটের পেছনে গাড়ি পার্ক করল মুসা। শ্রমিকদের গাড়ির জন্যে জায়গা ছেড়ে রাখল। সামনের গেটে ফ্লাডলাইট লাগাচ্ছে কয়েকজন শ্রমিক।

রবিনের খোঁজে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইঙে এসে ঢুকল দুই গোয়েন্দা। তাকে অফিসে না পেয়ে রওনা হলো হল অভ প্রিহিস্টরিতে, যেখানে রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর ডিসপ্লেগুলো।

প্যানোর‍্যামিক ডিসপ্লেতে কর্মরত একজন শ্রমিককে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'রবিনকে দেখেছেন?'

'দেখোগে, উইঙের শেষ মাথায়।'

ফসিল হলে পাওয়া গেল রবিনকে। মস্ত অ্যানট্রোডিমাসের কঙ্কালটার সামনে দাঁড়িয়ে ডিন মারটিনের সঙ্গে কথা বলছে। মারটিনের মেজাজ মনে হচ্ছে আজ সকালে অনেকটাই ভাল।

কিশোর আর মুসাকে এগোতে দেখে হাসল রবিন। 'এসেছ?'

সোয়েটশার্টের হাত গোটাতে গোটাতে বলল মুসা, 'হ্যাঁ। বলো, কি কাজ।'

'কাল তোমাদের সামনে পাগলামিটা একটু বেশিই করে ফেলেছি, তাই না?' মারটিন বললেন। 'অতিরিক্ত চাপে কাজ করার কুফল। সহিষ্ণুতা একেবারেই চলে যায়। কোন কিছুই সহ্য হতে চায় না।'

'আমরা কিছু মনে করিনি,' হাসল কিশোর। 'যদি বলেন তো আপনাকেই সাহায্য করি? কাজটাজ আছে কিছু?'

'আছে।' মারটিনের দিকে ঘুরল রবিন, 'ওদেরকে কাজে লাগাবেন?'

'লাগাব,' মারটিন বললেন। 'অনেক কাজই আছে ফসিল হলেও, যেগুলোর জন্যে ডিগ্রী নেয়ার দরকার পড়ে না।'

মারটিনকে ধন্যবাদ দিয়ে, কিশোর আর মুসাকে 'পরে দেখা হবে,' বলে চলে গেল রবিন।

দুই গোয়েন্দার দিকে ফিরলেন মারটিন। 'গতকালকের পাগলামির জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত। আমার কিছু কিছু সহকর্মী এমন সব কাণ্ড করেছে, নার্ভের ওপর চেপে গিয়েছিল।'

'হারভে মুরারির মত সহকর্মী?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঝাঁকালেন মারটিন। 'সত্যিকারের প্যালিওন্টোলজিস্টের মত আচরণ করছে না সে। আসল কাজ বাদ দিয়ে রোবটগুলো নিয়ে খেলা জুড়েছে।'

'যা-ই বলেন, মডেলগুলো কিন্তু তিনি বানিয়েছেন দারুণ,' মুসা বলল। 'দর্শক আকৃষ্ট করবে।'

'করলেও ওটা হয়ে গেল শোম্যানশিপ, বিজ্ঞানীসুলভ আচরণ নয়,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন মারটিন। 'আরও একটা ব্যাপার দেখো, যত রকমের উজ্জ্বল রঙ দিয়ে রঙ করেছে ওর সাধের ডাইনোবটগুলোকে। উদ্ভট কাণ্ড। আসল ডাইনোসরের রঙ দিলেও তো এক কথা ছিল। অন্তত খেলনা থেকে সামান্য সরে আসা যেত।'

'তাঁর যেটা ভাল মনে হয়েছে...' বলতে গেল কিশোর।

'তা ছাড়া,' তাকে বলতে দিলেন না মারটিন, 'ডাইনোসরের হাড়গুলোকে যে ভাবে এলোপাতাড়ি ছড়িয়েছে, কোন প্যালিওন্টোলজিস্টই না রেগে পারবে না।'

মুরারির ওপর মারটিনের রাগটা এখনও যায়নি বুঝতে পারল কিশোর।

কোনভাবেই রসিকতাটা মেনে নিতে পারছেন না। এ আলোচনা চলতে থাকলে আবার উত্তেজিত হবেন। বাদ দেয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি বলল, 'আমাদের কি কাজ দেবেন, দিন।'

'ছোটখাট ফসিলগুলো সরানো দরকার,' মারটিন বললেন। 'বড় একটা ফসিলের জন্যে জায়গা বের করতে হবে। আশা করছি উদ্বোধনীর আগেই ওটা খাড়া করে ফেলতে পারব।'

'বলুন কোনটা কোনটা সরাতে হবে?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'সরিয়ে কোথায় রাখব?'

'ধীরে, ইয়াং ম্যান। ধীরে। কাজ শুরু করার আগে ফসিল সম্পর্কে কিছুটা সাধারণ জ্ঞান অন্তত থাকা দরকার তোমাদের। তাহলে কাজের গুরুত্ব বুঝতে পারবে।'

'আমিও সেটাই চাচ্ছিলাম।' পকেট চাপড়ে বলল, 'খাতা-কলম নিয়ে এসেছি। নোট নিতে হলে নেব।'

আগ্রহী ছাত্র পেয়ে খুশি হলেন মারটিন। 'গুড। প্রথমেই জানা যাক, ফসিল জিনিসটা কি? জানো নাকি তোমরা?'

'প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের কঙ্কাল,' জবাব দিল মুসা। ভঙ্গি দেখে মনে হলো, স্কুলে ক্লাস করতে বসেছে।

মাথা ঝাঁকালেন মারটিন। 'ফসিলকে বলা যেতে পারে প্রকৃতির এক মহাবিস্ময়।' বাবা যে চোখে সন্তানের দিকে তাকায়, কঙ্কালগুলোর দিকে সে-ভাবে তাকালেন তিনি। 'প্রাগৈতিহাসিক কোন প্রাণী মারা যাবার পর যদি অন্য প্রাণীর খাবার হয়ে না যেত, মাটিতে পড়ে থাকত, খুব শীঘ্রি শুধু কঙ্কালটা ছাড়া কোন কিছু আর অবশিষ্ট থাকত না ওটার। এ সব কঙ্কালেরও বেশির ভাগই নানা কারণে নষ্ট হয়ে যেত। কিছু কিছু টিকে যেত গায়ের ওপর এক ধরনের গাদ জমে যাওয়ার কারণে। সেই গাদ এক সময় পুরোপুরি ঢেকে ফেলত কঙ্কালটাকে। ধীরে ধীরে পাথরে পরিণত হত গাদ সহ কঙ্কালটা। হাড়ের মধ্যে খনিজ পদার্থ ঢুকে গিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হত। এ ভাবেই ওসব কঙ্কাল টিকে গেছে লক্ষ-কোটি বছর। কোটি কোটি বছর পর বাতাস আর বৃষ্টির ক্ষয়করণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এখন বেরিয়ে আসছে ফসিলগুলো।'

'সত্যি! ভীষণ রোমাঞ্চকর গল্প!' মুসা বলল। 'ফসিল হওয়ার পদ্ধতিটা আমি যত সোজা ভেবেছিলাম, দেখা যাচ্ছে ততটা নয়। অনেক বেশি জটিল।'

মাথা ঝাঁকালেন মারটিন। পছন্দসই বিষয় পেয়ে লেকচার দিতে দিতে ক্রমেই উত্তেজিত ভাবটা কেটে যাচ্ছে তাঁর। অনেক সহজ হয়ে এলেন। 'এই যে এটা, হিপসিলোফোডোনের হাড়। ক্রিটেসাস পিরিয়ডের ছোট আকারের ডাইনোসর। দেখতে অনেকটা ক্যাঙারুর মত ছিল এরা। সামনের ছোট ছোট দুর্বল পায়ের চেয়ে পেছনের পা বড় আর অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। দাঁতের আকৃতি দেখে বোঝা যায় এরা হারভিভোরাস, অর্থাৎ তৃণভোজী। এটাকে ডিসপ্লেতে রাখার আগে আমাদের জানতে হবে, এ কি চার পায়ে দৌড়াত,

নাকি শুধু পেছনের দুই পায়ে।'
বলতে বলতে কিশোর আর মুসার অস্তিত্বই যেন ভুলে গেলেন মারটিন।
'এটাকেই সরাতে হবে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।
হাত তুললেন মারটিন। 'দাঁড়াও। আমার কথা শেষ হয়নি এখনও। এত সাধারণ জিনিস ভেবো না এটাকে যে, ধরলাম, তুললাম আর নিয়ে গিয়ে রেখে দিলাম। কি ভাবে করতে হবে, আমি তোমাদের দেখিয়ে দেব। তার আগে গিয়ে হল অভ প্রিহিস্টরিতে কয়েকটা কাজ শেষ করতে হবে আমাদের।' নাক কুঁচকালেন তিনি। 'অবস্থাটা এমন, যেন আমার নিজের কোন কাজ নেই, এখন গিয়ে নোরা ইভানের কাজও সামলাও।'
'প্যালিওলিথিক আর্টে উনি বিশেষজ্ঞ, তাই না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।
'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন মারটিন। 'এখানে এখন আমাদের একসঙ্গে কাজ করার কথা। তা না, সে চলে গেল ভারতে। কিছু ফসিল পাওয়া গেছে। জায়গাটাতে নাকি শীঘ্রি রাস্তা বানানোর জন্যে বুলডোজার চালানো হবে। তার আগেই হাড়গুলো যতটা সম্ভব তুলে নিয়ে আসতে চায়। চলে যাওয়ার জন্যে তাকে অবশ্য দোষ দেয়া যায় না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন তিনি। 'আমি সুযোগ পেলেও একই কাজ করতাম।'
লম্বা লম্বা পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। তাড়াতাড়ি তাঁর পিছু নিল দুই গোয়েন্দা। হল অভ প্রিহিস্টরিতে এসে ঢুকল।
একটা নকল গুহা তৈরি করা হচ্ছে। কাজ শেষ হতে সময় লাগবে। ওটার ভেতরের দিকের দেয়ালে আঁকা হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক কালে আঁকা একটা পেইন্টিঙের নকল। খুব যত্ন করে বানানো কিছু আদিম মানব-মানবীকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে গুহামুখের কাছে। দেখে মনে হয় আগুনের কুণ্ড ঘিরে বসেছে। আগের দিন বিকেলে বাইসনের যে মূর্তিটা দেখেছিল কিশোর আর মুসা, সেটা রাখা হয়েছে এখন গুহার সামনে। গুহামানবদের ব্যবহৃত কিছু জিনিসপত্রও এনে রাখা হয়েছে ওটার কাছে।
'প্রিহিস্টরিক আর্ট আমার সাবজেক্ট নয়,' মারটিন বললেন। 'তবে আগ্রহ আছে। এই বাইসনটা আমার খুব পছন্দ।'
'আমারও ভাল লাগছে,' কিশোর বলল।
এ সময় ঘরে ঢুকল একজন বয়স্ক লোক। ধূসর হয়ে এসেছে চুল। চোখে পুরু লেন্সের চশমা।
'এসো এসো, হ্যারিস,' ডাক দিলেন মারটিন। 'আমার দুই নতুন ভলান্টিয়ারের সঙ্গে পরিচয় করে যাও।'
এগিয়ে এল হ্যারিস। মাথা নিচু। চোখ মেঝের দিকে।
'ও হলো হ্যারিস বারনার,' গোয়েন্দাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন মারটিন। 'আমাদের হেড কাস্টোডিয়ান।
অস্বস্তি বোধ করছে হ্যারিস। মাথা ঝাঁকাল। মুসা আর কিশোরের সঙ্গে হাত মেলানোর আগে পকেট থেকে রুমাল বের করে হাত মুছল।

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' চঞ্চল দৃষ্টি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে বারনারের। কোনমতে দু'জনের হাত দুটো ছুঁয়েই দ্রুত পিছিয়ে গেল। 'যাই। মোছামুছির কাজ আছে আমার।'

'কথাটথা খুব কম বলে হ্যারিস,' মারটিন বললেন।

কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি। 'লেখো। কি কি করতে হবে। ডিক কারসনের ওপর নজর রাখবে, যাতে গুহাটার রঙ করা শেষ করে ঠিকমত।' গতকাল এখানে গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট ডিক কারসনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, মনে পড়ল কিশোরের। 'অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে রাখা পাথরগুলোকে নতুন করে সাজাতে হবে, যাতে আরও বাস্তব দেখায়।'

মারটিনের সঙ্গে আদিম মানুষদের আরেকটা এক্সিবিটের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। এখানে মানুষের একজন আদিম পূর্বপুরুষ অস্ট্রালোপিথেকাসকে দেখা গেল হাঁটু গেড়ে বসে পাথরের কুড়াল বানাচ্ছে। আরেক জায়গায় দেখা গেল কয়েকজন এইপ-ম্যান লাঠি নেড়ে ভয় দেখিয়ে একটা প্রাগৈতিহাসিক চিতাকে তার শিকারের ওপর থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করছে।

যা যা করতে হবে বলে গেলেন মারটিন, নোটবুকে লিখে নিতে লাগল কিশোর। লেখা শেষ হলে কাজ শুরু। মুসা আর মারটিন অগ্নিকুণ্ড ঘিরে থাকা পাথরগুলোকে সাজাতে বসলেন। নোটবুক নামিয়ে রেখে কিশোরও সাহায্য করতে গেল।

সাজানো শেষ হলে মারটিন বললেন, 'এখানে আপাতত আর কিছু নেই। চলো, ফসিল হলে।'

হল অভ প্রিহিস্টরির দরজায় এসে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। 'ওহ্হো, বাইসনের বাক্সটার ওপর নোটবুকটা ফেলে এসেছি। আপনারা এগোন। আমি এক দৌড়ে গিয়ে নিয়ে আসি।'

হল অভ প্রিহিস্টরিতে ফিরে এল কিশোর। বাইসনের বাক্সটার পাশে উঁচু একটা কাঠের মই দাঁড় করিয়েছে বারনার। ওপরের ধাপটায় উঠে দাঁড়িয়ে হাত টানটান করে দিয়েছে ছাত থেকে ঝোলানো হোল্ডারে বাল্‌ব্ লাগানোর জন্যে।

নোটবুকটা তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। আচমকা তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শুনে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। ওপর দিকে চোখ তুলে তাকাল।

মইটা কাত হয়ে যাচ্ছে। মইয়ের ওপর খাড়া থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে বারনার। পারছে না। হোল্ডারের তারটা ধরে বাঁচার শেষ চেষ্টা করল। তা-ও পারল না। কিশোরও তাকে সাহায্য করার সুযোগ পেল না। মই নিয়ে পড়ে যেতে শুরু করল বারনার।

চার

মাথার ওপর পড়ার ভয়ে ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলল কিশোর। ঝাঁপ দিল এক পাশে। চোখের কোণ দিয়ে একটা নড়াচড়া লক্ষ করল। প্রচণ্ড হুড়ুম-ধাড়ুম ঝনাৎ-ঝন শব্দ। চারপাশে ছড়িয়ে যেতে শুরু করল কাঁচ। ভয়ে মাথা তুলতে পারছে না সে।

ধড়াস ধড়াস করছে বুক। আস্তে মাথা তুলে তাকাল সে। অল্পের জন্যে বাইসনের বাক্সের ওপর পড়েনি মইটা। পড়েছে পাশের বাক্সটার ওপর। চারপাশে ছড়ানো কাঁচের টুকরো।

মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে আছে বারনার। বেহুঁশ হয়ে গেল নাকি?

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তার কাছে বসল কিশোর। মিটমিট করে চোখের পাতা মেলল কাস্টোডিয়ান।

'ঠিক আছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

বিড়বিড় করে কি বলল লোকটা, বোঝা গেল না। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠতে গিয়ে ভাঙা কাঁচের টুকরো বিঁধে গেল চামড়ায়। উহ্ করে উঠল।

তাড়াতাড়ি তাকে ধরে তুলল কিশোর।

বারনারের কনুই কেটে রক্ত বেরোচ্ছে।

ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'কিন্তু পড়লেন কি করে?'

'মইটা নড়বড়ে হয়ে ছিল,' কনুইয়ের কাটা জায়গাটা টিপে ধরল বারনার। 'কিন্তু এমন তো থাকার কথা না। কেউ যেন ইচ্ছে করে নাটবল্টু ঢিল করে রেখেছিল।'

ইতিমধ্যে হলের অন্যান্য শ্রমিকেরা দৌড়ে এসে হাজির হলো। ঘিরে দাঁড়াল দু'জনকে। মুসাও ছুটে এল মারটিনের সঙ্গে। কাঁচের টুকরো মাড়িয়ে কিশোরের কাছে এসে দাঁড়াল মুসা।

'দেখো দেখো, হাত-পা কেটো না আবার,' সাবধান করল কিশোর।

ছুটতে ছুটতে এল রবিন। কাছে এসে এত কাঁচ ভাঙা দেখে চোখ কপালে উঠল তার। 'কি হয়েছে?'

'সত্যি বলছি, ইচ্ছে করে করিনি আমি!' বারনার বলল।

'কি করেননি?' জানতে চাইল রবিন।

'ছোট্ট একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে বারনার,' বারনারের হয়ে জবাবটা দিল কিশোর। 'মই নিয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। মইটার নাকি নাটবল্টু ঢিলা ছিল। নড়বড়ে হয়ে থাকাতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি সে। আরেকটু হলে আমার মাথায়ই পড়ত। কোনমতে লাফ দিয়ে সরে বেঁচেছি।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের। 'কোথাও লাগেটাগেনি তো তোমার?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'নাহ্।'

'আমি···আমি এখনই পরিষ্কার করে ফেলছি সব,' বারনার বলল। দেহের সঙ্গে সঙ্গে গলাও কাঁপছে তার। 'দেখি, সরো তো। জায়গা দাও। ঝাড়ুটা নিয়ে আসি।'

গায়ের কাপড় থেকে সাবধানে এক টুকরো কাঁচ তুলে ফেলে দিল কিশোর।

'ভাগ্যিস সরে যেতে পেরেছিলে,' শঙ্কিত কণ্ঠে বলল মুসা। জুতোর ডগা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে লাগল ওদের সামনে পড়ে থাকা কাঁচের টুকরোগুলো।

'মই নিয়ে যে বাইসনের কেসটার ওপর পড়েনি, সেটাই ভাগ্য,' রবিন বলল। 'তাহলে এত দামী মূর্তিটা যেত আজ।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে চোয়াল ডলতে লাগলেন মারটিন। আর কিছু বললেন না।

ঝাড়ু, বালতি আর ন্যাকড়া নিয়ে বারনারকে ফিরে আসতে দেখে মুখ তুলে তাকাল সবাই। ঝাড়ু দিয়ে কাঁচ সরাতে শুরু করল সে। এখনও হাত কাঁপছে তার। মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে রেখেছে।

'হ্যারিস, আপনি ওখানে বাতি লাগাতে গিয়েছিলেন কেন?' বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ভাবলাম···অন্ধকার হয়ে আছে জায়গাটা। লাগিয়ে ফেলি। কাজ এগোবে।' মুখ কালো হয়ে গেছে বারনারের। 'কিন্তু মইটার মধ্যে যে কারসাজি করে রাখবে তা কি আর জানতাম!'

'হুঁ। মাথাটাতা যে ফাটাননি এই বেশি।'

'ফাটত। মইটা বাক্সের ওপর না পড়ে সরাসরি যদি মেঝেতে পড়ত।'

'কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা ডক্টর ফারগুসনকে জানাবে কে? যে রকম মাথা গরম হয়ে আছে তাঁর···' রবিন বলল। 'দেখি কি করা যায়। আসুন আমার সঙ্গে।'

কিশোর লক্ষ করল, ভয়ে বড় বড় হয়ে গেছে বারনারের দুই চোখ। রবিনও অস্বস্তি বোধ করছে এ রকম একটা খবর নিয়ে ডক্টর ফারগুসনের মুখোমুখি হতে। তবু, জানাতে তো হবেই।

কাঁচের টুকরো মাড়িয়ে রবিনের পেছন পেছন এগোল বারনার।

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন মারটিন। 'এমনিতেই কাজের যন্ত্রণায় বাঁচি না, তার ওপর···।' কিশোর আর মুসার দিকে তাকালেন। 'কাঁচের মধ্যে থেকে আগে পাথরগুলো তুলে এনে এখানে মেঝেতে লাইন দিয়ে রাখো। কাঁচ সাফ না করে আর বসানো যাবে না।'

পাথরের তৈরি একটা কুড়াল তুলে নিলেন মারটিন। ফেটে রয়েছে জিনিসটা। যে গুহামানব পাথর দিয়ে পিটিয়ে এটার কিনারে ধার তোলার চেষ্টা

করেছিল, সে-ই ফাটিয়েছে। কাঁচের টুকরো নেই এ রকম পরিষ্কার একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে জিনিসটা খুব সাবধানে নামিয়ে রাখলেন তিনি। তাঁর দেখাদেখি কিশোর আর মুসাও পাথরের অন্যান্য যন্ত্রপাতি আর তীরের মাথাগুলো সরিয়ে ফেলতে শুরু করল। জুতোর নিচে পড়ে গুঁড়ো হচ্ছে কাঁচের টুকরো।

কয়েক মিনিট দেখার পর মারটিন বললেন, 'বাহ্, ধরে ফেলেছ তো কাজটা। করতে থাকো। আমি স্টোররুমে গিয়ে খুঁজে দেখি এ সাইজের আরেকটা ডিসপ্লে কেস পাওয়া যায় কিনা।'

পুরো একটি ঘণ্টা পরিশ্রম করে সমস্ত পাথর ভাঙা কাঁচের মধ্যে থেকে সরানো শেষ করল কিশোর আর মুসা। সারি দিয়ে রাখল মেঝেতে।

এ সময় ফিরে এল রবিন। 'অনেক কাজ করে ফেলেছ দেখি। মুসা, খিদে পায়নি? লাঞ্চটা সেরে আসতে পারো ইচ্ছে করলে।'

'এই হলোগে একটা কথার মত কথা,' দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার। 'খাবার পাওয়া যাবে এমন কোন জায়গা আছে ধারে কাছে?'

'মাইলখানেক দূরে স্যাকভিলে আছে একটা রেস্টুরেন্ট,' রবিন বলল। 'ওখানে গিয়ে খেয়ে আসতে পারো। আমিও তোমাদের সঙ্গে যেতাম, কিন্তু এখানে জরুরী কাজ আছে। সময় দিতে পারব না। মুরারিকে সাহায্য করতে হবে। ডেস্কে বসেই যা পারি সামান্য কিছু খেয়ে নেব।'

'মারটিনের ফসিল সরাব কখন?' জানতে চাইল মুসা।

'এইমাত্র এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলে এলাম,' রবিন বলল। 'স্টোরে ডিসপ্লে কেস পাওয়া যায়নি। রকি বীচে যেতে হবে তাঁকে, বাক্স আনতে। এ সময়টায় পারলে তোমরা বরং মুরারিকে সাহায্য কোরো।'

'ভালই হবে,' খুশি হলো মুসা। 'এ সুযোগে তাঁর ডাইনোবটগুলোকেও ভালমত দেখতে পারব। দেখার কৌতূহলটা চাপা দিতে পারছি না কোনমতে।'

'ঠিক আছে। যাও তাহলে। লাঞ্চের পর আবার এখানেই দেখা হবে।'

কয়েক মিনিট পর ভট ভট আওয়াজ তুলে জেলপি গাড়িটা স্যাকভিলের রেস্টুরেন্টটার সামনে এনে রাখল মুসা। ছোট্ট শহরটার সবচেয়ে বড় বিল্ডিং এটা। চৌরাস্তাটার এক কোণে; বাকি তিন কোণে রয়েছে একটা গ্যাস স্টেশন, একটা মুদি আর একটা হার্ডওয়ারের দোকান।

রেস্টুরেন্টে ঢুকল দু'জনে। সামনের জানালার পাশে একটা টেবিলে গিয়ে বসে বার্গারের অর্ডার দিল। চেয়ারে হেলান দিয়ে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'কাঁচের টুকরো-টাকরা লেগে নেই তো আর কাপড়ে?'

শুকনো হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। 'মনে হয় না। সবই তো ফেললাম।'

'আমি ভাবছি বারনারের কথা। ওসব কাঁচ সাফ করতে পুরো বিকেলটা খাটতে হবে তাকে। বেচারা! রবিন যখন ওকে ডক্টর ফারগুসনের অফিসে নিয়ে যাচ্ছিল, ভয়ে চেহারাটা কি হয়েছিল দেখেছ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'ভাগ্যিস বাইসনের মূর্তিটার ওপর পড়েনি।

অনেক দামী জিনিস ওটা। নষ্ট হয়ে গেলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যেত মিউজিয়ামের।'

স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'তোমার কি ধারণা, ইচ্ছে করে বাইসনের বাক্সটার ওপর পড়তে চেয়েছিল বারনার?'

'কিংবা মই নড়বড়ে করে রেখে কেউ তাকে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই লোকটা জানল কি ভাবে বারনার বাল্‌ব্‌ লাগাতে উঠবে?' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'ভাবছি বাইসনের মূর্তিটা ভেঙে গেলে মারটিনের চেহারাটা কেমন হত? তাঁকে শায়েস্তা করতে হলে এর বেশি আর কি দরকার?'

'মুরারিকে সন্দেহ করছ?'

'কাকে যে সন্দেহ করব, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমি বুঝতে পারছি না,' মুসা বলল, 'মারটিনকে শায়েস্তা করে কার কি লাভ?'

'কেন, মুরারির। সে যদি মনে করে থাকে, তার ভারটিউয়াল রীয়্যালিটি ইকুইপমেন্টে শর্ট সার্কিট করে রাখার জন্যে মারটিনই দায়ী, তাহলে একহাত নেয়ার কথা ভাবতেই পারে,' জবাব দিল কিশোর। 'কিন্তু তাই বলে এ ভাবে? এত দামী একটা জিনিস নষ্ট করে?'

'প্রতিশোধের নেশা মানুষকে পাগল করে তোলে। হুঁশজ্ঞান আর থাকে না তখন,' মুসা বলল।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ব্যাপারটা নিয়ে রবিনের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার।'

'কিন্তু সময় কই তার?'

'এখন হবে না। কিন্তু ডিনারের সময়?'

খাবার নিয়ে হাজির হলো ওয়েইট্রেস। প্লেট ভর্তি ফ্রাই আর বার্গার টেবিলে নামিয়ে রেখে চলে গেল।

খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসা। মুহূর্তে মাথা থেকে উধাও হয়ে গেছে যেন অন্য সব কথা।

'খাওয়ার পর চাচীকে একটা ফোন করতে হবে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। মুসার দিকে তাকাল, 'আরে আস্তে খাও না। গলায় আটকে মরবে তো।'

*

মিউজিয়ামে ফিরে আবার আগের জায়গায় গাড়ি রাখল মুসা। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইঙের দিকে এগোনোর সময় রবিনকে দেখল বারনারের সঙ্গে কথা বলতে। ওদের দিকে চোখ পড়তে হাত নাড়ল রবিন।

'শোনো,' রবিন বলল, 'বারনারকে বলছিলাম, একা কুলাতে না পারলে তোমাদের সাহায্য নিতে। তোমাদের কোন আপত্তি আছে?'

'একটুও না,' জবাব দিল কিশোর। 'প্রয়োজন হলে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটতে রাজি আছি।'

'ওই যে, শুনলেন তো,' বারনারকে বলল রবিন। 'ওরা রাজি।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাদের,' বারনার বলল। 'তোমাদের কথা মনে থাকবে আমার।'

তাড়াহুড়া করে হল অভ প্রিহিস্টরির দিকে চলে গেল সে।

'লাঞ্চ কেমন হলো?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'খারাপ না,' জবাব দিল মুসা। 'সন্ধ্যা পর্যন্ত নড়াতে পারব দেহটা। মুরারিকে সাহায্য করতে কি যাব এখন?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'যাও। ডাইনোবটটাকে চালানোর জন্যে রেডি হচ্ছেন মুরারি। ডাইনোসর পার্কেই পাবে তাঁকে। শেষবারের মত দেখছেন সব ঠিকঠাক আছে কিনা।'

'তাহলে তো এখুনি যাওয়া দরকার,' লাফিয়ে উঠল মুসা।

'চলো, আমিও যাচ্ছি,' রবিন বলল। 'ডাইনোবটটা কি করে চলে দেখার লোভ আমিও সামলাতে পারব না।'

অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উইঙটা আড়াআড়ি পার হয়ে এসে লনে নামল ওরা। এখান থেকে ডাইনোসর পার্কটা চোখে পড়ে। হল অভ প্রিহিস্টরি দিয়েও ঢোকা যায়, এখান দিয়েও ঢোকা যায়। এদিক দিয়েই ঢুকল ওরা। কিশোর লক্ষ করল, বেশ যত্ন করে লাগানো হয়েছে গাছপালা, ঝোপঝাড়। পায়েচলা পথ আছে। ডাইনোসরগুলোকে স্পষ্ট চোখে পড়ে।

পার্কের ঠিক মাঝখানে রয়েছেন মুরারি। মস্ত ডাইনোসরের মডেল থেকে বেরিয়ে আসা তারটারগুলো নিয়ে টানাটানি করছেন। তিন গোয়েন্দাকে দেখে হাসলেন। আঙুলের ইশারায় কাছে যেতে বললেন।

'সাংঘাতিক একটা দিন যাচ্ছে,' ওরা কাছে গেলে বললেন তিনি। 'এত কাজ। কত কিছু চেক করা লাগছে। কারও সাহায্য পেলে ভাল হত।'

'এই যে আপনার সাহায্য,' কিশোর আর মুসাকে দেখিয়ে বলল রবিন। 'আমি একটু ঘোরাঘুরি করে আসি। দেখি আর কারও কিছু দরকার আছে কিনা। যাব আর আসব।'

অনেকগুলো পায়ে চলা পথের একটা ধরে চলে গেল রবিন।

মুরারির দিকে ফিরল মুসা আর কিশোর।

'এক্সিবিটটা প্রায় রেডি হয়ে এসেছে,' তিনি জানালেন। 'তবে প্রতিটি জিনিসই বারবার চেক করে নিতে হচ্ছে। ভুল হলে খেসারত দিতে হবে ভাল মত।'

'সত্যি কি নড়বে এগুলো?' গলা লম্বা করে রাখা বিশাল দানবীয় মডেলগুলোর দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল মুসা।

'নড়বে,' মাথার ক্যাপটা খুলে কপালের ঘাম মুছলেন মুরারি। 'চোখ নড়াতে পারবে। ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাতে পারবে। মুখ হাঁ করে বন্ধ করতে পারবে। লেজও নাড়াতে পারবে মোটামুটি।'

'তারমানে দাঁড়িয়ে থাকবে এক জায়গাতেই?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ।' হাত তুলে দেখালেন মুরারি, 'কেবল এই শিংওলা ডাইনোসরটা বাদে। এর নাম ট্রাইসেরাটপস। এর ভেতরে ছোট একটা কন্ট্রোল চেম্বার আছে। পেটের নিচে দরজাও আছে, ঢোকার জন্যে।'

'খাইছে!' পার্কের জংলা অংশটায় চকিতে ঘুরে এল একবার মুসার চোখ। 'বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে ডাইনোসরটা?'

'দর্শকদের জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে না তো?' কিশোরের প্রশ্ন।

'সেটা চালকের ওপর নির্ভর করে,' জবাব দিলেন মুরারি। 'উল্টোপাল্টা চালালে তো হবেই। ওই বেড়ার বাইরে থাকবে দর্শক,' হাত তুলে কোমর সমান উঁচু একটা বেড়া দেখালেন তিনি। 'আমরা চাই না টিকেট কেটে দেখতে আসা আমাদের দর্শকরা ডাইনোবটের পায়ের নিচে পড়ে ভর্তা হয়ে যাক।'

'আর কোনটাকেই এ ভাবে নড়ানো সম্ভব না, তাই না?' মুসা বলল।

'না। শুধু ট্রাইসেরাটপসটাই। বাকিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে কন্ট্রোল রুম থেকে। ওগুলোর নড়াচড়া কম্পিউটারে প্রোগ্রাম করা থাকবে। আপনাআপনি নড়তে থাকবে। তবে কন্ট্রোল প্যানেল থেকে জয়স্টিকের সাহায্যেও ওগুলোকে নড়ানো সম্ভব। চলো দেখাব তোমাদের।'

কন্ট্রোল রুমের দিকে রওনা হলেন মুরারি। তাঁর পিছু পিছু হাঁটতে লাগল দুই গোয়েন্দা। মাটিতে বিছিয়ে থাকা অসংখ্য তার ডিঙিয়ে এগিয়ে চলল।

'মিউজিয়াম চালু করার আগেই এই তারগুলোকে মাটির নিচে চাপা দিতে হবে, যাতে দর্শকদের পায়ের নিচে না পড়ে,' মুরারি বললেন।

'অ্যানিমেশনের কাজটা কি ভাবে করাবেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'মেকানিক্যাল জিনিসপত্র, এয়ার কম্প্রেসর আর কম্পিউটারের সাহায্যে। জয়স্টিকও থাকবে।'

'ভিডিও গেমের মত?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

'বন্ধ করার জন্যে ইমার্জেন্সি সুইচ আছে তো নিশ্চয়?' জানতে চাইল কিশোর। 'বিদ্যুতের মেইন সুইচের মত? যে কোন সময় কোন একটা ডাইনোবট নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতেই পারে।'

'আছে, এই যে, কন্ট্রোল প্যানেলে।' লাল রঙের একটা সুইচ দেখালেন মুরারি। 'ডাইনোবটগুলো সাধারণ মেশিন। কিন্তু এ ধরনের বড় মেশিন সে যত সাধারণই হোক না কেন, মারাত্মক বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।'

কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। বিশাল জানালাটা দিয়ে ডাইনোসর পার্কের দিকে তাকালেন। 'পাওয়ার অন করছি,' বলেই একটা সুইচ টিপে দিলেন।

মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল কন্ট্রোল-প্যানেলের নিচের যন্ত্রপাতিতে। কাজ শুরু করে দিল এয়ার কম্প্রেসর। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে মুসা ও কিশোর। মাথা আর লেজ নাড়তে শুরু করেছে টাইরানোসরাসটা। মুখ ফাঁক করে বিকট গর্জন করছে।

'অ্যাপাটোসরাসটা নড়ছে না কেন?' ভুরু কুঁচকে গেল মুরারির। 'ওটারও তো এখন মাথা নুইয়ে মুখ ফাঁক করার কথা। মুসা, দৌড়ে গিয়ে চট করে দেখে আসবে তারের কানেকশনগুলো ঠিক আছে নাকি? অ্যাপাটোসরাসটার সামনের দিকে দেখতে পাবে।'

এক দৌড়ে কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে গেল মুসা। তারের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটল। ডাইনোসরের মডেলটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'এহ্, তারের একেবারে জংশন হয়ে আছে,' বিড়বিড় করল মুসা। ফিরে তাকিয়ে মুরারির উদ্দেশে চিৎকার করে বলল, 'কোন্ তারটা দেখতে হবে বুঝতে পারছি না।'

'দাঁড়াও, আমি আসছি,' মুরারি জবাব দিলেন।

মুসার পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি। মনোযোগ দিয়ে তারগুলো দেখতে দেখতে নিচু হয়ে একটা তার তুলে নিলেন। মোচড় দিলেন কানেকশনটাতে। আচমকা নড়ে উঠল অ্যাপাটোসরাসটা। ঝাঁকি দিয়ে বিশাল মাথাটা নিচে নামিয়ে নিয়ে এল। খুলতে বন্ধ করতে শুরু করল যান্ত্রিক চোয়ালটা।

'কি সাংঘাতিক!' কন্ট্রোল রুম থেকে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'এখান থেকে একেবারে জীবন্ত মনে হচ্ছে!'

পেছনে ফিরে তাকিয়ে হাত নেড়ে তার কথাকে স্বাগত জানালেন মুরারি।

হঠাৎ সামনের দিকে গলা লম্বা করে দিল অ্যাপাটোসরাস। মাথা দিয়ে বাড়ি মারল মুরারিকে। প্রচণ্ড আঘাতে মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি। পরক্ষণে চোয়াল ফাঁক করে মুসাকে কামড়ে ধরল ওটা। কোমরের কাছটায় কামড়ে ধরে ঝাঁকি দিয়ে মাটি থেকে শূন্যে তুলে ফেলল।

চমকের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতেই চিৎকার করে উঠল মুসা। পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল।

পাঁচ

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে মুসা। দুই হাতে যান্ত্রিক চোয়ালটাতে কিল মারছে।

আতঙ্কিত হয়ে তাকিয়ে আছে কিশোর। বিশাল দানবটার মুখে মুসাকে লাগছে বিড়ালের মুখে ইঁদুরের মত। এখনও মাটি থেকে উঠতে পারেননি মুরারি।

কন্ট্রোল প্যানেলের কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। ইমার্জেন্সি সুইচের বোতামের দিকে হাত বাড়িয়ে থেমে গেল। সুইচ বন্ধ করে দিলে রোবটটা যে অবস্থায় রয়েছে সে-ভাবেই যদি স্থির হয়ে যায়? মাটি থেকে চল্লিশ ফুট উঁচুতে আটকে থাকবে মুসা।

কিন্তু আর কোন উপায়ও দেখতে পেল না সে। যা থাকে কপালে ভেবে দিল লাল বোতামটা টিপে। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল ডাইনোসরের মডেলগুলো। নিথর হয়ে গেল অ্যাপাটোসরাস। এখনও ওটার মুখেই রয়ে গেছে মুসা। কন্ট্রোল রুম থেকে ছুটে বেরিয়ে এল কিশোর।

মুরারির কাছে দৌড়ে এসে দাঁড়াল সে। মাটি থেকে উঠে বসেছেন তিনি। দুই হাতে মাথা টিপে ধরেছেন। আঘাতের ঘোরটা কাটাতে পারেননি এখনও।

'কিশোর! এখান থেকে নামাও আমাকে!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

'আতঙ্কিত হয়ো না,' কিশোর বলল। 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো। ব্যবস্থা করছি।' মুরারির দিকে তাকাল সে। 'মুসাকে নামাব কি করে?'

মুখ তুলে ওপরে তাকাতে গিয়ে ব্যথায় কুঁচকে গেল মুরারির মুখ। রক্ত সরে যাওয়া ফ্যাকাসে চেহারা। 'সর্বনাশ!' চিৎকার করে উঠলেন। 'জলদি আমাকে কন্ট্রোল রুমে নিয়ে চলো!'

মুরারিকে ধরে খাড়া করল কিশোর। ধরে ধরে নিয়ে চলল কন্ট্রোল রুমে। পায়ে জোর নেই তাঁর। কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে এসে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। চোখ বন্ধ করে দম নিতে লাগলেন।

'জয়স্টিকটাকে সামনে ঠেলে দাও,' অবশেষে কথা বললেন তিনি। 'মাথা নামাবে ওটা। তারপর সবুজ চারকোনা বোতামটা টেপো। চোয়াল খুলবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে এগিয়ে গেল কিশোর। পাওয়ার সুইচ অন করে দিয়ে জয়স্টিক চেপে ধরল। ঠেলে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে এত দ্রুত কাজ করল, চমকে গেল কিশোর। চোখের পলকে মাটিতে নেমে এল ডাইনোবটের মাথাটা। আরেকটু হলে মাটিতে আছাড় মারত মুসাকে। ভয়ের চোটে জয়স্টিক পেছনে টান মারল কিশোর। আবার শূন্যে উঠে গেল মুসা।

'আস্তে! আস্তে! মেরে ফেলবে নাকি আমাকে?' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'খুব ধীরে ধীরে জয়স্টিকটা সামনে ঠেলে দাও,' মুরারি বললেন।

শিখে গেল কিশোর। আস্তে আস্তে ডাইনোবটের মাথাটা নামিয়ে আনতে শুরু করল। চোয়াল খোলার বোতামটা টিপতে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে ফেলল আবার। ছয় ফুট ওপর থেকে মাটিতে খসে পড়ল মুসা।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মুরারি। পাওয়ার অফ করে দিয়ে ঘর থেকে দৌড়ে বেরোল কিশোর।

'বাপরে বাপ!' টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছে মুসা। 'গেছিলাম ডাইনোসরের বিকেলের নাশ্তা হয়ে!' কাপড় থেকে ঘাস আর মাটি ঝেড়ে ফেলতে লাগল সে। ডান পায়ের ওপর পুরোপুরি ভর দিতে গিয়েই আর্তনাদ করে উঠল। 'গেছেরে, ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেছে!'

'সরি,' কিশোর বলল। 'কন্ট্রোলটা নিয়ে আরেকটু প্র্যাকটিস করতে পারলে এ ভাবে ব্যথা দিতাম না।'

'অন্য কারও ওপর করোগে। আমি আর এতে নেই বাবা,' জোরে জোরে দুই হাত নেড়ে বলল মুসা। 'একবারেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে আমার।'

ফিরে তাকাল দুই গোয়েন্দা। ধীরে ধীরে ওদের দিকে হেঁটে আসছেন মুরারি। চেহারাটা এখনও ফ্যাকাসে। স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে পারছেন না। কাছে এসে মুসাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ঠিক আছ?'

'মনে হয়,' জবাব দিল মুসা। 'কি হয়েছিল, বলুন তো?'

আনমনে মাথা নাড়লেন। পায়ের নিচে পড়ে থাকা জট পাকানো তারের দিকে তাকালেন। দুর্ঘটনার আগে তারের যে জোড়াটাকে মুচড়ে শক্ত করেছেন, সেটা তুলে নিলেন। 'আমার ধারণা, ইচ্ছে করে ঢিল করে রাখা হয়েছিল এই জোড়াটাকে।' হাতে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, 'টোপ।'

'আপনি বলতে চাইছেন স্বাভাবিক যান্ত্রিক গোলযোগ ছিল না এটা?' ভুরু কুঁচকাল কিশোর। 'ইচ্ছে করে অঘটনটা ঘটানো হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকালেন মুরারি। 'এ মেশিনগুলোর প্রতিটি নড়াচড়া কম্পিউটারে প্রোগ্রাম করা হয়েছে। শয়তানি করে কেউ রিপ্রোগ্রাম করে রেখে গেছে। যাতে তারের জোড়াটা যে ধরতে যাবে তাকেই আক্রমণ করে বসে।'

'এ ভাবে প্রোগ্রামিং সম্ভব?' মুসার প্রশ্ন।

'নিশ্চয়,' জবাব দিলেন মুরারি। 'মুখ-মাথা-চোয়াল নাড়াতে পারে যখন, কামড়ে ধরানোটা তো সহজেই সম্ভব।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'রিপ্রোগ্রাম করতে সময় লাগার কথা। করল কখন? অ্যাক্সিডেন্ট নয় তো?'

'অ্যাক্সিডেন্ট হতেই পারে না,' মুরারি বললেন। 'আমি নিজের হাতে প্রোগ্রাম করেছি। কাউকে কামড়ে তুলে নেয়ার মত বিপজ্জনক প্রোগ্রাম আমি ভুলেও করব না।' দুই গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে এক ভুরু উঁচু করলেন তিনি। 'তবে কে করেছে অনুমান করতে পারছি।'

'ডিন মারটিন?' একসঙ্গে বলে উঠল মুসা আর রবিন।

মাথা ঝাঁকালেন মুরারি। অন্য দিকে চোখ ফেরালেন। মুখে গভীর চিন্তার ছাপ। বিড়বিড় করে বললেন, 'আমার বদনাম করানোর জন্যে যা খুশি করতে পারে ওই লোকটা।'

'বদনাম আর জখম করানোর মধ্যে বিস্তর ফারাক,' কিশোর বলল।

'তাহলে বোধহয় ফারগুসনকে এটাও বোঝাতে চাইছে, দর্শকদের জন্যে মিউজিয়ামটা বিপজ্জনক।'

মাথার ওপর চোয়াল ফাঁক করে রাখা অ্যাপাটোসরাসটার দিকে তাকাল মুসা। মাথা দুলিয়ে বলল, 'সত্যিই বিপজ্জনক।'

দু'দিকের রাস্তা ধরে দৌড়ে আসতে দেখা গেল রবিন আর হ্যারিস বারনারকে।

'চিৎকার শুনলাম,' কাছে এসে বলল রবিন। 'সব ঠিক আছে তো?'

'তা আছি,' জবাব দিল মুসা।

'খোঁড়াচ্ছ কেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'পড়ে গিয়েছিলাম। বোধহয় গোড়ালি মচকে গেছে।'

'কোনখান থেকে পড়লে?'

'ডাইনোসুরের মুখ থেকে।'

কিছুই বুঝতে না পেরে বোকার মত এর ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল রবিন।

'একটা ডাইনোবটের মিসপ্রোগ্রাম হয়ে গিয়েছিল। আমি খুব কাছে চলে গিয়েছিলাম ওটার...তাতেই অঘটনটা ঘটল।'

কি হয়েছিল খুলে বলল মুসা আর কিশোর।

'আমি না! আমি না!' মুরারিকে তার দিকে তাকাতে দেখে চিৎকার করে উঠল বারনার। 'আমি কিছু করিনি। সত্যি বলছি। এদিকে আসিইনি আমি। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইঙে ডক্টর ফারগুসনকে সাহায্য করছিলাম এতক্ষণ।'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল রবিন। 'আপনাকে তো কেউ দোষ দেয়নি। আপনি মিছেমিছি অস্থির হচ্ছেন কেন?'

'না...আমার যে কোন দোষ নেই, সেটা বলে রাখছি আরকি!' আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে যে দিক থেকে এসেছিল সেদিকে রওনা হয়ে গেল বারনার। বিড়বিড় করে বলল, 'আমার সঙ্গে এমন ভাব করা হচ্ছে যেন সব কিছুর জন্যে আমিই দায়ী।'

মুরারির দিকে ফিরল রবিন। 'সমস্যাটা আসলে কি হয়েছিল?'

দ্বিধা করতে লাগলেন মুরারি। 'ওই যে রিপ্রোগ্রামিং।...উদ্বোধনীর দিনে অ্যাক্সিডেন্ট হলে সর্বনাশ হবে। প্রথম দিনেই এ রকম কিছু ঘটলে মিউজিয়ামে দর্শক আসাই বন্ধ হয়ে যাবে।'

'সেটাই কেউ চাচ্ছে নাকি কে জানে!' ঘড়ি দেখল রবিন। 'ছুটির সময় হয়ে গেছে। কাজ এখানেই শেষ করে দেয়া যাক। মুসা, গাড়ির কাছে হেঁটে যেতে পারবে?'

'তা পারব,' ঘাড় কাত করল মুসা। 'অতটা খারাপ না।'

যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল রবিন।

মুসার কাঁধে চাপড় দিলেন মুরারি। 'অনেক সাহায্য করলে। থ্যাংক ইউ।'

'আপনি ঠিক আছেন তো?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঝাঁকালেন বিজ্ঞানী। 'রাতে একটা ঘুম দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, দেখা হবে কাল।'

রবিনের পেছন পেছন রওনা হলো সে। মুসা আগেই হাঁটতে শুরু করেছে।

রবিনের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'বাড়ি ফিরবে কখন?'

'এই সাড়ে সাতটা নাগাদ।'

'আমাদের বাড়িতে চলে এসো। জরুরী কথা আছে।'

*

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটায় স্যালভিজ ইয়ার্ডে পৌঁছে গেল রবিন।

রান্নাঘরের টেবিলের সামনে পেল কিশোর আর মুসাকে।

'রান্না হতে সামান্য দেরি হবে,' রবিনকে বললেন মেরিচাচী। 'বেশি খিদে

পেলে বিস্কুট খাও।'

পনির আর ক্রীম ক্র্যাকার বিস্কুট নিয়ে লিভিং রুমে চলে এল তিন গোয়েন্দা। রান্নাঘরে বসে মেরিচাচীর সামনে সব কথা আলোচনা করা যাবে না।

'তোমার পায়ের কি অবস্থা?' সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বিস্কুট চিবাতে চিবাতে মুসাকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ভালই,' জবাব দিল মুসা। 'সামান্য ফুলে আছে কেবল। কাল সকাল হতে হতে তা-ও থাকবে না।'

'ভাগ্যিস পা'টা ভাঙেনি। তোমাদেরকে কাজে নিয়ে এখন খারাপই লাগছে আমার। একের পর এক অঘটন...'

'মুরারির তো দৃঢ় বিশ্বাস,' কিশোর বলল, 'কম্পিউটারের প্রোগ্রামের মধ্যে কেউ গোলমাল করে রেখেছিল, যে কারণে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে। তোমার কি মনে হয়?'

মুচকি হাসল রবিন। 'সেই কেউটা মারটিন, এ কথা বলেনি তোমাদের? আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক তৈরি হয়েছে দু'জনের।' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'তবে আমার বিশ্বাস, দুর্ঘটনাই ওটা।'

'মিউজিয়ামটাতে কিন্তু বড় বেশি দুর্ঘটনা ঘটা শুরু হয়েছে,' মুসা বলল।

'জানি,' ভ্রূকুটি করল রবিন। 'ধরা যাক, কাজটা মারটিনই করেছেন। কিন্তু ধরা পড়লে কি ঘটবে, তা কি তিনি জানেন না? ক্যারিয়ারের ওপরই আঘাত আসবে। সে-জন্যেই বলছি, মুরারির ওপর প্রতিশোধ নিতে দু'একটা চালাকি তিনি করে রাখতেও পারেন, কিন্তু এমন কিছু করবেন না যাতে ঝুঁকি অনেক বেশি হয়ে যায়।'

'মুরারি নিজেই যদি চালাকিটা করে রেখে থাকেন মারটিনকে দোষী বানানোর জন্যে?' মুসা বলল।

তার দিকে তাকিয়ে রইল রবিন। 'তাতে তাঁর লাভটা কি?'

'ফারগুসন তখন মারটিনকে বের করে দেবেন। তাতে শান্তিতে কাজ করতে পারবেন মুরারি।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'উঁহু। শুধু মতের অমিল হওয়ার কারণে এতদূর এগোবেন না মনে হয় দু'জনের কেউই।'

'অন্য ভাবে ভেবে দেখা যাক,' রবিন বলল। 'ফারগুসন আমাকে বলেছেন, গবেষণার জন্যে টাকা আর মিউজিয়ামে তাঁদের পজিশনের জন্যে অস্থির হয়ে আছেন দু'জনে। মুরারির বিরুদ্ধে একটা বিজ্ঞান পত্রিকায় ধারাল সমালোচনাও লিখে ফেলেছিলেন মারটিন। লিখেছিলেন, মুরারির কাজকর্ম বিজ্ঞানী সুলভ নয়। তাঁর কাজের ধারাও মারটিনের পছন্দ না। আর নকল ডাইনোসর বানানোর ব্যাপারটাকে তো মোটেও পছন্দ করছেন না মারটিন। তাঁর কাছে এটা খেলনা বানানোর সামিল।'

'অ, তাহলে এই ব্যাপার,' মাথা দুলিয়ে বলল মুসা।

'সমালোচনা পড়ে মুরারিও তারপর থেকে প্রতিশোধ নেয়া শুরু করেছেন মারটিনের ওপর,' রবিন বলল। 'মিউজিয়ামে ফান্ড নিয়ে দু'জনেরই কামড়াকামড়ি চলছে এখন। তবে মুরারি টাকাপয়সা বেশিই পেয়েছেন মারটিনের চেয়ে, ডাইনোবট বানানোর জন্যে।

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। 'পুরোটাই যাতে বাগানো যায়, সে-জন্যে এখন মারটিনকে তাড়ানোর তালে নেই তো?'

মাথা নেড়ে রবিন বলল, 'জানি না। যা বললাম, সবই আমার অনুমান। আসলে যে কি ঘটছে মিউজিয়ামটাতে, বুঝতে পারছি না। থাকি হাজার কাজে ব্যস্ত। গোয়েন্দাগিরি করে যে বের করব, তারও সময় নেই। তোমাদের যেহেতু আমার অবস্থা নয়, তদন্তটা তোমরাই চালিয়ে যাও। দেখো, কদ্দূর কি করতে পারো। তবে এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। এ ভাবে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটা চলতে দেয়া যায় না।'

দরজায় উঁকি দিলেন মেরিচাচী। 'অ্যাই, চলে এসো তোমরা। খাবার রেডি।'

খাওয়ার পর আর দেরি করতে চাইল না রবিন। বাড়ি রওনা হলো। মুসাও যেতে চাইল। গেট পর্যন্ত ওদের এগিয়ে দিল কিশোর।

বিদায় নেয়ার আগে রবিন বলল, 'কাল মিউজিয়ামে যেতে আমার দেরি হবে। মিউজিয়ামের বিল্ডিং পারমিট রিনিউ করাতে যাব। তোমরা তোমাদের মত চলে যেও। মুরারিকে জিজ্ঞেস কোরো, তাঁর আর কোন সাহায্য লাগবে কিনা।'

*

পরদিন সকাল সকালই মিউজিয়ামে হাজির হলো মুসা আর কিশোর। পার্কিং লটে গাড়ি রেখে সোজা রওনা হলো কন্ট্রোল রুমে, মুরারির সঙ্গে দেখা করতে।

'একেবারে সময়মত চলে এসেছ,' ওদের দেখে খুশি হলেন মুরারি। গত দিনের ধকল কাটিয়ে উঠেছেন পুরোপুরি। উত্তেজিত হয়ে আছেন। 'এখন আমি পরীক্ষা করব সব ডাইনোবটের রাজাটাকে। কি করব জানো? ট্রাইসেরাটপসটাকে হাঁটাব আমি।'

'তাই নাকি!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'আমরা কি সাহায্য করতে পারি?'

'ডাইনোসর পার্কের দু'দিকে দু'জন পাহারা থাকা দরকার,' মুরারি বললেন। 'পাহারাও দেবে, ডাইনোবটের ওপরও নজর রাখবে। দেখবে ওটার হাঁটার সময় কোন খুঁত ধরা পড়ে কিনা। কোনদিকে হাঁটালে ভাল হয়, সেটা নিয়ে পরে আলোচনা করব আমরা।'

'আমি গিয়ে ফসিল হলে ঢোকার মুখে দাঁড়াচ্ছি,' কিশোর বলল।

'আমি যাই তাহলে বনের কিনারে। কন্ট্রোল রুমটার কাছাকাছি থাকি,' বলল মুসা।

'ঠিক আছে,' মুরারি বললেন। 'খুব সাবধান থাকতে হবে আজকে

আমাদের। ট্রাইসেরাটপসের বেশি কাছে যেও না। কালকের অ্যাক্সিডেন্টের কথা নিশ্চয় ভুলে যাওনি।' মুচকি হাসলেন তিনি। 'ডাইনোবটের ভেতরে চড়তে সাহায্য করবে আমাকে। ভেতরের ছোট্ট ককপিটে বসে ওটাকে চালাব আমি।'

উত্তেজিত কণ্ঠে বলল মুসা, 'দেখার জন্যে অস্থির হয়ে যাচ্ছি আমি।'

'খুদে একটা ক্যামেরা বসিয়েছি আমি ট্রাইসেরাটপসের এক চোখে,' মুরারি জানালেন। 'ককপিটে আছে ছোট একটা মনিটরের স্ক্রীন। বাইরের অনেকখানি আমি দেখতে পাব। কিন্তু একটা পাশ। দ্বিতীয় চোখটায় ক্যামেরা নেই বলে অন্য পাশটা দেখতে পাব না। তারমানে আমার দেখার ক্ষমতা হয়ে যাবে অর্ধেক। কন্ট্রোল প্যানেল আর জয়স্টিক আছে ককপিটে, সেগুলোর সাহায্যেই চালাব ডাইনোবটটাকে।'

কিশোরের দিকে ঘুরলেন তিনি। 'রেডিও ইন্টারকমের এই হ্যান্ডসেটটা তোমার কাছে রাখো। ডাইনোবটের ককপিটে আমার কাছে হেডফোন থাকবে। এগুলোর সাহায্যে যোগাযোগ রাখতে পারব আমরা।'

ট্রাইসেরাটপসটার দিকে রওনা হলো তিনজনে। ডাইনোবটের পেটের কাছে একটা ছোট দরজা খুললেন মুরারি। মাটি থেকে মাত্র কয়েক ফুট ওপরে হলেও ভেতরে ঢুকতে যথেষ্ট কসরত করতে হলো তাঁকে। ছোট কুঠুরিটাতে উঠতে তাঁকে সাহায্য করল কিশোর আর মুসা।

'গুড লাক,' কিশোর বলল।

দরজাটা লাগিয়ে দিলেন মুরারি। যেখানে পাহারা দেয়ার কথা, সেই জায়গা দুটোর দিকে রওনা হয়ে গেল কিশোর আর মুসা। খড়খড় করে জ্যান্ত হয়ে উঠল কিশোরের রেডিও। মুরারির কথা শোনা গেল। কিন্তু অস্পষ্ট।

'মোটর স্টার্ট দিচ্ছি আমি এখন,' ভেসে এল মুরারির যান্ত্রিক কণ্ঠ।

ডাইনোবটের ভেতর থেকে ভেসে এল চাপা গুমগুম শব্দ।

'জায়গা বড়ই কম এখানে,' মুরারি জানালেন। 'একেবারে ঠাসাঠাসি।...এক পা আগে বাড়ছি আমি।...কিশোর, শুনতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি।'

তাকিয়ে আছে কিশোর। ডাইনোবটের সামনের বিশাল ডান পা'টা উঠে যেতে দেখল। সেটা নেমে এলে ঝটকা দিয়ে উঠে গেল বাঁ পা। পেছনের পা দুটোও সমান তালে এগোনোর চেষ্টা করল। বিচিত্র ভঙ্গিতে দুলে দুলে সামনে এগোল ডাইনোবট।

'কেমন লাগছে বাইরে থেকে দেখতে?' জিজ্ঞেস করলেন মুরারি।

'খুব খারাপ না,' কিশোর জানাল। 'কিন্তু পেছনের পা দুটো সামনের পায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করছে না।'

'এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম আমি। ওগুলোকে ঠিক করতে হবে। ডানে ঘোরাতে যাচ্ছি এখন ডাইনোবটটাকে। দূরে সরে থাকো। এক চোখে দেখার কারণে দেখতে পাচ্ছি না তোমাকে।'

'সরেই আছি।' ডাইনোবটটাকে ঘুরতে দেখে আরও পিছিয়ে গেল কিশোর।

হঠাৎ চোখের কোণে একটা নড়াচড়া দেখতে পেল সে। ফসিল হলের দিক থেকে বেরিয়ে আসছেন ডিন মারটিন। হাতে একগাদা কাগজ। সেগুলোর দিকেই চোখ। অন্য কোনদিকে তাকাচ্ছেন না। এগিয়ে যাচ্ছেন ডাইনোসর পার্কের দিকে। কন্ট্রোল রূমের পেছনের সার্ভিস বিল্ডিঙে যাবার ইচ্ছে বোধহয়।

ট্রাইসেরাটপসটার দিকে ঘুরল কিশোর। চোখ বড় বড় হয়ে গেল। সোজা মারটিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যান্ত্রিক দানবটা। কিংবা বলা যায় ওটার দিকে এগিয়ে চলেছেন মারটিন। এত মনোযোগ দিয়ে পড়তে পড়তে হাঁটছেন, দুনিয়ার আর কোন দিকে খবর নেই।

দুলতে দুলতে এগিয়েই চলেছে ডাইনোবট। মুরারিকে এখন থামাতে বলাও অর্থহীন। অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওটার পায়ের নিচে পড়ে ভর্তা হতে যাচ্ছেন মারটিন।

ছয়

'মিস্টার মারটিন! সরে যান!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

শুনলেন না প্যালিওন্টোলজিস্ট। এমনকি ডাইনোবটের ইঞ্জিনের ভারী শব্দটাও যেন কানে যাচ্ছে না তাঁর। কাগজের দিকে তাকিয়ে থেকে একমনে পড়ছেন আর হাঁটছেন। একেবারে যন্ত্রটার পায়ের কাছে চলে গেলেন। পা তুলল আবার ওটা। নেমে আসছে। মারটিনের মাথার ওপর পড়বে। আর কোন উপায় না দেখে ঝাঁপ দিল কিশোর।

চিৎকার করে উঠলেন মারটিন।

কিন্তু শোনার সময় নেই কিশোরের। মারটিনকে নিয়ে মাটিতে পড়ল। মারটিনের হাতের সমস্ত কাগজপত্র ছড়িয়ে পড়ল। ডাইনোবটের পা'টা পড়ল তার দেহের কয়েক ইঞ্চি দূরে।

মারটিনের ওপর থেকে গড়িয়ে সরে এল কিশোর। মাথা তুলে দেখল, দুলে দুলে সরে যাচ্ছে ডাইনোবটটা। ইঞ্জিনের ভারী গুমগুম শব্দ চলে যাচ্ছে দূরে।

উঠে দাঁড়াল কিশোর। হাত বাড়িয়ে দিল মারটিনের দিকে। বলল, 'উঠুন। কোথাও লেগেছে আপনার?'

যান্ত্রিক ডাইনোসরটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন প্যালিওনটোলজিস্ট। ভয় আর রাগ একসঙ্গে খেলা করছে মুখে। চিৎকার করে উঠলেন, 'ঘটনাটা কি?'

মারটিনকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল কিশোর। 'ডাইনোবটটা পরীক্ষা

করছেন মুরারি।' মাটিতে পড়ে যাওয়া রেডিও সেটটা তুলে নিয়ে বলল, 'মিস্টার মুরারি, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

খড়খড় করে উঠল স্পীকার। 'পাচ্ছি,' ভেসে এল মুরারির যান্ত্রিক কণ্ঠ। 'কেমন লাগছে এখন?'

ভ্রূকুটিতে কুঁচকে থাকা মারটিনের লাল হয়ে ওঠা মুখের দিকে তাকাল কিশোর। 'থামলেই এখন ভাল হয়, মিস্টার মুরারি। আরেকটু হলেই একজনকে মাড়িয়ে ভর্তা করে ফেলতেন।'

'কি?' রেডিওতে শোনা গেল মুরারির চমকে যাওয়া দ্বিধায় ভরা কণ্ঠ। 'দাঁড়াও। এক সেকেন্ড।'

ঝাঁকি দিয়ে থেমে গেল ডাইনোবট। বন্ধ হলো ইঞ্জিন। জ্বলন্ত চোখে সেদিকে তাকিয়ে আছেন কিশোরের পাশে দাঁড়ানো মারটিন। বিড়বিড় করে বললেন, 'এ কি একটা মেশিন হলো নাকি··· নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য!'

পেটের নিচের দরজা খুলে লাফ দিয়ে পড়লেন মুরারি। দৌড়ে এলেন ওদের দিকে।

'এটা কি ধরনের কাণ্ড হলো?' ফেটে পড়লেন মারটিন। 'আরেকটু হলেই তো মেরে ফেলেছিলেন!'

নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল মুরারির। লাফ দিয়ে উঠে এল আবার। 'চলন্ত একটা মেশিনের সামনে আপনিই বা কি করছিলেন? বোকামিটা তো আপনার।'

শুরু হলো তর্কাতর্কি। মুসা এসে দাঁড়াল এ সময়। মুরারির দিকে তাকাল। 'কি ব্যাপার, থামলেন কেন? আমি তো ভাবলাম···'

মারটিনের চিৎকারে কথা শেষ হলো না তার। 'সবাইকে সতর্ক না করে এ রকম একটা বিপজ্জনক পরীক্ষা চালানোর মানেটা কি? নাকি সহজ উপায়ে আমাকে শেষ করে দেয়ার ফন্দি করেছিলেন?'

'দিতে পারলে মন্দ হত না। বাঁচত সবাই,' মুরারি জবাব দিলেন।

এমন লাল হয়ে গেল মারটিনের মুখ, কিশোরের ভয় লাগল বিস্ফোরিত না হয়ে যান। হঠাৎ তার হাত থেকে রেডিওটা কেড়ে নিয়ে মাটিতে আছাড় মারলেন। গর্জে উঠলেন মুরারির দিকে তাকিয়ে, 'খেলা পেয়েছ নাকি?'

'তুমি খেলা পেয়েছ?' মুরারিও কম যান না। 'আমার রেডিওটা যে ভাঙলে, এখন গিয়ে যদি তোমার ওই পচা পচা হাড়গুলোকে আছাড় মারতে থাকি, তখন কেমন লাগবে?' খেপা হয়ে গেলেন যেন তিনি। মাটি থেকে মারটিনের কাগজপত্রগুলো মুঠো মুঠো করে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন চারদিকে।

অসহায় ভঙ্গিতে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। মাথা নাড়তে লাগল কিশোর। কি করবে সে-ও বুঝতে পারছে না।

মুরারির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলেন মারটিন।

'মুরারি! মারটিন! কি, হচ্ছেটা কি?' চাবুকের মত শপাং করে উঠল তীক্ষ্ণ

একটা কণ্ঠ। ফসিল হল থেকে রেগেমেগে বেরিয়ে এলেন ডক্টর ফারগুসন। কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাকাতে লাগলেন একবার মারটিন, একবার মুরারির দিকে। কপালে ভাঁজ পড়েছে প্রচণ্ড ভ্রূকুটিতে। 'কি শুরু করলে তোমরা? পাগল হয়ে গেলে নাকি?'

চোখের আগুন নিভল না মারটিনের। 'গাধার মত ওর খেলনা চালানো শুরু করেছিল মুরারি।' ডাইনোবটটার দিকে আঙুল তাক করে বাতাসে খোঁচা মারলেন তিনি। 'আরেকটু হলেই খুন করে ফেলেছিল আমাকে···ওই হতচ্ছাড়া মেশিনটা দিয়ে। কিশোর না থাকলে এতক্ষণে ভর্তা হয়ে মাটিতে পড়ে থাকতাম।'

লাল মুখটা সামনের দিকে ঠেলে দিলেন মুরারি। 'থাকতেন না যদি রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন। রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে নামলে তো অ্যাক্সিডেন্ট হবেই।'

'ঘটনাটা কি ঘটেছে কেউ আমাকে খুলে বলবে একটু?' ঝগড়াবাজ দুই বিজ্ঞানী অধৈর্য করে তুলল ফারগুসনকে।

'ডাইনোবট পরীক্ষা করছিলেন মিস্টার মুরারি,' কিশোর বলল। 'ওটার সামনে চলে এসেছিলেন মিস্টার মারটিন। হাতে কতগুলো কাগজ। আমি ভাবলাম ইঞ্জিনের শব্দে মুখ তুলে ডাইনোবটটাকে দেখলে সরে যাবেন। কিন্তু কাগজগুলো পড়ায় এত মনোযোগ ছিল তাঁর, মুখই তুললেন না। তখন আমাকেই গিয়ে সরাতে হলো তাঁকে।'

'ডাইনোবটটা গোলমাল করছিল নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন ফারগুসন।

তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লেন মুরারি, 'না না, তা করবে কেন? ভালই চলছিল।'

'হুঁম!' মাথা ঝাঁকালেন ফারগুসন। 'এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। মুরারি, ডাইনোবট পরীক্ষা করার আগে এরপর থেকে সবাইকে সাবধান করে দেবে। আর মারটিন, তুমিও একটু দেখেশুনে পথ চলবে দয়া করে, অন্তত মিউজিয়ামের ভেতরে।' আবার দু'জনে তর্ক শুরু করতে যাচ্ছেন দেখে তাড়াতাড়ি হাত তুলে বাধা দিলেন ফারগুসন। 'আর কোন কথা শুনতে চাই না আমি। এবার যার যার কাজে গেলে কেমন হয়? কি পরিমাণ কাজ জমে আছে আশা করি মনে করানোর প্রয়োজন হবে না।'

নিচু হয়ে মারটিনের কাগজপত্রগুলো কুড়াতে শুরু করলেন তিনি। তাকে সাহায্য করতে এগোল কিশোর আর মুসা। রাগে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করছেন মারটিন। তবে আরেকবার ঝগড়া বাধানোর আগেই তাঁর হাতে কাগজগুলো গুঁজে দিলেন ফারগুসন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন ফসিল হলের দিকে।

'আজকের দিনটা রেস্ট নিলেই পারো, মারটিন,' বললেন তিনি। 'অতিরিক্ত পরিশ্রম যাচ্ছে তোমার।'

'না!' গোঁ-গোঁ করে জবাব দিলেন মারটিন। 'কাজ করতে আমার খারাপ লাগে না। কিন্তু বিজ্ঞানের নামে খেলনা চালাতে দেখলে মেজাজ খিঁচড়ে যায়।'

'বিশ্রাম নিলে মেজাজ খিঁচড়ানো কমে যায়।'

দু'জনে চলে গেলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিশোরের দিকে তাকালেন মুরারি। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আছি।'

মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে বললেন তিনি, 'এ সব ঝগড়া-ঝাঁটি ভাল লাগে না আমার। কিন্তু এতটাই উত্তেজিত করে ফেলে মারটিন…'

'ট্রাইসেরাটপসটার কোন সমস্যা নেই, তাই না?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখান থেকে তো দারুণ দেখা যাচ্ছিল। আস্তে চলছিল বটে, কিন্তু বেশ জ্যান্ত মনে হচ্ছিল।'

'সমস্যা তেমন কিছু দেখলাম না,' মুরারি বললেন। 'কিন্তু আমি সেটা নিয়ে ভাবছি না। আমি ভয় পাচ্ছি, না দেখে মারটিন যদি পায়ের নিচে চলে আসে, দর্শকরাও আসতে পারে। যদি কেউ রাস্তা দিয়ে না হেঁটে কোনাকোনি যেতে চায়। বেড়া ওদের আটকাতে পারবে না।'

'পাহারা বসাতে হবে,' কিশোর বলল।

'হলে ভালই হত।' নাক কুঁচকালেন মুরারি, 'কিন্তু ফারগুসন রাজি হতে চাইবেন না। নতুন করে লোক নেয়ার টাকা নেই ফান্ডে। একটা কাজ অবশ্য করা যায়। মিউজিয়ামের দু'জন গার্ডকে দিয়ে কাজ চালানো যেতে পারে।' এক মুহূর্ত ভাবলেন তিনি। 'দেখি, ফারগুসনকে দিয়ে ওদের বলানো যায় কিনা। পাহারা থাকলে নিশ্চিন্তে ডাইনোবট শো'টা দেখানো যাবে।'

ফসিল হলের দিকে রওনা হলেন তিনি। কয়েক পা গিয়ে ফিরে তাকালেন। 'সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ।'

দ্রুতপায়ে মুরারিও বেরিয়ে গেলেন পার্ক থেকে।

মাটি থেকে ভাঙা রেডিওটা তুলে নিল মুসা। 'এমনিতে শান্ত হলেও মারটিনের মেজাজ খুব কড়া। আচ্ছা, ডাইনোসরের ভেতর থেকে তাঁকে দেখেননি তো মুরারি?'

'মনে হয় না,' কিশোর বলল। 'যে অ্যাঙ্গেলে মোড়টা নিল, তাতে ডাইনোবটের চোখের ক্যামেরাটা আরেক দিকে সরে গিয়েছিল। পুরো ঘটনাটাই কাকতালীয়। না দেখেই ওটার পায়ের কাছে চলে গিয়েছিলেন মারটিন।'

'নাকি দেখে ইচ্ছে করে চলে গিয়েছিলেন ডাইনোবটের পায়ের কাছে। ওগুলো যে বিপজ্জনক, সেটা প্রমাণ করে দেয়ার জন্যে।'

'হতে পারে। কিন্তু আমি তো খুব কাছে থেকে দেখেছি তাঁকে। মাটিতে পড়ার পর ট্রাইসেরাটপসটাকে গায়ের কাছ দিয়ে চলে যেতে দেখে যে ভাবে চমকে গেলেন, সেটা অভিনয় হতে পারে না।' চিন্তিত ভঙ্গিতে ফসিল ল্যাবের দিকে তাকাল কিশোর। 'তবে মুরারির ডাইনোবটগুলোকে নষ্ট হয়ে যেতে দেখলে সবচেয়ে খুশি হবেন মারটিন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যা-ই হোক, মারটিন আর এই মিউজিয়ামটা সম্পর্কে আরও খোঁজ-খবর নেয়ার সময় এসেছে। বিকেলটা মনে হয় আজকে রেস্ট নেবেন তিনি। এই সুযোগে

গোপনে ফসিল ল্যাবটাতে ঢুঁ মেরে আসতে পারি আমরা।'

'অ্যাক্সিডেন্টগুলোর ব্যাপারে তাঁকে সন্দেহ করছ নাকি?' মুসার প্রশ্ন।

'এখনও করছি না,' কিশোর বলল। 'কিন্তু আসলে কি কাজে জড়িত তিনি, এটা জানতে তো দোষ নেই।'

'হুঁ। চলো।'

ডাইনোসর পার্কের ওপর দিয়ে ফসিল হলে ফিরে এল ওরা। মারটিনের ল্যাবরেটরির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। পকেট থেকে একটা রিঙ বের করল কিশোর। তাতে রয়েছে ছোট একটা ছুরি আর দু'চারটা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। সেগুলোর সাহায্যে তালা খোলা সম্ভব। কিন্তু তার আর দরকার হলো না। মুসা নবটা ধরে মোচড় দিতেই খুলে গেল ধূসর ধাতব দরজাটা। 'এত তাড়াহুড়া করে চলে গেছেন মারটিন, দরজা লাগাতেও ভুলে গেছেন।'

'কিন্তু তাই বলে কম্পিউটারটা বন্ধ করতেও ভুলে গেলেন নাকি?' কিশোর বলল। ঢুকে পড়ল ভেতরে। দরজাটা লাগিয়ে দিল। অগোছাল জিনিসপত্রে বোঝাই একটা ডেস্কের ওপর রাখা কম্পিউটারটা। ডেস্কের সামনে একটা বহু ব্যবহৃত গদিওয়ালা চেয়ার। ছোট অফিসটার দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে অনেকগুলো বইয়ের তাক। জায়গার অভাবে এক কোণে ঠেসে ভরা হয়েছে একটা ধাতব ফাইলিং কেবিনেট।

ডেস্কটার দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। বিজ্ঞান আর কম্পিউটার বিষয়ক গাদা গাদা পত্রপত্রিকা পড়ে আছে টেবিলে। কম্পিউটারটার পাশে রাখা ফ্লপি ডিস্কেটের স্তূপ। সেগুলো ঘাঁটতে শুরু করল সে। প্রতিটি ডিস্কেটেই সুন্দর করে লেবেল লাগানো, একটা বাদে। সেটা তুলে নিল সে।

'মনে হচ্ছে মিস্টার মারটিন কম্পিউটারের লেটেস্ট টেকনোলজিতে আগ্রহী,' কিশোর বলল। 'তারমানে কম্পিউটার ভালমতই ব্যবহার করতে পারেন। তাঁর পক্ষে ডাইনোবটের প্রোগ্রাম বদলে দেয়া মোটেও কঠিন নয়। ভারটিউয়াল রীয়ালিটি প্রোগ্রামে স্যাবটাজ করে রাখাও সম্ভব। দেখা যাক, কি নিয়ে এখন কাজ করছেন তিনি।'

ডেস্কের সামনের চেয়ারে বসে পড়ল সে। কীবোর্ডে খটাখট পড়তে শুরু করল তার আঙুলগুলো। মনিটরের পর্দায় ওঠা-নামা করতে লাগল ডকুমেন্ট। খানিকক্ষণ গভীর মনোযোগে দেখার পর মাথা ঝাঁকাল। 'কে-টি বাউন্ডারির ওপর লেখা। এ সম্পর্কে পড়েছি আমি। ক্রিটেশাস আর টারটিয়ারি যুগের মাঝখানের সময় এটা। সাড়ে ছয় কোটি বছর আগের পৃথিবী।'

'তারমানে যে সময়টায় পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ডাইনোসরেরা,' মুসা বলল।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'অনেক বিজ্ঞানীই বিশ্বাস করেন ওই সময় কোন ধূমকেতু কিংবা বিশাল উল্কা আঘাত হানে পৃথিবীতে। তাতে একের পর এক এমন সব ঘটনা ঘটতে থাকে, যার ফলে ধ্বংস হয়ে যেতে থাকে ডাইনোসরেরা। কারও কারও বিশ্বাস, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পুরু ধোঁয়ার আস্তরণে

এমন করে ঢেকে গিয়ে ঘিরে রাখে পৃথিবীকে, মাসের পর মাস সূর্যের আলো ঢুকতে দেয়নি।'

কিশোর থামতেই মুসা বলল, 'তাতে মারা পড়ে সমস্ত উদ্ভিদ, ডাইনোসরদের যা প্রধান খাদ্য ছিল। খাবার না পেয়ে ডাইনোসররাও সব মরে মরে শেষ হয়ে যায়।'

স্ক্রীনের লেখাগুলো পড়তে পড়তে কিশোর বলল, 'এই দুটো থিওরির একটাও মানতে রাজি নন মারটিন। দুটোকেই চ্যালেঞ্জ করেছেন তিনি। তাঁর মতে পৃথিবী থেকে ডাইনোসরেরা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে কম করে হলেও লাখখানেক বছর লেগেছে। এত দীর্ঘ একটা সময়কে কোনমতেই "হঠাৎ" বলতে রাজি নন তিনি। বলছেন, ধীরে ধীরে মরেছে। এবং আমার ধারণা, মুরারি বলছিলেন এর উল্টোটা। আর এই নিয়েই ঝগড়াটা শুরু হয়েছে দুই বিজ্ঞানীর। এখন দেখা যাক, লেবেল ছাড়া এই ডিস্কটাতে কি রয়েছে।'

ডিস্কটা ড্রাইভে ঢোকাল কিশোর। খোলার চেষ্টা করতে গিয়ে বলল, 'সাঙ্কেতিক ভাষা। তারমানে এটাতে যা-ই আছে, সেটা গোপন রাখতে চান মারটিন। ব্যক্তিগত কোন কথা, কিংবা জমা-খরচের হিসাবও হতে পারে।'

আরও খানিক টিপাটিপি করে ডিস্কটা বের করে আগের জায়গায় রেখে দিল সে। নতুন আর কিছু খুঁজে না পেয়ে যে ভাবে অন করা ছিল কম্পিউটারটা সে-ভাবেই রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। ঘরের চারপাশে তাকাল। 'এ ঘরে আর দেখার তেমন কিছু নেই। ঘরের জিনিসপত্রের অবস্থা দেখে বোঝা যায় সত্যি প্রচুর পরিশ্রম করেন মারটিন।' দরজার দিকে রওনা হলো সে। 'চলো, বেরিয়ে যাই। ফসিল হল দিয়ে বেরোব। কেউ দেখলে যাতে ভাবে, ওখানেই এতক্ষণ ছিলাম আমরা। এখানে ঢোকার ব্যাপারটা বুঝতে না পারে।'

ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে শূন্য মেইন হলে এসে ঢুকল ওরা। শ্রমিকদের বেশির ভাগই বাড়ি চলে গেছে। ঘরের মাঝখানে কালের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রাগৈতিহাসিক কালের কঙ্কালগুলো। ওগুলোর চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কিশোর।

'কি হলো?' মুসার প্রশ্ন।

চারপাশে তাকাতে লাগল কিশোর। চিন্তার ভাঁজ পড়েছে কপালে। 'কোথায় যেন কি একটা গোলমাল হয়েছে। কোন একটা জিনিস নেই। সেটা কি?'

মুসাও চারপাশে তাকানো শুরু করল। 'কি নেই? ফসিল-টসিল কিছু?'

'বুঝতে পারছি না,' বিড়বিড় করে বলে, হাঁটতে হাঁটতে হলের একধারে চলে গেল কিশোর।

পাশে এসে দাঁড়াল মুসা। 'কই, ঘরটাকে তো আগের মতই লাগছে আমার কাছে। কোন পরিবর্তন তো দেখছি না।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'না, এক রকম নেই। এখানে দুটো বাক্স ছিল না? বাক্সে ভরা ছোট ফসিলটা কই? এই হলের একমাত্র ফসিল, যেটা ডিসপ্লে

কেসে ভরে রাখা হয়েছিল।'

'ঠিক! ঠিক বলেছ,' চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল মুসা। 'এখানেই কোথাও রাখা ছিল বাক্সটা।'

'আরকেইওপটেরিক্সের ফসিল,' তুড়ি বাজাল কিশোর।

কয়েক ফুট দূরে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মুসা। 'দেখো, মেঝেতে হালকা দাগ হয়ে আছে। ধুলার মধ্যে চারকোনা দাগ, বাক্স ছিল এখানটায়।'

'জানি,' আবার চারপাশে তাকাতে লাগল কিশোর। 'এখান থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।'

সারা ঘরে তন্নতন্ন করে খুঁজল দু'জনে মিলে। দেয়াল ঘেঁষে রাখা বাক্সগুলোতে দেখল। ঘরের মাঝখানে রাখা বড় একটা কাঁচের বাক্সের ভেতরেও উঁকি দিল।

'নেই এখানে,' অবশেষে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল মুসা।

'কোথায় গেল তাহলে?' কিশোরের প্রশ্ন। 'ফসিল ল্যাবেও তো দেখলাম না।'

ফসিল ল্যাবে ঢোকার দরজার পাশে ছোট আরেকটা দরজা দেখে সেটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে।

'দেয়াল আলমারি না তো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

টান দিয়ে দরজাটা খুলল মুসা। ভেতরে উঁকি দিল দু'জনে।

ছোট একটা ঘর। ছাতে লাগানো কম পাওয়ারের একটা বাতিতে ঘরের অন্ধকার কাটছে না। ঘরটাকে স্টোররুম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আপাতত একটামাত্র জিনিস ছাড়া আর কিছুই নেই ঘরে।

'খাইছে!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'সেই বাক্সটা! কিন্তু খালি কেন?'

সাত

অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল ওরা।

'মরা পাখির কঙ্কাল তো আর উড়ে যেতে পারে না। ভূত হয়ে গেলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু এত কোটি বছর পর ওটার ভূত হওয়ার শখ হলো কেন?' মুসা বলল। 'চুরি গেল নাকি?'

'কি করে বলি!' বিড়বিড় করে জবাব দিল কিশোর। ঝুঁকে বাক্সের কিনারগুলো পরীক্ষা করতে লাগল।

মুসাও ঢুকল ঘরটাতে। সে-ও দেখতে লাগল বাক্সটা। ওপরের দিকটা ঢালু করে বানানো। দেখেটেখে বলল, 'ডালাটা কজার ওপরে খোলে। তালাটালা কিছু নেই।'

সোজা হলো কিশোর। বাক্সের ভেতরে খুঁজে দেখল। 'এই যে, দুটো

ক্লিপ। বেজ-এর সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছিল ফসিলটা। স্ক্রু খুলে তুলে নেয়া হয়েছে।'

'ফসিলটা হয়তো বাড়ি নিয়ে গেছেন মারটিন,' মুসা বলল।

'তা কেন নেবেন?'

'জানি না। হয়তো স্টাডি করার জন্যে।'

'সেই কাজের জন্যেই তো মিউজিয়ামে ল্যাবরেটরি বানানো হয়েছে। স্টাডির কাজটা কি এখানকার চেয়ে বাড়িতে ভাল হবে?' কিশোর বলল। 'তা ছাড়া নিলেন কখন? আজ সকালেও এটা এখানে ছিল, কোন সন্দেহ নেই আমার তাতে। কিছুক্ষণ আগেও আমাদের সঙ্গে ছিলেন মারটিন। নিতে হলে ডাইনোসর পার্ক থেকে আসার পর নিতে হয়েছে। মাত্র কয়েক মিনিট আগে।'

'তাহলে চুরি গেছে, এ কথা বলা ছাড়া আর কিছু বলার নেই,' মুসা বলল।

'বুঝতে পারছি না,' লম্বা কোঁকড়া কালো চুলে আঙুল চালাল কিশোর। 'এখানে মারটিনই একমাত্র বিজ্ঞানী নন। কঙ্কালটার ওপর আরও অনেকের আগ্রহ থাকতে পারে। হয়তো এখান থেকে তাঁদেরই কেউ সরিয়েছেন কোন কারণে।' ছোট ঘরটা থেকে বেরিয়ে এসে ফসিল হলের চারপাশে চোখ বোলাল সে। 'আরও কোন জিনিস সরানো হয়নি তো এখান থেকে?'

'খুঁজে দেখা যাক,' মুসা বলল।

আরেকবার ঘরটাতে তন্নতন্ন করে খুঁজল দু'জনে মিলে। কোথায় কোন জিনিসটা রাখা ছিল মনে করার চেষ্টা করল। দেখল, আরও কোন খালি জায়গা পাওয়া যায় কিনা যেখান থেকে বাক্স বা কোন জিনিস সরানো হয়েছে। কিন্তু আর কোনখানে সরানোর চিহ্ন দেখা গেল না। বাকি সব ঠিকঠাকই আছে মনে হলো।

'ওই একটা জিনিসই গেছে,' অবশেষে বলল কিশোর। 'কিন্তু কেন?'

'এই হারানো ফসিলের সঙ্গে দুর্ঘটনাগুলোর কোন সম্পর্ক নেই তো?' কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'হয়তো মুরারি ওটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন মারটিনকে খেপানোর জন্যে।'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল কিশোর। ঘন ঘন চিমটি কাটতে লাগল নিচের ঠোঁটে। বিড়বিড় করে বলল, 'ডিসপ্লে কেসটাই বা কেন সরানো হলো?' হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ। 'আঙুলের ছাপ খোঁজা দরকার। পাওয়া গেলে চোরটাকে সনাক্ত করা যাবে।'

'ভাল বুদ্ধি,' একমত হলো মুসা।

'এক দৌড়ে গিয়ে গাড়ি থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট কিটটা নিয়ে আসি আমি,' কিশোর বলল। 'তুমি রবিনকে ডেকে এনে শূন্য কেসটা দেখাও।'

দু'জন দু'দিকে রওনা হয়ে গেল ওরা। গেট পেরিয়ে পার্কিং লটের দিকে গেল কিশোর। মুসা গেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইঙে।

অফিসে ঢুকে হলওয়ে ধরে রবিনের খোঁজে ছুটল মুসা। হঠাৎ ঝটকা দিয়ে

খুলে গেল ডক্টর ফারগুসনের অফিসের দরজা। বেরিয়ে এলেন ডিরেক্টর। অন্যমনস্ক। না দেখে আরেকটু হলে মুসার গায়ের ওপরই পড়তেন।

চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'অ, তুমি। কিছু লাগবে নাকি?'

'রবিনকে খুঁজছি,' মুসা বলল।

'ও তো এখনও শহর থেকে ফেরেনি। অফিসের কাজ শেষ হয়নি বোধহয়। জরুরী দরকার নাকি?'

'জরুরী কিনা বুঝতে পারছি না। মারটিনের এক্সিবিট থেকে একটা ফসিল খোয়া গেছে,' মুসা বলল।

মুহূর্তে কুঁচকে গেল ফারগুসনের ভুরু। 'খোয়া গেছে? কোনটা?'

'আরকেইওপটেরিক্স।'

'আরকেইওপটেরিক্স! তুমি শিওর?'

'হ্যাঁ। আমি...'

'দাঁড়াও দাঁড়াও,' জোরে জোরে কপালে ডলা দিলেন ফারগুসন। 'মনে পড়েছে। মারটিন বলছিল ওটা কোন এক মিউজিয়ামে পাঠাবে। ফসিলটার নকল তৈরি করে রাখার খুব নাকি শখ ওদের। ভেবো না। উদ্বোধনীর আগেই ফেরত চলে আসবে।' আনমনে বিড়বিড় করলেন তিনি, 'এত কাজের চাপ, কোন কথা মনে রাখাই মুশকিল।'

'কিন্তু যদ্দূর মনে পড়ে, আজ সকালের পরেও ফসিলটা দেখেছি,' ভুরু কুঁচকে বলল মুসা। 'নেই যে, মাত্র কয়েক মিনিট আগে দেখলাম।'

ফারগুসন বললেন, 'হয়তো বিকেল বেলা নিয়েছে।' মুসার দিকে তাকিয়ে হাসলেন আবার তিনি। 'মূল্যবান ফসিল এ রকম হরহামেশাই চালাচালি করে মিউজিয়ামগুলো। নকল তৈরি করে রেখে দেয়। কখনও বা নিজেদের মধ্যে জিনিস বদলাবদলি করে, কখনও বিক্রি করে দেয়। যাক, তোমার দুশ্চিন্তা দেখে ভাল লাগল। বোঝা যাচ্ছে, কাজে আন্তরিকতা আছে তোমাদের।'

আর কিছু বলার নেই। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই থেমে গেল আবার মুসা। 'আমি মনে করেছিলাম...'

শব্দ করে হাসলেন ফারগুসন। 'মুরারি সরিয়েছে? মারটিনকে খেপানোর জন্যে?'

'না, চুরি গেছে।'

'যায়নি। শিওর থাকো।...তবে মুরারি মারটিনকে খেপানোর জন্যে অনেক কিছুই করতে পারে। মারটিনও দুধে ধোয়া না...ওরা যা করছে...কি বলব...কামড়াকামড়ি...' নাক কুঁচকালেন ফারগুসন। 'তবে দু'জনেই খুব বড় বিজ্ঞানী, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'তারমানে ওঁদের ঝগড়াঝাঁটি, তর্কাতর্কি...আর দুর্ঘটনাগুলো নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না আপনি?' অবাক হলো মুসা।

'দুশ্চিন্তা হচ্ছে না তা না। তবে উত্তেজনা আর কাজের চাপে এ রকম দু'চারটা অঘটন ঘটতেই পারে।'

মাথা দোলাল মুসা, 'তা ঠিক।'

'দুশ্চিন্তাগুলো আমার জন্যে রেখে দিয়ে তোমাদের কাজ তোমরা করে যাও,' ফারগুসন বললেন। 'একটা কথা না বলে পারছি না, তোমাদের কাজে আমি সত্যিই খুশি।'

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইং থেকে ফসিল হলে ফিরে এল আবার মুসা। কাজে ব্যস্ত দেখল কিশোরকে। সাবধানে ঝাড়ছে কাঁচের বাক্সটা।

'ঝাড়াটা বন্ধ করো। লাগবে না আর,' দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মুসা বলল। 'ডক্টর ফারগুসনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তিনি বললেন, ফসিলটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে নকল তৈরি করার জন্যে।'

'নকল? মানে কপি?' ঝাড়া থামিয়ে দিল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'অন্য একটা মিউজিয়ামে।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'তারমানে খামাখাই কষ্ট করতে যাচ্ছিলাম। ভালই হলো। কষ্ট করেও লাভ হত না। অন্তত ডজনখানেক মানুষের আঙুলের ছাপ রয়েছে বাক্সের গায়ে।'

'শ্রমিকরা টানাহেঁচড়া করেছে, থাকবেই তো।'

যন্ত্রপাতিগুলো আবার ব্যাগে ভরে ফেলে মুখ তুলল কিশোর। 'চলো, দেখি মুরারি কি করছেন।'

বেরিয়ে এসে ছোট ঘরটার দরজা লাগিয়ে দিল কিশোর। তারপর ডাইনোসর পার্কে রওনা হলো দু'জনে।

অন্ধকার হয়ে আসছে আকাশ। নিথর হয়ে থাকতে দেখা গেল ডাইনোবটগুলোকে। যেন আশপাশের পটভূমির সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কন্ট্রোল রূমে উঁকি দিয়ে দেখে এল ওরা। মুরারিকে পেল না।

'ল্যাবরেটরিতে আছেন নাকি?' মুসা বলল।

কিন্তু ল্যাবরেটরির দরজা বন্ধ। তালা দেয়া। ওদের ডাকের সাড়া এল না ভেতর থেকে।

'নিশ্চয় বাড়ি চলে গেছেন, রেস্ট নিতে,' কিশোর বলল। 'মুখে যা-ই বলুন না কেন, স্নায়ুতে তো চাপ পড়েছেই—একজন মানুষকে মেরে ফেলছিলেন আরেকটু হলেই।'

'আমরাই বা আর থেকে কি করব?' মুসা বলল। 'চলো, আমরাও যাই। খিদেয় মোচড় দিচ্ছে পেট।'

আট

পরদিন মুসার কাজ থাকায় কিছুটা দেরি করেই মিউজিয়ামে পৌঁছল দু'জনে।

এবং যথারীতি এদিনও অঘটন ঘটা বন্ধ থাকল না।

প্রথমেই আবিষ্কার করলেন মারটিন, ফসিল হলের একটা ছোট জাতের প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর কঙ্কাল থেকে মাথাটা খুলে নিয়ে গিয়ে তার জায়গায় একটা বড় জানোয়ারের মাথা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। উদ্ভট, হাস্যকর লাগছে জানোয়ারটাকে। স্বভাবতই ভীষণ রেগে গেলেন মারটিন।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল বিকেল বেলা। বাইসনের মূর্তিটা সরাতে গিয়ে। ঠেলা নিয়ে এল হ্যারিস বারনার। তাতে তুলে সরাতে গিয়ে ঘটল বিপত্তি। একটা চাকা খুলে পড়ে গেল। বহু কষ্টে বাক্সটা ধরে ফেলে মূর্তিটা বাঁচাল তিন গোয়েন্দা। কিন্তু পুরোপুরি রক্ষা করা গেল না। মূর্তিটার এক কোণের চলটা উঠে গেল। খবরটা ডক্টর ফারগুসনের কানে গেল। দেখেটেখে তিনি বললেন ওঅর্কশপে নিতে হবে মেরামতের জন্যে।

বারনারের ওপর সন্দেহটা আরও জোরদার হলো কিশোরের। নজর রাখার সিদ্ধান্ত নিল। রবিন ব্যস্ত মিউজিয়ামের কাজে। সাহায্যের জন্যে তাকে পাওয়া গেল না। সুতরাং সে আর মুসাই নজর রাখবে ঠিক করল।

রাতের খাবার খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়ল দু'জনে। কিশোরকে মিউজিয়ামের কাছে নামিয়ে দিল মুসা। গেটের একটু দূরে গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

অবশেষে বেরিয়ে এল বারনারের পুরানো পিকআপ গাড়িটা। পিছু নিল মুসা।

প্রথম ট্র্যাফিক পোস্টটা পেরিয়ে এসে গাড়ির মুখ ঘোরাল বারনার। উপকূলের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। তারপর আবার মুখ ঘুরিয়ে একটা মোটামুটি অভিজাত এলাকার ভেতর দিয়ে এগোল।

এ রকম জায়গায় বাস করে! অবাক লাগল মুসার। একটা অখ্যাত মিউজিয়ামের সাধারণ কাস্টোডিয়ানকে কত টাকা বেতন দেয় যে এমন দামী এলাকায় থাকতে পারে?

অবশেষে সৈকতের দিকে মুখ করা বড় একটা বাড়ির সামনে থামল বারনার। ব্লকখানেক দূরে গাড়ি থামিয়ে নজর রাখল মুসা। দোতলা আধুনিক ডিজাইনের সাদা বাড়ি। রাস্তার দিকটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। গেট খুলে গেল। গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকল বারনার।

গাড়ি থেকে নেমে সাবধানে বাড়িটার দিকে এগোল মুসা। গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। গেটটা এখন বন্ধ। গেটের একপাশে ব্রোঞ্জের নেমপ্লেটে নাম লেখা রয়েছে: ডেভন মেডিন।

দেয়ালের ওপরটা ধরে নিজেকে টেনে তুলল মুসা। মুখ উঁচু করে তাকাল। দোতলার একটা জানালার পর্দা সরানো দেখল। জানালায় দেখা গেল একটা বিশালদেহী মানুষের মুখ। মনে হলো এদিকেই তাকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি মাথা নামিয়ে ফেলল মুসা। হাত সরিয়ে আনল দেয়াল থেকে।

কোন দিক দিয়ে গেলে ভেতরে ঢোকা যাবে কিংবা বাড়ির ওপর নজর

রাখা যাবে ভাবতে লাগল সে। ঘুরে সৈকতের দিক দিয়ে গিয়ে দেখা যেতে পারে। সেটাই করল সে। রাস্তার পাশ থেকে ঢেউ খেলানো ছোট ছোট বালির ঢিবি চলে গেছে সমতল সৈকতের কাছে। ঢিবিগুলো ডিঙিয়ে এগিয়ে চলল সে। নিজেকে আড়াল করার মত বড় নয় ওগুলো। তবে বাড়িটা থেকে দূরে রয়েছে বলে কারও চোখে পড়বে না, আশা করল মুসা।

পানির কিনারে পৌঁছে ফিরে তাকাল সে। বাড়ির বাইরে দু'জন মানুষকে দেখা গেল। দূর থেকেও বারনারের মাথার স্লাউচ হ্যাটটা চিনতে পারল মুসা। তার সঙ্গের লোকটা হাত তুলে সাগরের দিকে দেখাচ্ছে। একজোড়া শক্তিশালী দূরবীনের জন্যে আফসোস হতে লাগল মুসার। একজন ছোটখাট মহিলাকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল বাড়ির ভেতর থেকে। আঙিনার অল্প আলোতেও মহিলার লম্বা চুলের লাল রঙ চেনা গেল।

কয়েক মিনিট কথা বলে বাড়ির ভেতর চলে গেল ওরা।

দ্রুত গাড়ির কাছে ফিরে চলল মুসা। ফেরার পথে ওর গাড়িটা দেখলে চিনে ফেলতে পারে বারনার।

গাড়ির কাছে পৌঁছে গেল মুসা। বারনার তখনও বেরোয়নি। নিরাপদেই ফিরে এল মিউজিয়ামে। পার্কিং লটের কাছে না গিয়ে, ঘুরে এসে বনের ধারে গাড়ি রাখল। পায়ে চলা পথ ধরে এগিয়ে চলল ডাইনোসর পার্কের ভেতর দিয়ে। চাঁদের আলোয় অদ্ভুত লাগছে মডেলগুলো। জীবন্ত মনে হচ্ছে। আদিম প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর কথা কল্পনা করে গায়ে কাঁটা দিল ওর।

ডাইনোসর পার্কে কিশোরকে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ উইঙের পেছনে।

কিছু ঘটেছে কিনা, জানতে চাইল মুসা।

কিশোর জানাল, 'একটা গাড়ি বেরিয়ে যেতে দেখলাম। বনের মধ্যে পার্ক করা ছিল।'

'চিনতে পেরেছ?'

'না।'

'ড্রাইভারকে দেখেছ?'

'না। তোমার কথা বলো। কি জেনে এলে?'

নয়

পরদিন ঘটল আরেক অঘটন। আগেরগুলোর চেয়ে এটা মিউজিয়ামের জন্যে অনেক বেশি ক্ষতির কারণ হলো।

চলটা ওঠা বাইসনের মূর্তিটা ওঅর্কশপে পৌঁছে দিয়েছে তিন গোয়েন্দা। মুসা আর কিশোরকে ওখানে রেখে রবিন চলে গেল তার কাছে। একটা ট্রাক

ঢুকল মিউজিয়ামে। সেটা থেকে নেমে এল ডিক কারসন। ট্রাক বোঝাই করে টালি নিয়ে এসেছে। কিশোর আর মুসাকে দেখে সেগুলো নামাতে সাহায্য করার অনুরোধ করল।

টালি নামাতে নামাতে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল কারসন। ডাইনোসর পার্ক থেকে বেরিয়ে পড়েছে ট্রাইসেরাটপসের মডেলটা। কাঁটাতারের বেড়া ওটাকে ঠেকাতে পারেনি। এগিয়ে আসছে এদিকেই। থামার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

মুরারি কি পাগল হয়ে গেলেন? অবাক হয়ে ভাবতে লাগল তিনজনেই।

আরও কাছে আসার পর বোঝা গেল, ককপিটে কেউ নেই। ডাইনোবটের পেটের নিচের ছোট দরজাটা খুলে রয়েছে।

কি করা যায় কেউ সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই কাঠের তৈরি ওঅর্কশপের এক পাশে গুঁতো মেরে বসল ডাইনোবট। বাড়িটা ধসিয়ে দিয়ে, সব কিছু মাড়িয়ে, ভেঙেচুরে এগিয়ে চলল।

আর কোন উপায় না দেখে মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে বসল মুসা। ওটার পেটের নিচে দিয়ে গিয়ে বহু কায়দা-কসরত করে উঠে পড়ল ককপিটে। থামানোর চেষ্টা করতে লাগল।

দৃঢ় পদক্ষেপে একটা পুকুরের দিকে এগিয়ে চলেছে ডাইনোবট। পানিতে নামলে শর্ট-সার্কিট হবে। আগুন জ্বলা শুরু হবে জানা কথা। মুসা যে মারা পড়বে কোন সন্দেহ নেই আর তাতে।

বহু চেষ্টার পর অবশেষে ডাইনোবটের মুখ পুকুরের দিক থেকে ঘোরাতে পারল মুসা। নিরাপদ জায়গায় এনে থামাল ওটাকে। ককপিট থেকে ঝুপ করে নিচে লাফিয়ে পড়ল।

ঘামে ভিজে গেছে সারা শরীর। মাটিতে চিত হয়ে হাঁপাতে লাগল সে।

তার কাছে এসে বসল কিশোর। 'আমি তো ভাবলাম, গেছ আজ তুমি। এ ধরনের একটা চালু মেশিন পানিতে পড়লে শর্ট-সার্কিটের কারণেই মারা যেতে।'

'হ্যাঁ, যেতাম! মা-বাবার দোয়া ছিল, তাই বেঁচেছি!'

খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। দেখতে চলল মিউজিয়ামের কতখানি ধ্বংস করেছে ডাইনোবটটা। পার্কের বেশ কিছু গাছ মাটিতে শুইয়েছে। কাঁটাতারের বেড়ার অনেকখানিই ছেঁড়া এখন, ঝুলছে। ওঅর্কশপটাকে দেখে মনে হচ্ছে, হারিক্যান বয়ে গেছে ওটার ওপর দিয়ে। অবশিষ্ট রয়েছে মাত্র একটা দেয়াল। কোনমতে খাড়া হয়ে আছে।

'পুরো বাড়িটাই ধসিয়ে দিয়েছে,' মুসা বলল।

'ভেতরে রাখা বাইসনের মূর্তিটা সহ,' ধসে পড়া বাড়িটার দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে বলল কিশোর।

বনের দিকে রওনা হলো দু'জনে।

কন্ট্রোল রুমের কাছে এসে মার্টিন ও মুরারিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল

ওরা। কাছেই সেই ট্রাকটা, যেটাতে করে টালি আনা হয়েছে। দুই বিজ্ঞানীর চেহারাতেই আতঙ্ক। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন ধ্বংস হয়ে যাওয়া জিনিসপত্রগুলোর দিকে। ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে বেঁচে যাওয়া আস্ত টালিগুলো বের করে আনছে এডমন্ড আর ব্রিক নামে দু'জন শ্রমিক।

ছুটতে ছুটতে কিশোর আর মুসার কাছে এসে দাঁড়াল রবিন। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'বারনার সাংঘাতিক জখম হয়েছে। ডাইনোবটের লাথি লেগেছে নাকি কে জানে!' হুড়মুড় করে কথাগুলো উগরে দিয়েই ঘুরে পার্কের দিকে দৌড় দিল আবার সে। পেছনে ছুটল মুসা আর কিশোর। ডাইনোসরগুলোর কাছে এসে দেখল, মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছে বারনার। মাথার একপাশে গভীর একটা কাটা ক্ষত।

'তোমরা ওর কাছে বসো। দেখো হুঁশ ফেরাতে পারো কিনা,' রবিন বলল। 'আমি ফার্স্ট এইড কিট নিয়ে আসি।' বলেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইঙের দিকে ছুটল সে।

কাস্টোডিয়ানের ওপর ঝুঁকে বসল দুই গোয়েন্দা।

'মিস্টার বারনার, মিস্টার বারনার,' ডাক দিল কিশোর। 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

বারনারের ফ্যাকাসে চেহারাটা কুঁচকে গেল। কাঁপতে শুরু করল চোখের পাতা। খুলল না। বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

'জখম হয়েছেন আপনি,' কিশোর বলল। 'হাড়টাড় কোথাও ভেঙেছে নাকি? টের পাচ্ছেন?'

'উহুঁ মনে হয় না,' দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিল বারনার।

মিনিটখানেকের মধ্যেই ফার্স্ট এইড কিট নিয়ে ফিরে এল রবিন। বারনারের ক্ষতটায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে ওকে সাহায্য করল মুসা আর কিশোর।

'আহ,' গুঙিয়ে উঠল আবার বারনার। 'আমার মাথা!' চোখের পাতা কেঁপে উঠল আবার তার। খুলে গেল অবশেষে।

'একটু ধৈর্য ধরুন,' রবিন বলল। 'হাসপাতালে নিয়ে যাব আপনাকে আমরা।'

'হাসপাতাল তো অনেক দূর,' মুসা বলল। 'সবচেয়ে কাছেরটাও সেই রকি বীচের জেনারেল হাসপাতাল।'

'তাহলে ওখানেই নিতে হবে,' রবিন বলল। 'অ্যামবুলেন্স দরকার।'

'আমরাই ওকে নিয়ে যেতে পারব,' পেছন থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ। মুখ তুলে কিশোর দেখল, এডমন্ড আর ব্রিক দাঁড়িয়ে আছে।

'রকি বীচে যাচ্ছিই আমরা,' ব্রিক বলল আবার। 'ট্রাকে জায়গা হয়ে যাবে। কাছে বসে নজর রাখতে পারবে এড।'

'হ্যাঁ, পারব,' এড বলল। 'এ সব কাজে মোটামুটি অভিজ্ঞতাও আছে আমার।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ট্রাকটাকে পার্কের কাছে পিছিয়ে নিয়ে এল ব্রিক। বারনারের কোথাও হাড় ভেঙেছে কিনা টিপেটুপে দেখতে লাগল কিশোর আর মুসা। একটা কম্বল এনে ট্রাকের পেছনে বিছিয়ে দিল রবিন। ধরাধরি করে তাতে তুলে শুইয়ে দেয়া হলো বারনারকে।

'সোজা জরুরী বিভাগে নিয়ে যাবেন,' ব্রিককে বলল রবিন। 'আর সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ।'

একটু দূরে দাঁড়িয়ে নীরবে এতক্ষণ বারনারকে ট্রাকে তুলতে দেখছিলেন ডক্টর ফারগুসন। এগিয়ে এসে ব্রিক আর এডমন্ডকে বললেন, 'জরুরী বিভাগের ইনচার্জকে আমার কথা বলে বোলো পরে আমি বারনারকে দেখতে যাব।'

রওনা হয়ে গেল ট্রাক। রবিন আর ডক্টর ফারগুসন এগোলেন ওঅর্কশপটার দিকে। নষ্ট হয়নি এমন যে সব জিনিস আছে এখনও, ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে সেগুলো উদ্ধার করার জন্যে।

কিশোরের দিকে ফিরল মুসা। 'ট্রাইসেরাটপসটাকে কেউ চালু করে দিয়ে সরে পড়েছিল, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ। ডাইনোসর পার্কের কাছে একমাত্র ব্যক্তি কে ছিল তখন?'

'বারনার,' মুসা বলল। 'মাথার কাটাটা দেখে তো মনে হয় ডাইনোবটের পেটের নিচে ঝুলতে থাকা দরজার বাড়ি খেয়েই হয়েছে।'

ধসে পড়া ওঅর্কশপটার দিকে তাকাল কিশোর। 'আমারও তাই মনে হয়। ডাইনোবটটাকে চালু করে ওঅর্কশপের দিকে রওনা করিয়ে দিয়েছিল। তাড়াহুড়া করে ককপিট থেকে বেরোতে গিয়ে মাথায় খেয়েছে বাড়ি। ও তো যেটাই করতে যায়, সেটাতেই ভজকট পাকায়।'

'হ্যাঁ, এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা,' একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'ওরকম সচল একটা মেশিনের ককপিট থেকে ছোট একটা ফোকর দিয়ে বেরোনো খুব কষ্টকর কাজ।'

'সে-জন্যেই তো সরতে গিয়ে ঠিকমত সরতে পারেনি। দরজার বাড়ি খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেছে।'

'সবই বুঝলাম,' মুসা বলল। 'কিন্তু কেন? ওঅর্কশপটা ধ্বংস করে বারনারের কি লাভ?'

কাঁধ ঝাঁকাল কিশোর। 'জানি না। চলো দেখি, ওখানে কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা?'

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছেন ডক্টর ফারগুসন। তাঁকে সাহায্য করছেন মারটিন ও রবিন। ওদের সঙ্গে যোগ দিতে চলল কিশোর আর মুসা।

কাছে আসতে শুনল, মারটিন বলছেন ডক্টর ফারগুসনকে, 'এখন বুঝলেন তো ওই যান্ত্রিক দানবগুলো বানানোর ব্যাপারে আপত্তিটা কেন ছিল আমার? সাধারণ তারের বেড়া দিয়েই তো নিশ্চিন্ত ছিলেন আপনারা। এত শক্তিশালী

একটা যন্ত্রকে এই সামান্য বেড়া দিয়ে ঠেকানোর চিন্তাটাই হাস্যকর।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ফারগুসন। 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছিলে। লেজ আর মাথা নড়ানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে ভাল হত। সচল করা কোনমতেই উচিত হয়নি।'

অবাক মনে হলো মারটিনকে। তিনি বোধহয় ভাবেননি, তাঁর যুক্তি বিনা তর্কে মেনে নেবেন ফারগুসন। বললেন, 'যাক, আমার একটা কথা অন্তত মানলেন এতদিনে।'

'তা আস্ত কিছু আর পেলে নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন ফারগুসন।

'ছোট ছোট কয়েকটা যন্ত্রপাতি,' মারটিন বললেন। 'আমার ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে রেখে দিচ্ছি। নিরাপদে থাকবে।'

ঘাসে ঢাকা মাঠের ওপর দিয়ে দ্রুতপায়ে ল্যাবরেটরির দিকে রওনা হয়ে গেলেন তিনি।

একটা বোর্ড সরালেন ফারগুসন। নিচে চাপা পড়ে ছিল বাইসনের মূর্তিটা। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। গম্ভীর মুখে টুকরোগুলো তুলে তুলে ব্যাগে ভরতে লাগলেন। সাহায্য লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না কিশোর, ফারগুসনের মুখের ভঙ্গি দেখে।

ফিরে এলেন মারটিন।

'মুরারিকে দেখলে নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন ফারগুসন। 'ওর ডাইনোসরটা ছুটল কিভাবে, জিজ্ঞেস করা দরকার।'

'না, দেখিনি,' জবাব দিলেন মারটিন।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করতে করতে মুখ তুলে তাকাল রবিন। জবাবটা সে-ই দিল, 'রকি বীচে গেছেন হয়তো। কিছু জিনিসপত্র আনার দরকার ছিল, সেগুলো আনতে।'

তিক্ত হাসি হাসলেন মারটিন। 'সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এখন ওর প্রাগৈতিহাসিক মেশিনগুলোর জন্যে ব্রেক।'

'হয়েছে, এ নিয়ে আর আলোচনা ভাল লাগছে না,' ফারগুসন বললেন। 'তোমার আশঙ্কা যে ঠিক ছিল, সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। কত আশাই না করা হয়েছিল, দর্শকদের আগ্রহ বাড়াবে এগুলো। হুঁহ!' মাটির টুকরো ভর্তি ব্যাগটা তুলে নিয়ে গিয়ে অফিসে রেখে এলেন তিনি। কয়েকবার করে রেখে এসে শেষবার যাওয়ার সময় রবিনকে বললেন, 'রবিন, আমি অফিসে আছি। জরুরী কোন প্রয়োজন পড়লে খবর দিও।'

'আমিও যাই। প্রচুর কাজ পড়ে আছে,' বলে ফসিল হলের দিকে রওনা দিলেন মারটিন।

মুসা আর কিশোরকে বলল রবিন, 'আস্ত যা পাওয়া যায়, সব বের করে আনতে হবে। নতুন করে আবার খাড়া করতে হবে ওঅর্কশপটা। খরচ যতটা সম্ভব কম করে। ভাগ্যিস, ডক্টর ফারগুসনের মেজাজ যতটা খারাপ হবে ভয়

পাচ্ছিলাম ততটা হয়নি।'

চারপাশে চোখ বোলাল কিশোর। কয়েকজন শ্রমিক আর স্বেচ্ছাসেবী এসে এখন যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে। নিচু স্বরে কিশোর বলল, 'রবিন, তোমার সঙ্গে কথা আছে। জরুরী।'

ঘড়ি দেখল রবিন। 'দিনটা তো গেল আজ বেকারই। চলো গিয়ে বসি কোথাও। আধ ঘণ্টা পর।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো কিশোর। 'স্যাকভিলের রেস্টুরেন্টটায় গিয়ে বসা যেতে পারে।'

দশ

রেস্টুরেন্টে বসে রবিনের আসার অপেক্ষা করছে কিশোর আর মুসা। মিউজিয়ামের ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করল দুই গোয়েন্দা।

'সারাটা দিনই তো প্রায় শহরে কাটালেন মুরারি,' কিশোর বলল। 'ডাইনোবটটা আঘাত হানার সময় মিউজিয়ামে থাকলে আজ কেলেঙ্কারি কাণ্ড ঘটে যেত মারটিনের সঙ্গে।'

'একেবারে খুনোখুনি,' মুসা বলল।

এই সময় রবিন ঢুকল। এগিয়ে আসতে লাগল টেবিলটার দিকে। মুসার সামনে রাখা প্লেটে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের স্তূপ দেখে হাসল। 'ডাইনোসরে খাবে নাকি এত?'

হাসল কিশোর। 'ডাইনোসরের কি অভাব আমাদের? যার সামনে আছে, সে-ই খাবে।'

'মুসা, সত্যি,' রবিন বলল, 'দিনকে দিন ডাইনোসরই হয়ে যাচ্ছ তুমি। বাপরে বাপ, এত খাবার খায় কি করে একজনে!'

'একজন কোথায়?' নিরীহ ভঙ্গিতে বলল মুসা। 'আমরা তিনজন। ভয় নেই; আরও খাবারের অর্ডার দেয়া হয়েছে।'

এরপর আর কি বলার থাকে। ক্লান্ত ভঙ্গিতে ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল রবিন। কিশোরের দিকে তাকাল। 'জরুরী কথাটা কি?'

একটা প্লেটে খাবার নিয়ে রবিনের দিকে ঠেলে দিল মুসা। 'নাও, শুরু করে দাও। তোমার জন্যে বসে থাকতে থাকতে খিদেটা ডাবল হয়ে গেছে।'

'ডেভন মেডিন নামটা শুনেছ কখনও?' রবিনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'শুনেছি,' খাবার চিবাতে চিবাতে জবাব দিল রবিন। 'অ্যানটিক ডিলার। টাকাপয়সা ভালই আছে। নকল জিনিসকে আসল বলে চালানো, চোরাই মাল বিক্রি, এ সব বদনামও শুনেছি তার নামে।'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর।

'বারনারের পিছু নিয়েছিলাম আমি,' মুসা বলল। 'মেডিনের সাগর পাড়ের বাড়িটা দেখে এসেছি।'

হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল রবিন। 'কি বলছ! বারনার মেডিনের বাড়িতে কি করতে গিয়েছিল?'

'সেটাই তো জানতে চাইছি,' কিশোর বলল। 'এ ব্যাপারে তুমি কোন আলোকপাত করতে পারো কিনা। রহস্যময় মানুষে পরিণত হয়েছে বারনার। ওর যে কোন এমপ্লয় রেকর্ড নেই জানো সে-কথা?'

'না তো!' অবাক হলো রবিন। 'কিন্তু তুমি জানলে কি করে?'

'কাল রাতে গোপনে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেকশনে ঢুকেছিলাম আমি,' জবাব দিল কিশোর। 'ওর পারসোন্যাল ফাইলটা খুঁজে পাইনি।'

'কিন্তু আমি তো জানতাম আছে।'

'কোন কারণে সরিয়ে ফেলেনি তো?' মুসার প্রশ্ন।

'কি জানি, ফেলতেও পারে। কিন্তু কেন করবে এমন কাজ?' প্রশ্নটার জবাব নিজেই দিল রবিন। 'হয়তো ওর রেকর্ড-পত্রে এমন কিছু রয়েছে, যেটা আমাদের জানতে দিতে চায় না। সোজা কথায়, লুকাচ্ছে।'

'নিশ্চয় মেডিনের সঙ্গে যে ওর যোগাযোগ আছে, সেটা প্রকাশ পেয়ে যাবে রেকর্ড দেখলে,' মুসা বলল।

'কিন্তু লুকানোর প্রয়োজন পড়ে এ রকম খারাপ রেকর্ড যদি থেকেই থাকে ওর,' কিশোর বলল, 'সেটা গ্রহণ করলেন কেন ডক্টর ফারগুসন। তাঁর চোখে কিছু পড়েনি?'

চোখ মিটমিট করল দ্বিধাগ্রস্ত রবিন। 'হ্যারিস বারনার···ডেভন মেডিনের সঙ্গে বেআইনী কিছু করছে···বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'বেশ, একটা অতিকল্পনা করা যাক,' কিশোর বলল। 'ডক্টর ফারগুসনেরই কোন সম্পর্ক নেই তো ওই মেডিন লোকটার সঙ্গে?'

'না না, কি বলো···' থেমে গেল রবিন। চোখ তুলে তাকাল। 'কি জানি! যদি থেকেই থাকে কি করে জানছি আমরা?'

'উপায় একটা বেরোবেই। ডেভন মেডিন কিসের ব্যবসা করে না জানলে ফারগুসনকে সন্দেহ করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। যাই হোক, এখন মিউজিয়ামে কাজ করার পাশাপাশি কড়া নজর রাখবে সবার ওপর। কে কি করে না করে জানার চেষ্টা করবে। রহস্যজনক কোন কিছু চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাকে।'

*

কাজ ফেলে এসেছে। মিউজিয়ামে চলে গেল আবার রবিন।

বাড়ি ফিরে চলল কিশোর আর মুসা। অন্ধকার হয়ে গেছে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'চোরাই মাল বিক্রি করে, এমন একজন

লোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল বারনার। এমন একটা জায়গায় চাকরি করে সে, যেখানে দামী দামী অ্যানটিক আছে। দু'জনের সম্পর্কটাকে এখন কিভাবে ব্যাখ্যা করবে তুমি?'

'সহজ। মিউজিয়াম থেকে মাল চুরি করে নিয়ে গিয়ে মেডিনের কাছে বিক্রি করছে বারনার,' গাড়ি চালাতে চালাতে জবাব দিল মুসা। 'কিন্তু মিউজিয়াম থেকে মাল চুরির কথা তো এখনও শুনিনি আমি।'

'আমিও না। আরকেইওপটেরিক্সের কঙ্কালটাকে পাওয়া না গেলে সেটাকে চুরি হিসেবে ধরা যেতে পারত।'

'কিছু চুরি যাক বা না যাক, মেডিনের সঙ্গে যে যোগাযোগ আছে বারনারের, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ সে মেডিনের বাড়িতে গিয়েছিল। ট্রাইসেরাটপসটাকে চালু করে দিয়ে নেমে পালানোর চেষ্টা করেছিল বারনার, সেটাও সন্দেহ করা যেতে পারে। দুটো ঘটনাকে একসূত্রে গাঁথা যায় কি করে?'

'জানি না,' হাত ওল্টাল কিশোর। 'জানা থাকলে ভাল হত। তবে একটা কথা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে, চোরাই মাল বিক্রি করতে গিয়ে থাকলেও সেটা অন্য কারও নির্দেশে গিয়েছিল বারনার। নিজে নিজে করছে না এ সব।' চিন্তায় ডুবে গিয়ে ঘন ঘন চিমটি কাটতে শুরু করল নিচের ঠোঁটে।

স্যাকভিল থেকে মাইল দুয়েক দূরে আছে ওরা। রীয়ারভিউ মিররের হেডলাইটের আলো মুসার চোখেও এসে পড়ছে। চোখ কুঁচকে ফেলতে হচ্ছে ওকে। 'মনে হচ্ছে খুব তাড়া লোকটার।'

'উঁ!' বাস্তবে ফিরে এল যেন কিশোর। 'চলে গেলেই পারে। রাস্তা তো ফাঁকা। পাশ কাটানোর জায়গাও আছে।'

'নাকি অন্য কোন কুমতলব?'

মুসার কথা শেষ হতে না হতেই গতি বেড়ে গেল গাড়িটার। টান দিয়ে ওর পাশে চলে এল। একটা পিকআপ ট্রাক। ড্রাইভারের মুখে স্কি মাস্ক পরা। মুসাকে অবাক করে দিয়ে তার গাড়িকে ধাক্কা মারতে এল ট্রাকটা।

'আরি আরি!' চিৎকার করে উঠে স্টীয়ারিং কেটে পাশে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল মুসা। 'রাস্তা থেকে ফেলে দেবে নাকি!'

'ব্রেক করো!' চিৎকার করে উঠল কিশোরও।

মুসা কিছু করার আগেই তার গাড়ির গায়ে গা ঠেকিয়ে ঠেলতে শুরু করল পিকআপটা। ঠেলে নিয়ে চলল রাস্তার কিনারে।

এগারো

স্টীয়ারিঙের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করতে লাগল মুসা। বার বার ব্রেক কষছে। চাকা পিছলে যাচ্ছে। শেষ আরেকটা ধাক্কা দিয়ে গতি বাড়িয়ে চলে গেল পিকআপটা। দ্রুত হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

ঘটাং করে আওয়াজ হলো। পরক্ষণে আবারও একটা ধাতব শব্দ। কোন কিছুর সঙ্গে গুঁতো লেগেছে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল গাড়ি। সামনের দিকে ছুটে গেল দু'জনের দেহ। সীট বেল্টে টান লেগে ফিরে এল।

স্টীয়ারিংটা এখনও আঁকড়ে ধরে আছে মুসা। জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

'থামে লেগেছে মনে হয়,' জবাব দিল কিশোর।

গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'মেলা টাকার ধাক্কা! মেরামত করার খরচ!'

সীটবেল্ট খুলে দু'জনেই নেমে এল গাড়ি থেকে। কিশোরের অনুমানই ঠিক। একটা লাইটপোস্টের গায়ে আটকে রয়েছে গাড়ি। বাতি নেই, বোধহয় নষ্টই হয়ে গেছে, সে-জন্যে জায়গাটা অন্ধকার। সামনের চাকাটা রাস্তার কিনার থেকে কয়েক ইঞ্চি নেমে গেছে গভীর খাদের দিকে।

'টাকা খরচের কথা আর বোলো না!' কেঁপে উঠল কিশোরের কণ্ঠ। 'আল্লাহ্ বাঁচিয়েছে। আরেকটু সরলেই...' কথাটা আর শেষ করল না সে। তাকিয়ে রইল চল্লিশ ফুট নিচের গভীর খাদের দিকে।

মুসা বলল, 'পিকআপটা যে-ই চালাক, জায়গাটা বেছেছিল ভালই। আমাদের শেষ করে দিতে চেয়েছিল।'

গায়ের কাঁপুনি থামতে সময় লাগল ওদের। গাড়ির পাশ ঘুরে ক্ষতিটা দেখতে গেল মুসা। কয়েক ইঞ্চি গভীর হয়ে বসে যাওয়া লম্বা একটা দাগ পড়েছে বডিতে। রঙ উঠে গেছে। 'যাক, খুব বেশি নষ্ট হয়নি। তা ছাড়া এমনিতেও রঙ করানোর সময় হয়েছিল গাড়িটার।'

আবার সামনের দিকে এগোল সে। 'আমি লো গীয়ারে টান দিচ্ছি। তুমি পেছন থেকে ঠেলা দাও।'

ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল মুসা। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে খুব সাবধানে আস্তে আস্তে ব্রেক ছাড়ল। কয়েক মুহূর্ত বন বন করে ঘুরল খাদের পাশের সামনের চাকাটা। অবশেষে কামড় বসাল মাটিতে। পেছন থেকে ঠেলতে থাকল কিশোর। রাস্তায় উঠে এল চাকাটা। খাদের কিনার থেকে সরে এল গাড়ি।

উঠে বসল কিশোর। আবার চলল গাড়ি।

এদিক ওদিক স্টীয়ারিং ঘুরিয়ে এবং আরও কিছু পরীক্ষা করে মুসা বলল, 'বড় রকমের কোন ক্ষতি হয়নি। লোকটাকে ধরার চেষ্টা করব নাকি?'

'কি করে?' মাথা নাড়ল কিশোর। 'পারবে না। অনেক আগে চলে গেছে পিকআপটা। তারচেয়ে ভাবা যাক, পিকআপওয়ালা কোন্ লোক আমাদের শত্রু হতে পারে। বলো তো, মিউজিয়ামে কার একটা পিকআপ আছে?'

'বারনারের,' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল মুসা। 'যদিও যে লোকটা ধাক্কা দিয়েছে, তার মুখ দেখতে পাইনি। স্কি মাস্ক পরে ছিল। গলায় জড়ানো একটা রুমাল।'

'বারনারও সব সময় গলায় একটা রুমাল জড়িয়ে রাখে,' কিশোর বলল।

'কিন্তু মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেই তো ব্রিক আর এডমন্ড ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। তা-ও জরুরী বিভাগে। এত তাড়াতাড়ি সে উঠে আসে কি করে?'

'ইমার্জেন্সিতে নিলেও তার তেমন কোন জখম ছিল না শরীরে,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'যা আছে সহজেই সেলাই-টেলাই করে ছেড়ে দিতে পারেন ডাক্তাররা।'

'কিন্তু বারনার আমাদের খুন করতে চাইবে কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'মেডিনের বাড়ির কাছে তোমাকে হয়তো দেখে ফেলেছিল। চিনে ফেলেছিল।'

মাথা নাড়ল মুসা। 'না, দেখেনি। আর দেখলেও কি খুন করে ফেলতে চাইবে নাকি? বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।'

'করতে যখন চেয়েছে, বিশ্বাস না করে আর উপায় কি? নিশ্চয় এমন কিছু করেছে ও, যেটা গোপন রাখতে চায়; অথচ আমরা সেটা জানার কাছাকাছি চলে গেছি।'

'সেটা কি?'

ভ্রূকুটিতে কুঁচকে গেল কিশোরের চোখ। 'সেটাই তো বোঝার চেষ্টা করছি!'

*

নিজেদের বাড়িতে না গিয়ে স্যালভিজ ইয়ার্ডে গাড়ি ঢোকাল মুসা। দু'জনে নেমে ঢুকে পড়ল তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওঅর্কশপে। ফোন বুকটা টেনে নিয়ে জেনারেল হাসপাতালের নম্বর বের করল কিশোর। দ্রুতহাতে ডায়াল করল।

'হালো, রকি বীচ জেনারেল,' জবাব এল হাসিখুশি মহিলা কণ্ঠে।

'আপনি কি বলতে পারবেন, হ্যারিস বারনার নামে কোনও রোগী এখন ওখানে আছে কিনা?' অনুরোধ করল কিশোর।

'ধরুন। দেখছি।'

দুই মিনিট পর ফিরে এল মহিলা। 'সরি। ওই নামে কোন রোগী নেই আমাদের এখানে।'

'ছাড়বেন না, প্লীজ।' কিশোর বলল। 'দয়া করে দেখবেন কি, আজ বিকেলের দিকে ইমার্জেন্সিতে ওই নামে কাউকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে কিনা?'

'দেখি।'

কয়েক মিনিট পর ফিরে এল মহিলা। 'হ্যাঁ। ওই নামের একজন লোককে ইমার্জেন্সিতে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। ঘন্টাখানেক অবজারভেশনে রাখা হয়েছিল তাকে। তারপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।'

'থ্যাংকস,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। পেছনে দাঁড়ানো মুসার দিকে ফিরল। 'বহু আগেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে বারনারকে।'

ওঅর্কশপ থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে রওনা হলো দু'জনে। কাজ আছে, বলে মুসাকে আটকে রাখল কিশোর। চাচা-চাচী ঘরে নেই। ইয়ার্ডের কর্মচারী দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের একজন বোরিস জানাল, তাঁরা বাইরে গেছেন। কাজে।

টিনের সুপ আর রুটি দিয়ে খাওয়া সারল দুই গোয়েন্দা। খাওয়ার শুরু থেকেই গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল কিশোর। অবশেষে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'ডক্টর ফারগুসনের আচরণে অদ্ভুত কিছু তোমার চোখে পড়েছে?'

'বুঝলাম না!' অবাক হলো মুসা। 'কি আচরণ?'

'এখনও শিওর হতে পারিনি আমি,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে অতিরিক্ত শান্ত ছিল। রবিনের নজরও এড়ায়নি সেটা। ওঅর্কশপটা ধ্বংস হয়ে গেল, বাইসনের মূর্তিটা ভেঙে চুরমার হলো, অথচ কোন রকম উত্তেজনা দেখা যায়নি তাঁর মাঝে। শান্ত মেজাজে নির্বিকার ভঙ্গিতে টুকরোগুলো তুলে ব্যাগে ভরতে থাকলেন।'

'বেশি দুঃখ পেলে মানুষ ওরকম পাথর হয়ে যায়,' যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করল মুসা।

ওপরে নিচে ঘন ঘন মাথা দোলাতে থাকল কিশোর। ভ্রূকুটিটা যাচ্ছে না। 'আর ওই টুকরোগুলো নিজেই বা কুড়াতে গেলেন কেন? সে-কাজটা রেখে দিতে পারতেন রবিন, মারটিন কিংবা আমাদের জন্যে।'

'ওগুলো নিশ্চয় জরুরী,' জবাব দিল মুসা। 'বীমা কোম্পানিকে দেখানোর জন্যে নিয়ে গেছেন।'

'হতে পারে,' সন্তুষ্ট হতে পারছে না কিশোর। 'কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল, বাইসনটা ভেঙে যাওয়াতে তিনি খুশিই হয়েছেন। মনে মনে চাইছিলেনই যেন, ভেঙে যাক। ভাঙা নিয়ে টুঁ শব্দ করলেন না, সামান্যতম ক্ষোভ প্রকাশ করলেন না, স্রেফ ভাঙা টুকরোগুলো কুড়িয়ে তুলে নিতে লাগলেন।'

'আমাকে আর ভাবতে বোলো না এ সব, মাথা গরম হয়ে যাবে!' তারপর নিজেই বলে যেতে লাগল গড়গড় করে, 'মারটিন আর মুরারির শত্রুতা···যেটাতে হাত দিতে যায় সেটাকেই ভজকট করে বারনার···এখন তুমি বলছ, ডক্টর ফারগুসন তাঁর নিজের মিউজিয়াম নিজেই তছনছ করতে চান···এত দামী মূর্তি ভাঙাতে খুশি হয়েছেন···নাহ্, আমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না!'

'যদি ওটা দামী হয়ে থাকে।' যেন নিজেকেই বোঝাল কিশোর।
'মানে?'
'বললাম, যদি ওটা দামী ভাস্কর্য হয়ে থাকে,' একই রকম ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'তা না হলে ওটা ভাঙা আর একটা সাধারণ মাটির কলস ভাঙা সমান কথা। মূল্যহীন মাটির টুকরো তুলে নিয়ে গিয়ে সহজেই ফেলে দিয়ে আসা যায়।'
বড় বড় হয়ে গেল মুসার চোখ। 'তুমি বলতে চাও ওই জিনিসটা নকল ছিল?'
শ্রাগ করল কিশোর। মৃদু হাসি ফুটেছে ঠোঁটে। 'ডক্টর ফারগুসনের এত শান্ত আচরণের এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা। এই অদ্ভুত ধাঁধাটার মাঝে তাহলেই কেবল ফিট করানো যায় ডেভন মেডিনকে।'
হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা।
মগজের চাকাগুলো বন্ বন্ করে ঘুরছে কিশোরের। এক আঙুল তুলল। 'এবং সেই প্রমাণটাই এখন করতে হবে আমাদের।'
'কি প্রমাণ করবে?'
'মূর্তিটা নকল ছিল।'
'কিন্তু ভাঙা টুকরো দিয়ে কি সেটা সম্ভব?'
'হয়তো সম্ভব। কোনও অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীকে দেখাতে পারলে।'
'কিন্তু পাবে কোথায় সেই টুকরো? ওগুলো তো ফারগুসন নিয়ে গেছেন।'
'সেগুলো এখন আছে কিনা সন্দেহ আছে আমার। হয়তো এতক্ষণে ধুলোকণায় পরিণত হয়েছে।'
হাল ছেড়ে দিল মুসা। 'তাহলে আর প্রমাণ করবে কি দিয়ে?'
মুসার চোখে চোখে তাকাল কিশোর। 'ফারগুসন শুধু বড় বড় টুকরোগুলোই নিয়েছেন। ছোটখাট একআধটা টুকরো এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে পড়ে থাকতে পারে। সেটা পেলেই কাজ হয়ে যায়। আবার আমাদের ফিরে যেতে হবে মিউজিয়ামে।'

*

মিউজিয়ামের পার্কিং লটে আর ঢুকল না এখন মুসা। গাড়ি রাখল খানিক দূরে রাস্তার ধারে। গাড়ি থেকে নেমে অন্ধকার বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল সে আর কিশোর। নিঃশব্দে এগিয়ে চলল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইঙের পেছন দিক দিয়ে।
'আগেই যদি কথাটা মনে পড়ত,' ফিসফিস করে মুসা বলল, 'এখন আর আসা লাগত না।'
'পড়েনি যখন কি আর করা,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে জানা আছে যেহেতু কোথায় গিয়ে কি খুঁজতে হবে, কাজ সারতে বেশিক্ষণ লাগবে না।'
'যদি না পাই?'
'চলে যাব।'
আরেকবার চুরি করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্টের তালা খুলল

কিশোর। নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল দু'জনে। পা টিপে টিপে এগোল অন্ধকার হলওয়ে ধরে। ফারগুসনের অফিসের দিকে।

চলতে চলতে কান পাতল কিশোর। ওপরতলায় নাইটগার্ডের ঘর থেকে টেলিভিশনের শব্দ আশা করল। নেই। শুধুই নীরবতা। তারমানে টহলে বেরিয়েছে গার্ড। যে কোন মুহূর্তে সামনে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে গেল কিশোরের।

ডক্টর ফারগুসনের অফিসের দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে থাকতে দেখে হলওয়েতেই দাঁড়িয়ে গেল দু'জনে। কান পাতল আবার। কানে এল খুব মৃদু শব্দ। পরক্ষণে একটা ম্লান আলো জ্বলল নিভল।

অবাক হয়ে গেল কিশোর। আলোটা কিসের বুঝতে পেরেছে। পেন্সিল টর্চ। নাইটগার্ড এ রকম টর্চ ব্যবহার করবে না। তার হাতে থাকে বড় টর্চ। সন্দেহ হলে প্রয়োজনে ঘরের আলো জ্বেলেও দেখতে পারে সে।

এর একটাই মানে। ফারগুসনের অফিসে ঢুকেছে কেউ। নিজেকে গোপন রাখতে চাইছে। আপনাআপনি হাতের আঙুল মুঠোবদ্ধ হয়ে গেল কিশোরের।

বারো

কোমরে ঝোলানো টর্চটা খুলে নিল কিশোর।

আস্তে করে এসে অফিসে ঢুকল। সামনের দিকে তাক করে টিপে দিল সুইচ। ফারগুসনের খোলা সেফটার সামনে ঝুঁকে থাকতে দেখা গেল একটা লোককে।

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। টর্চের আলো থেকে বাঁচানোর জন্যে দু'হাতে চোখ ঢাকল।

হারভে মুরারি!

'মিস্টার মুরারি!' চিৎকার করে উঠল কিশোরের পেছনে দাঁড়ানো মুসা।

'তোমরা?' টর্চের আলোতে চোখ মিটমিট করছে তাঁর।

টর্চ নামাল কিশোর। 'হ্যাঁ, আমরা। আপনি এখানে কি করছেন, সেটা আগে বলুন। তারপর জানাচ্ছি আমরা কেন এসেছি এখানে।

'তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে একই উদ্দেশ্যে এখানে এসে হাজির হয়েছি আমরা,' মুরারি বললেন। ছোট একটা ব্যাগ তুলে দেখালেন, যেটাতে বাইসনের ভাঙা মূর্তির টুকরো ভরেছিলেন ফারগুসন। 'মাটির ভাঙা টুকরো খুঁজতে এসেছ, তাই না?'

'হ্যাঁ,' মুখ বন্ধ রাখতে পারল না মুসা। 'পরীক্ষা করে দেখতে চাই, জিনিসটা আসল ছিল, না নকল।'

'নকলই, তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার,' মুরারি বললেন। 'আমার দৃঢ়

বিশ্বাস, মারটিন ওটা ভেঙে ফেলেছে তার কারণ ওটা যে নকল ছিল কেউ যেন জানতে না পারে। আর এ কাজে আমার ডাইনোবটটা ব্যবহার করেছে সে।'

'ওটা যে নকল এ সন্দেহ কেন হলো আপনার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ঠেলাগাড়ি থেকে পড়ে চলটা উঠে গিয়েছিল, মনে আছে?' মুরারি বললেন। 'ওটা ভালমত দেখেছিলাম আমি। বাইরের দিকটার মত ভেতরের দিকটা অত পুরানো লাগেনি। বরং নতুনই মনে হয়েছে। বাইসনটা যদি আসলই হত, ভেতরে বাইরে সবখানে এক রকম পুরানো লাগত।'

'কিন্তু মূর্তিটা ভেঙে ফেলে মারটিনের কি লাভ?' মুসার প্রশ্ন।

'খুব সহজ জবাব। নোরা ইভান নেই, মিউজিয়ামের কেনাকাটা সব মারটিনের দায়িত্বে। কেনার পর হয়তো বুঝতে পেরেছে বাইসনের মূর্তিটা নকল। জানাজানি হলে বোকা বনতে হবে। হাসির পাত্র হওয়ার চেয়ে আগেভাগেই নষ্ট করে দেয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছে।' শক্ত হয়ে গেল মুরারির চোয়াল। 'আমার ডাইনোবট দিয়ে জিনিসটা নষ্ট করেছে এক ঢিলে দুই পাখি মারার জন্যে—তাতে তার কাজও উদ্ধার হবে, সন্দেহটাও পড়বে সবার আমার ওপর। এর চেয়ে ভাল বুদ্ধি আর কি হতে পারে?

'কিন্তু অতি চালাকের গলায় দড়ি,' মুরারি বললেন। রাগটা দমন করতে পারছেন না। 'তবে এবার আমি ছাড়ব না ওকে। টুকরোগুলো পরীক্ষার জন্যে ল্যাবরেটরিতে পাঠাব। আমার একজন বন্ধু আছে সেখানে, কাজটা সে-ই করে দেবে।'

'ডক্টর ফারগুসন কি জানেন এ সব?' জানতে চাইল কিশোর। 'মারটিন কি তাঁকে বলেছেন?'

'উঁহু,' জবাব দিলেন মুরারি। 'মারটিন বলেছে বলে টুকরোগুলো সরিয়েছেন তিনি তা নয়, নিয়ে গেছেন বীমা কোম্পানির সামনে প্রমাণ হাজির করার জন্যে।'

'নেয়ার সময় তো আপনি সামনে ছিলেন না,' প্রশ্ন করল কিশোর, 'জানলেন কি করে?'

'রবিনের কাছে। বিকেল বেলা আমি ফিরে এলে সব জানিয়েছে আমাকে রবিন।'

'মারটিনকে অকারণে সন্দেহ করছেন আপনি। তিনি এ সবের পেছনে নেই,' কিশোর বলল। 'এমনিতেই কাজের চাপে অস্থির। নতুন ঝামেলা সৃষ্টি করে বোঝা বাড়াতে যাবেন না। আমার মনে হয় এ সবের পেছনে অন্য কারও হাত আছে।'

'কিন্তু আমার ওপর আক্রোশ যে আছে তাতে তো কোন সন্দেহ নেই,' মুরারি বললেন। 'আমি বলছি, সব কিছুর মূলে ওই মারটিন। নাকি অন্য কোন যুক্তি আছে তোমার?'

'আমরা জানতে পেরেছি ডেভন মেডিন নামে একজন কুখ্যাত অ্যান্টিক ডীলার এ সবের সঙ্গে জড়িত, আর তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে হ্যারিস

বারনারের,' কিশোর বলল।

'বারনার যদি থেকেই থাকে, মারটিনের সহকারী হিসেবে কাজ করছে সে,' নিজের ধারণা থেকে সরতে চাইছেন না মুরারি। 'বারনারের এত বুদ্ধি বা সাহস নেই যে নিজে নিজে শয়তানিগুলো করবে।'

'যাকগে। সব প্রশ্নেরই জবাব জানা যাবে,' কিশোর বলল। 'তবে সবার আগে টুকরোগুলো পরীক্ষা করে শিওর হওয়া দরকার, আসলেই নকল কিনা। সেটা জানা গেলে, বাকি ধাঁধার টুকরোগুলো জোড়া দেয়া সহজ হবে।'

মাথা ঝাঁকালেন মুরারি। 'আমার বন্ধু অ্যামান্ডা কঙ্কলিন রকি বীচ ডেন্টাল ল্যাবের টেকনিশিয়ান। সে আমাদের সাহায্য করতে পারবে।'

'দাঁত গবেষণাগারের টেকনিশিয়ান?' সন্দেহ প্রকাশ করল মুসা।

'অসুবিধে নেই। দাঁতের ল্যাবরেটরিতে চাকরি করে বটে, কিন্তু মাইক্রোপ্যালেওন্টোলজিতে মাস্টার ডিগ্রি আছে তার। ল্যাবরেটরিটা বেকার স্ট্রীটে, একটা গির্জার পাশে। কাল সকালে যাচ্ছি আমি ওখানে। তোমরাও চলে এসো না?'

'শনিবারে কি থাকবেন তিনি? ছুটি নেই?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

হাসলেন মুরারি। 'না, আমার মতই শনিবারেও ডিউটি দিতে হয় তাকে। তাহলে কাল সকাল সাড়ে নটায় দেখা হচ্ছে আমাদের। একটা টুকরো শুধু পরীক্ষা করাতে নিয়ে যাব। বাকিগুলো আলমারিতে রেখে যাব।'

'ভাল কথা,' মুসা বলল। 'ডক্টর ফারগুসনের সেফটা খুললেন কিভাবে আপনি?'

'কপাল ভাল আরকি,' মুরারি বললেন। 'সেফটায় তালা লাগাতে ভুলে গিয়েছিলেন ফারগুসন।'

'কপাল আমাদের সবার জন্যেই ভাল,' কিশোর বলল।

একটা টুকরো বের করে নিয়ে ব্যাগটা আবার সেফে রেখে দিলেন মুরারি। তিনি আর তালা লাগাতে ভুললেন না। ডায়ালটা ঘুরিয়ে দিলেন। টর্চ নিভাল কিশোর। ফারগুসনের অফিস থেকে বেরিয়ে এল তিনজনেই।

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইং থেকে বেরোনোর সদর দরজাটার কাছে পৌঁছেছে, এ সময় উল্টো দিক থেকে খুলে গেল দরজাটা। ওদের দেখে ফেলল নাইটগার্ড। লাফ দিয়ে এসে পড়ল।

'মিস্টার মুরারি,' অবাক হলো গার্ড। 'আমি তো ভেবেছিলাম, বহু আগেই বাড়ি চলে গেছেন আপনি। এরা দু'জনও যে আপনার সঙ্গে আছে, কল্পনাই করিনি।'

'ওভারটাইম করেছি, ডোনাল্ড,' মুরারি বললেন। 'কিশোর আর মুসা আমাকে সাহায্য করেছে। উদ্বোধনীর আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। জরুরী কিছু কাগজপত্র টেবিলে রেখে গেছেন ফারগুসন। সকালে এসেই ওগুলো তাঁর দরকার। কি আর করব। করে দিলাম।'

'কিন্তু কষ্ট করে আপনাদের আসার কি দরকার ছিল?' গার্ড বলল।

'আমাকে বললেই তো কাগজপত্রগুলো দিয়ে আসতে পারতাম আপনার অফিসে।'

'এত বড় মিউজিয়াম পাহারা দিতে দিতে এমনিতেই ঘামছ। তোমার কাজ আর বাড়াতে চাইনি।'

'চলুন, সামনের গেটের তালা খুলে দিই,' গার্ড বলল। 'আপনারা সব চলে গেছেন ভেবে তালা দিয়ে রেখেছিলাম।'

'থ্যাংকস,' মুরারি বললেন।

গেট খুলে ওদেরকে বের করে দিয়ে এল গার্ড। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মুরারি বললেন, 'রাতেই ফোন করব অ্যামান্ডাকে। সকালে যে দেখা করতে যাচ্ছি, জানিয়ে রাখব।'

'রবিনকেও খবরটা জানাতে হবে,' কিশোর বলল। 'ওকে বলব, কাল মিউজিয়ামে আসতে দেরি হবে আমাদের।'

তেরো

পরদিন সকালে বেকার স্ট্রীটের একটা আধুনিক একতলা বাড়ির সামনে মুরারির সঙ্গে দেখা করল কিশোর আর মুসা। অ্যামান্ডার ডেন্টাল ল্যাবরেটরিটা এ বাড়িতেই। আবছা অন্ধকার অফিসের একটা গোলকধাঁধা যেন বাড়িটার ভেতরে। সামনের হলঘরে আলো বলতে রাস্তার দিকের জানালাগুলো দিয়ে যতটা আলো আসতে পারছে, শুধু এই। বাতিটাতি নেই বললেই চলে।

ডেস্কে বসা রিসিপশনিস্টের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন মুরারি। বললেন, 'অ্যামান্ডা কঙ্কলিনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমরা।'

'উনি আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছেন,' রিসিপশনিস্ট জানাল। 'হলওয়ে ধরে সোজা চলে যান। শেষ মাথায় তাঁর ল্যাবরেটরি।'

হলের শেষ মাথার দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ওরা। সোনালি চুলওয়ালা একজন ভদ্রমহিলা স্বাগত জানালেন ওদের।

'হাই, অ্যামান্ডা,' মুরারি বললেন। হেসে পরিচয় করিয়ে দিলেন গোয়েন্দাদের সঙ্গে, 'ও কিশোর পাশা। আর ও মুসা আমান।'

'হারি, বহুদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হলো,' অ্যামান্ডা বললেন। 'ভাল লাগছে।'

'তোমার কাজে ব্যাঘাত ঘটালাম না তো?' মুরারি জিজ্ঞেস করলেন।

'না না,' মাথা নাড়লেন অ্যামান্ডা। 'বরং নিজের লাইনের একটা কাজ পেয়ে খুশিই লাগছে। স্যাম্পল এনেছ?'

পকেট থেকে ছোট একটা যন্ত্র বের করলেন মুরারি। ডালা খুলে মাটির টুকরোটা দেখালেন। 'চলবে এটুকুতে?'

হেসে বললেন অ্যামান্ডা, 'এক কণা হলেই চলত আমার, এ তো অনেক বেশি নিয়ে এলে। কাজকর্ম সব গুলে খেলে নাকি, হারি? দানব বানাতে বানাতে ভুলে গেছ, মাইক্রোস্কোপ নামে একটা যন্ত্র আছে?'

অ্যামান্ডাকে অনুসরণ করে ধবধবে সাদা একটা ঘরে এসে ঢুকল ওরা। তাতে বড় বড় নানা রকম যন্ত্রপাতি। মাকড়সার মত ছড়ানো পা আছে কোন কোনটার। ওগুলোর মাথায় ছোট চাকা লাগানো। ঠেলে সরানো যায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। একটা যন্ত্র দেখে চিনতে পারল কিশোর। ওটা দিয়ে আসল দাঁতের ছাঁচে নকল দাঁত বানানো হয়।

'এই যে এদিক দিয়ে এসো।' একটা বিশেষ ধরনের মাইক্রোস্কোপের কাছে ওদেরকে নিয়ে গেলেন অ্যামান্ডা। 'কিছু রেফারেন্স লাগবে।' ঠাসাঠাসি করে রাখা তাক থেকে মোটা একটা বই টেনে বের করলেন তিনি। 'একেক যুগে পৃথিবীর একেক এলাকার ফসিলের ধরন-ধারণ একেক রকম। মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করে কোন্ কালের জিনিস সেটা তো জানাতে পারবই, কোন্ এলাকার মাটির কোন্ স্তর থেকে তুলে আনা হয়েছে তা-ও বলতে পারব।'

'তারিখ জানার অন্য কোন সহজ উপায় নেই?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আছে,' অ্যামান্ডা জানালেন। 'তবে এ ল্যাবরেটরিতে নেই। অন্যখানে পাঠাতে হবে। তার জন্যে সময় লাগবে। আজকে তো হবেই না। কাল রাতে ফোনে আমাকে মুরারি বলেছিল, শুধু সময়কালটা জানাতে পারলেই চলবে। সেটা এখানে সহজেই সম্ভব। দশ হাজার বছরের পুরানো হলেও বলে দিতে পারব।'

'এটা কত বছরের পুরানো?' জানতে চাইল মুসা।

'দাঁড়াও, আগে পরীক্ষা করে নিই।' মুরারির হাত থেকে নমুনাটা নিলেন অ্যামান্ডা। সেটা থেকে আঁচড়ে আঁচড়ে মাটির কয়েকটা কণা একটা কাঁচের স্লাইডে নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রাখলেন। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে নানা ভাবে পরীক্ষা করে চললেন ওগুলোকে। যন্ত্রে চোখ রেখে দেখছেন। মাঝে মাঝে কি যেন মিলিয়ে নিচ্ছেন রেফারেন্স বইয়ের লেখার সঙ্গে।

'কি বুঝছ, অ্যামান্ডা?' মুরারি জিজ্ঞেস করলেন।

'তুমি যে বললে বরফ যুগের জিনিস দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে আনা হয়েছে?' অ্যামান্ডা বললেন।

'হ্যাঁ।'

হেসে উঠলেন অ্যামান্ডা। 'মহা ঠকা ঠকেছ।'

চট করে কিশোর আর মুসার দিকে তাকালেন মুরারি। এক ভুরু উঁচু করে ফিরে তাকালেন অ্যামান্ডার দিকে।

'কি করে বুঝলেন?' অ্যামান্ডাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'এক ধরনের ফুলের রেণু আটকে আছে এই মাটির টুকরোটাতে। যে গাছের ফুল, এ ধরনের উদ্ভিদ দক্ষিণ ফ্রান্সে কোন কালেই জন্মায়নি।

আমেরিকায় জন্মায়। তা-ও সব অঞ্চলে নয়। প্রধানত ক্যালিফোর্নিয়ায়।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, অ্যামান্ডা,' মুরারি বললেন। 'প্রচুর সময় নষ্ট করলাম তোমার। তবে আমাদের যে কি উপকার হলো, বলে বোঝাতে পারব না।'

'সময় নষ্টটাকে গোণায়ই ধরছি না আমি,' অ্যামান্ডা বললেন। 'বরং মজা পেলাম। নিজের লাইনের কাজ তো। মিউজিয়ামে এমন কোন কাজ যদি থাকে, আমার করার মত, জানিও।'

ডেন্টাল বিল্ডিং থেকে ব্যস্ত, রৌদ্রোজ্জ্বল রাস্তায় বেরিয়ে এল তিনজনে।

'কিছু খেয়ে নিলে কেমন হয়?' মুরারি বললেন। 'নাস্তা খাইনি আমি এখনও।'

'দারুণ প্রস্তাব!' সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল মুসা। 'ঠিক এ কথাটাই ভাবছিলাম আমি। ওই যে, রাস্তার ওপাশে একটা কফি বার দেখা যাচ্ছে। নতুন হয়েছে মনে হয়?'

রাস্তা পেরিয়ে কফি বারে ঢুকল ওরা। ফলের রস আর প্যাস্ট্রি আনতে বলল। উঁচু টুলে বসে গোলাকার মার্বেলে তৈরি টেবিলে কনুই রেখে খাবারের অপেক্ষা করছে মুসা। তার পাশে বসেছে কিশোর। মুরারির দিকে মুখ তুলে বলল, 'মূর্তিটা যে নকল ছিল, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালেন মুরারি। 'আমাকে যে বলেছিলে কাল, সেটা নিয়ে ভেবেছি আমি–মেডিনের ব্যাপারটা নিয়ে। বাজি ধরে বলতে পারি, বারনারকে দিয়ে আসল মূর্তিটা মারটিনই চুরি করিয়েছে। মেডিনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে বিক্রির জন্যে। টাকাটা মেরে দিয়েছে। নকল আরেকটা বাইসনের মূর্তি বানিয়ে এনে রেখে দিয়েছিল মিউজিয়ামে।'

'উঁহু,' মেনে নিতে পারল না কিশোর। 'প্যালিওন্টোলজিস্ট হিসেবে মারটিনের একটা সুখ্যাতি আছে। এতকালের কঠিন পরিশ্রম, আর মিউজিয়ামের পজিশন সামান্য কয়টা টাকার জন্যে জলাঞ্জলি তিনি দেবেন না, তা-ও চুরি করতে গিয়ে।'

নীরবে কফিবারের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন মুরারি দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। তারপর বললেন, 'তা ঠিক। বিজ্ঞানের জন্যে মারটিন নিবেদিত প্রাণ।'

'মেডিনের সঙ্গে বারনার দেখা করেছিল, এ ব্যাপারে আমরা এখন শিওর,' কিশোর বলল। 'নকল মূর্তি আর ওই দেখা করার সঙ্গে কোথাও একটা যোগসূত্র অবশ্যই আছে। তবে তাতে মারটিনও জড়িত, এটা ভাবার কোন কারণ নেই।'

'বাইসনটা কেনার ব্যাপারে রবিন কিছু জানে নাকি?' মুসা জানতে চাইল। 'ওকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়?'

'জানতেও পারে,' মুরারি বললেন। 'তাকে ফোন করা যাক। এখানে যাতে চলে আসে।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'এখনই করে আসছি।' মিনিট দুয়েক পরেই ফিরে এল চোখ-মুখ কুঁচকে। 'ফারগুসন ধরেছিলেন। তিনি বললেন, রবিন নাকি কাছেপিঠে নেই। ওর জন্যে একটা মেসেজ রেখে এসেছি। আমাদের সঙ্গে যেন দেখা করে।'

'মেসেজটা তাড়াতাড়ি পেলে ভাল হয়,' কিশোর বলল। 'কতক্ষণ বসে থাকতে হবে আমাদেরকে এখানে?'

বেশিক্ষণ থাকতে হলো না। বিশ-পঁচিশ মিনিট পরেই কফিবারের উল্টো দিকে রাস্তার ওপাশে রবিনের পুরানো ফোক্স ওয়াগেন গাড়িটা থামতে দেখল ওরা। গাড়ি থেকে নেমে রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল কফি শপের দিকে। দরজায় গিয়ে হাত নেড়ে তাকে ডাক দিল কিশোর।

'আরি, আপনিও আছেন দেখছি,' টেবিলের কাছে এসে মুরারিকে দেখে বলে উঠল রবিন। একটা টুল টেনে বসল সে-ও। 'আপনাকে এখানে দেখব কল্পনাই করিনি। শহরে কোন ভাবে ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে নাকি?'

'না।'

'তাহলে?'

'কফি শপে পরে ঢুকেছি,' জবাব দিল মুসা। 'কালকেই ঠিক করে রেখেছিলাম, আজ বেকার স্ট্রীটে দেখা করব আমরা। তোমাকেও ডেকে আনা হয়েছে আমরা যে গোপন মীটিং করছি এটা যাতে জেনে না যান ডক্টর ফারগুসন।'

ভুরু কুঁচকাল রবিন। 'তারমানে জরুরী কোন ব্যাপার আছে? কিছু ঘটেছে নাকি?'

'বাইসনের মূর্তির একটা ভাঙা টুকরো নিয়ে এসেছিলাম ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্যে,' মুরারি জানালেন। 'পরীক্ষা করে জানা গেছে ওটা নকল ছিল।'

'কি বললেন?' নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল রবিনের।

'মেডিন আর বারনারের দেখা করার সঙ্গে এই নকল মূর্তির কোন সম্পর্ক আছে,' কিশোর বলল। 'হতে পারে আসল বাইসনটা কিনে নিয়েছে মেডিন। তার জায়গায় নকল একটা দিয়ে দিয়েছে মিউজিয়ামে রাখার জন্যে। বারনার এ কাজ করেনি। সে কারও সহযোগী হিসেবে কাজ করছে। তারমানে তৃতীয় কেউ জড়িত রয়েছে এই চুরিটাতে।'

'কে?' অস্বস্তি বোধ করছে রবিন।

'মিস্টার মুরারি বলছেন মারটিন,' জবাব দিল কিশোর। 'কিন্তু আমি এ ব্যাপারে একমত হতে পারছি না।'

অবাক মনে হলো রবিনকে। 'মারটিন মূর্তি চুরি করবেন? নাহ্, আমিও বিশ্বাস করতে পারছি না এ কথা!'

'বাকি থাকলেন ডক্টর ফারগুসন, কয়েকজন রিসার্চ অ্যাসিসট্যান্ট আর গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট–যারা এখন কাজ করছে মিউজিয়ামে,' মুরারি বললেন।

'বাইরের কেউও জড়িত থাকতে পারে,' মুসা বলল।

'না, চোর বাইরে থেকে আসেনি,' মুরারি বললেন। 'মিউজিয়ামের ভেতরেরই এমন কারও কাজ এটা, যার অ্যান্টিক জালিয়াতির ব্যাপারে মোটামুটি জ্ঞান আছে।'

'সেই লোকটা কে, কি করে খুঁজে বের করব আমরা?' রবিনের প্রশ্ন।

'আমার বিশ্বাস,' কিশোর বলল, 'মেডিনের কাছে পাওয়া যাবে এর জবাব। বারনার কার হয়ে কাজ করছে, জানা আছে তার।'

'কিন্তু সেটা তো আমাদের কাছে ফাঁস করবে না সে,' মুরারি বললেন।

'উপায় একটা আছে,' নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে বলল কিশোর। 'যদি রবিন আমাদের সাহায্য করে।'

'বলে ফেলো,' রবিন বলল।

'তোমাকে এমন ভান করতে হবে, যেন মেডিনের কাছ থেকে জিনিস কিনতে গেছ,' কিশোর বলল। 'সহকারী হিসেবে আমি আর মুসাও যাব তোমার সঙ্গে। আমাদের কাউকেই চিনতে পারবে না সে। এমন কিছু বলে ফেলতে পারে সে, কিংবা এমন কিছু চোখে পড়ে যেতে পারে আমাদের, যেটা জরুরী সূত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।'

'মেডিনের মত লোকেরা ভীষণ ধূর্ত হয়। কি করে নিজেদের বাঁচাতে হয়, জানে ওরা।'

'সবই জানি,' কিশোর বলল। 'কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?'

'আর কিছু না হোক,' মুরারি বললেন, 'অন্তত এটা তো বুঝতে পারব কোন ধরনের লোকের পেছনে লাগতে যাচ্ছি আমরা।'

'সেটা আমি এখনই বলে দিতে পারি। চোরাই মালের ব্যবসা করে যেহেতু, ভাল লোক হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।' ভারী দম নিল রবিন। কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'যাই হোক, আমি যেতে রাজি। কখন যেতে চাও?'

'এখনই গেলে কেমন হয়?'

'এখন!' কপালে ভাঁজ পড়ল রবিনের। কাছাকাছি হলো ভুরু জোড়া।

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফেলো,' কিশোর বলল। 'ফোন বুক থেকে ওর নম্বরটা টুকে রেখেছি আমি।' এক টুকরো কাগজ রবিনের হাতে তুলে দিল সে।

রবিন উঠে ফোন করতে চলে গেল।

ফিরে এল কয়েক মিনিট পর। অবাক হয়েছে। 'এক কথাতেই রাজি হয়ে গেল মেডিন। যেতে বলেছে। এত সহজে হয়ে যাবে কল্পনাই করিনি।'

উঠে দাঁড়ালেন মুরারি। 'আমি যাই। কি হয় জানিও। সাবধান থেকো। মেডিনকে বিশ্বাস নেই।' তিন গোয়েন্দাকে গুড-বাই জানিয়ে কফি শপ থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। মিউজিয়ামে ফিরে যাবেন।

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে একটা প্যাস্ট্রি তুলে নিয়ে কামড় বসাল রবিন।

'রবিনের গাড়িতে করেই চলে যাই,' মুসাকে বলল কিশোর। 'তোমারটাও নিয়ে গিয়ে ঝামেলা বাধানোর কোন মানে হয় না।'

'ফারগুসন তোমাকে খোঁজাখুঁজি করবেন না তো?' মুসা জিজ্ঞেস করল রবিনকে।

'না, তা করবেন না। বলেই এসেছি, কাজ আছে। ফিরতে কিছুটা দেরি হবে।'

বেরিয়ে পড়ল ওরা। রবিনের গাড়িতে করে রওনা হলো মেডিনের বাড়িতে। গাড়ি চালাচ্ছে রবিন। রাস্তা বলে দিতে লাগল মুসা।

গেটের কাছে এসে গাড়ি থামাল রবিন। ছোট একটা টেলিভিশন ক্যামেরা চোখে পড়ল তিনজনেরই। লুকানো স্পীকার থেকে কথা শোনা গেল। ওদের পরিচয় জানতে চাইছে।

জানালা দিয়ে গলা বের করে দিল রবিন। 'আমি রবিন মিলফোর্ড। মিস্টার মেডিনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

ইলেকট্রিক সিসটেমে নিয়ন্ত্রিত গেটটা খুলে গেল। গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়ল রবিন। এগিয়ে চলল বাড়ির সামনের গাড়ি-বারান্দার দিকে।

গাড়ি থেকে নামল ওরা। দরজা খুলে বেরিয়ে এল বিশালদেহী একজন লোক। লোকটাকে চিনতে পারল মুসা। সে-রাতে একেই দেখেছিল দোতলার জানালায়। লোকটা এখন ওকে চিনে না ফেললেই বাঁচে।

'মিস্টার মেডিন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'মিস্টার মেডিন তোমাদের অপেক্ষাই করছেন।'

ওদেরকে বড় একটা লিভিং রুমের দরজায় নিয়ে এল লোকটা। ঘরের সব কিছুই সাদা। দেয়াল সাদা, জিনিসপত্র সাদা। সমস্ত অলঙ্করণ যতটা সম্ভব সাদা রঙ করা।

তুষার শুভ্র সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল একজন হালকা-পাতলা লোক। কালো চুল। কালো চোখ। বয়েস পঞ্চাশ মত হবে।

'আমি ডেভন মেডিন,' মসৃণ মোলায়েম কণ্ঠস্বর লোকটার। 'এসো। প্লীজ।'

'থ্যাংক ইউ,' জবাব দিল রবিন। সাবধানে সাদা কার্পেটের ওপর দিয়ে এগোল। ময়লা লেগে যাওয়ার ভয়ে অস্বস্তি বোধ করছে। মুসা আর রবিন চলল তার পেছনে।

'চা খাবে?' ওদের জবাবের অপেক্ষা না করেই লোকটার দিকে তাকিয়ে মেডিন বলল, 'রেমন্ড, চা, প্লীজ।'

মাথা নুইয়ে বাউ করে চলে গেল বিশালদেহী লোকটা।

ঘরের চারপাশে চোখ বোলাতে লাগল কিশোর। আর্ট গ্যালারির মত লাগছে ঘরটা। নানা রকম অ্যান্টিক দেখা যাচ্ছে। বোর্নিওর সেপিক রিভার থেকে আনা উপজাতীয়দের মুখোশ, ক্যাম্বোডিয়ার খমের ভাস্কর্য, গ্রীসের আরকাইক যুগের অনেকগুলো মূর্তি। ঘরের কেন্দ্রে কাঁচের একটা

কফি টেবিলকে ঘিরে রাখা কয়েকটা বড় বড় চেয়ার আর অতিকায় দুটো সোফা।

নিজের সহকারী হিসেবে মুসা আর কিশোরের পরিচয় দিল রবিন। একটা সোফায় বসে পড়ল ওদেরকে নিয়ে।

'দারুণ সংগ্রহ তো আপনার,' রবিন বলল।

'থ্যাংক ইউ,' হাসল মেডিন। 'এগুলোই আমার গর্ব। তবে সবই এখানে বিক্রির জন্যে।'

'আমার আগ্রহ প্যালিওলিথিক আর্টে,' রবিন জানাল।

'আরও স্পষ্ট করে বলো,' মেডিন বলল। 'প্যালিওলিথিক আর্ট অনেক কিছুই মীন করে।'

'এই যেমন ধরা যাক, দক্ষিণ ফ্রান্সের ক্রো-ম্যাগনন মানুষের তৈরি কোনও হাড়ের কাজ। আছে আপনার কাছে?'

পাতলা হাসি ফুটল মেডিনের মুখে। মাথা ঝাঁকাল। 'আমার কাছে এখানে নেই। তবে জোগাড় করতে পারি। অনেক জায়গায় চেনাজানা আছে আমার। যোগাযোগ আছে সারা পৃথিবী জুড়ে। তা টাকা কি পরিমাণ খরচ করতে পারবে?'

'জিনিসটা আমার নিজের জন্যে নয়,' রবিন বলল। 'একজন আমাকে পাঠিয়েছেন। যে কোন মূল্য দিতে রাজি আছেন তিনি।...আপনি যত চান।'

ফিরে এল রেমন্ড। হাতের ট্রে'তে চীনামাটির টীপট, কাপ, পিরিচ। নামিয়ে রাখল কফি টেবিলটার ওপর।

'এই টীপটটা কি চীনা অ্যান্টিক?' জানতে চাইল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল মেডিন। 'চিয়েন লাঙের সময়কার।'

ঘরের দেয়ালে সাজানো মুখোশ আর পেইন্টিংগুলোর দিকে তাকাচ্ছে কিশোর। মেডিনকে জিজ্ঞেস করল, 'ঘুরে ঘুরে যদি দেখি ওগুলো, কোন আপত্তি আছে আপনার?'

'মোটেও না,' মেডিন বলল।

উঠে গেল কিশোর। মুসা আর রবিন বসে রইল আগের জায়গায়। মেডিনের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। ঘুরে ঘুরে দেখার ছুতোয় সূত্র খুঁজতে শুরু করল কিশোর।

ঘরের শেষ প্রান্তে চলে এল সে। লিভিং রুম ঘেঁষে ছোট একটা অফিস চোখে পড়ল। ডেস্কের ওপর ফাইলপত্রের স্তূপ। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল কিশোর। রেমন্ড নেই। চলে গেছে লিভিং রুম থেকে। রবিন, মুসা আর মেডিন আগের মতই বসে কথা বলছে। এদিকে পেছন ফিরে আছে মেডিন।

ধীরে ধীরে অফিসের দরজার দিকে সরে যেতে শুরু করল কিশোর। তারপর চট করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। একটা মুহূর্তও দেরি না করে

কাগজপত্রগুলো ঘাঁটতে শুরু করল। সূত্রটা পেতে দেরি হলো না। বরং এত তাড়াতাড়ি পেয়ে যাওয়াতে অবাকই হলো। একটা খামের ওপর ইংরেজিতে যা লেখা রয়েছে তার বাংলা করলে দাঁড়ায়: ক্রো-ম্যাগনন আমলের বাইসনের মূর্তি।

দ্রুত হাতে খামটা খুলে পাতা ওল্টাতে শুরু করল সে। থেমে গেল আচমকা। সজাগ হয়ে উঠেছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। ঘাড়ের রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। মনে হলো পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ।

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। সরু দরজাটা জুড়ে রেখেছে রেমন্ডের বিশাল বপু।

চোদ্দ

রেমন্ড এতটাই লম্বা, তার মাথার খাটো করে ছাঁটা সোনালি চুলগুলোও দরজার ফ্রেমের ওপরটা ছুঁয়ে আছে। বিশালদেহী লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাতে লাগল কিশোর।

'ওটা রাখো তুমি,' গুড়গুড় করে মেঘের গর্জন বেরিয়ে এল যেন রেমন্ডের গলা দিয়ে।

'ও, এটা,' হাতের খামটার দিকে তাকিয়ে জোর করে মুখে হাসি ফোটাল কিশোর। 'এটা আমি মিস্টার মেডিনের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম।'

'রাখো ওখানে,' কঠিন কণ্ঠে আদেশ দিল রেমন্ড। সাগর কলার মত মোটা মোটা আঙুলগুলো মুঠোবদ্ধ হয়ে এল তার।

তর্ক না করাটাই ভাল মনে করল কিশোর। লোকটা যা করতে বলল করল। খামটা টেবিলে রাখার জন্যে ঘুরল। দেহ দিয়ে খামটাকে আড়াল করে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল। কয়েকটা ছোট ছোট কাগজের পাতা হাতে ঠেকল। রেমন্ডের অলক্ষে বের করে এনে ঢুকিয়ে ফেলল নিজের শার্টের ভেতরে। তারপর খামটা নামিয়ে রেখে হাসিমুখে ঘুরে দাঁড়াল।

'থ্যাংক ইউ,' মুখটাকে গোমড়া করে রেখে বলল রেমন্ড। 'চলো এখন, লিভিং রুমে যাওয়া যাক।' দরজার কাছ থেকে সরে গিয়ে জায়গা করে দিল সে।

যা করতে বলা হলো, বিনাবাক্যব্যয়ে করল এরপর কিশোর। এ ভাবে ধরা পড়ে যাওয়ায় গাধা মনে হচ্ছে নিজেকে। মেডিনের কানে কানে গিয়ে কিছু বলল রেমন্ড।

চোখের পাতা সরু হয়ে এল মেডিনের। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি গোয়েন্দাকে বলল, 'আমার ভদ্রতার সুযোগ নিয়েছ তোমরা। আমার বিশ্বাস নষ্ট করেছ। এ ধরনের মানুষের সঙ্গে আমি কারবার করি না।

তোমরা এখন যেতে পারো। রেমন্ড, বের করে দিয়ে এসো ওদের।'

মুসা আর রবিনও উঠে দাঁড়াল। কিশোরের দিকে তাকাল। মেডিনের দিকে ফিরল রবিন। 'বেশ, যাচ্ছি। অন্য কারও কাছ থেকে কিনে নেব। অসুবিধে আছে নাকি।'

শীতল দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে মেডিন বলল, 'নিশ্চয় কোন কুমতলব ছিল তোমাদের। তবে আমিও সাবধানে থাকব, যাতে কোন শয়তানি করতে না পারো।'

দরজা খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রেমন্ড। দ্রুত বেরিয়ে এসে রবিনের গাড়িতে উঠল তিন গোয়েন্দা।

'জলদি করো, রবিন,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'পালানো দরকার। কখন মত বদলে ফেলে রেমন্ড, বলা যায় না। দেখা গেল, অত সহজে আর আমাদের যেতে দিতে মন চাইছে না ওর।'

স্টার্ট দিয়ে গেটের দিকে দ্রুত গাড়ি চালাল রবিন। গেটের কাছাকাছি হতে আপনাআপনি খুলে গেল ইলেকট্রনিক দরজা। বেরিয়ে এল গাড়ি। চেপে রাখা দমটা হুস করে ছাড়ল রবিন। বলল, 'আহ্, বাঁচলাম। ওই মেডিন লোকটাকে মোটেও ভাল্লাগছিল না আমার।'

পেছনের সীটে বসা কিশোরের দিকে ঘুরে তাকাল মুসা। 'অত রাগল কেন রেমন্ড? কি করেছিলে?'

বিমল হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। সোয়েটারের নিচে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল একমুঠো কাগজ। 'এগুলো সরিয়েছি মেডিনের অফিস থেকে। ক্রো-ম্যাগনন বাইসনের মূর্তি লেখা একটা খামের মধ্যে ছিল।'

কাগজগুলো ঘাঁটতে শুরু করল কিশোর। একটা কাগজ হাতে নিয়ে মাথা দুলিয়ে বলল, 'হুঁ। প্যালিওলিথিক বাইসনের মূর্তি বিক্রির বিল এটা। সই দেখা যাচ্ছে দু'জনের, ক্যারি নিউম্যান আর এন্ডার ফারগুসন।'

'ক্যারি নিউম্যানটা কে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

জবাবটা দিল রবিন, 'ডক্টর ফারগুসনের কাছে' কয়েকবার ফোন করেছে। মনে আছে, প্রথম যেদিন তোমাদেরকে ফারগুসনের সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে গিয়েছিলাম, একজন মহিলার সঙ্গে তর্কাতর্কি করছিলেন তিনি? আমার ধারণা ওই মহিলাই ক্যারি নিউম্যান। তার সঙ্গে কখনও পরিচয় হয়নি আমার। তবে ফারগুসনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকে আমি নামটা দেখেছি।'

তুড়ি বাজাল মুসা। 'মনে পড়েছে। সৈকতে দেখা সেই মেয়েলোকটা। সে-রাতে মেডিনের সঙ্গে যাকে দেখেছিলাম। লাল চুল। এ জন্যেই চেনা চেনা লাগছিল মহিলাটাকে।'

'ক্যারি নিশ্চয় মেডিনের অ্যাসিসট্যান্ট,' কিশোর বলল। 'চোরাই মাল বেচাকেনার দায়িত্ব তার ওপর।'

'কিন্তু, বিলটাতে প্রমাণ হয় বাইসনের মূর্তিটাই শুধু বেচেছে মেডিন,'

রবিন বলল। 'ওটা আসল না নকল, সে-কথা কিছু লেখা নেই। না জেনে নকলটাও কিনে থাকতে পারেন ফারগুসন। মেডিন তাঁকে ঠকিয়েছে।'

'সেটা হতেই পারে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কিন্তু মনে করে দেখো, ভাঙা টুকরোগুলো ব্যাগে ভরে নিয়ে গেছেন ফারগুসন। যে ভাবে তুলেছেন, সাধারণ মাটি হলেই কেবল ওভাবে তোলা সম্ভব, তাঁর মত একজন প্যালিওন্টোলজিস্টের পক্ষে। আসল জিনিস হলে অনেক যত্ন করে, অনেক সাবধানে তুলতেন। তাতে কি প্রমাণ হয়? মূর্তিটা যে নকল, তিনি জানতেন।'

'তার মানে ওটা যে নকল জিনিস, জানা ছিল তাঁর,' মুসা বলল।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। 'কিন্তু নকল জিনিস কেন কিনতে যাবেন তিনি?' একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'জিনিসটা ছিল নোরা ইভানের এক্সিবিটের অংশ। তিনি কিছু করেননি তো?'

'না,' জবাব দিল কিশোর। 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নোরার অবর্তমানে জিনিসটা কিনেছেন ডক্টর ফারগুসন।'

'দেখি, বিলটা,' হাত বাড়াল রবিন।

গাড়ি থামিয়ে হাতে নিয়ে বিলটা দেখতে লাগল সে। 'মে'র পনেরো তারিখ। তার আগেই নোরা ইভান মিউজিয়াম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।' ভ্রূকুটি করল সে। 'আর ওই সপ্তাহে মারটিনও চলে গিয়েছিলেন একটা কনফারেন্সে। সে-সময় দু'জনেরই অবর্তমানে জিনিসটা কিনে এনেছেন ফারগুসন।'

'এর মধ্যে বারনারের সম্পর্কটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ফারগুসনই নিশ্চয় ওকে মেডিনের কাছে পাঠিয়েছেন,' জবাব দিল কিশোর। 'নতুন কোন মাল কেনার জন্যে।'

'বারনারকে মাল কেনার দায়িত্ব দিয়েছেন? বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।'

'কিংবা হয়তো ফারগুসনের মেসেজ নিয়ে গিয়েছিল সে। আপাতত সেটা আমাদের সমস্যা নয়। ফারগুসনকে ধরা দরকার।' মৃদু হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। 'একটা বুদ্ধিও বের করে ফেলেছি। মুরারিকে দরকার এখন আমাদের।'

মিউজিয়ামে ফিরে সোজা ডাইনোসর পার্কের দিকে রওনা হলো ওরা। কন্ট্রোল রূমে বসে থাকতে দেখা গেল মুরারিকে। গভীর মনোযোগে তাকিয়ে আছেন কম্পিউটারের স্ক্রীনের দিকে। সব কথা শোনার পর তিনি বললেন, 'ফারগুসনকে এখন ধরা যায় কি করে?'

'বুদ্ধিটা হয়তো আপনার পছন্দ হবে না,' কিশোর বলল। 'কারণ এ কাজে মারটিনকেও প্রয়োজন হবে আমাদের।'

গুঙিয়ে উঠলেন মুরারি। 'মারটিন? রক্ষে করো!'

'আগে আমার কথাটা শুনুন,' হাত তুলল কিশোর। 'সব কথা গিয়ে মারটিনকে জানাব আমরা। তারপর তাঁকে দিয়ে ফারগুসনকে বলাব, বাইসনের মূর্তিটা নকল ছিল।'

'তাতে কি হবে?'

'আমার ধারণা, তাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়বেন ফারগুসন। কিছু একটা

করতে গিয়ে ভুল করে বসবেন।'

'হুঁ, তা ঠিক,' মাথা দুলিয়ে বললেন মুরারি। 'ফারগুসনকে ভয় দেখানোর জন্যে মারটিনই উপযুক্ত লোক। নোরা ইভানকে বাদ দিলে এখানে প্যালিওলিথিক আর্টে ও-ই বিশেষজ্ঞ। আমি এ জিনিসগুলোর কিছুই বুঝি না।'

'জিনিসটা যে নকল তাহলে বুঝলেন কি করে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

হেসে উঠলেন মুরারি। 'স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়ে। যদি মাটির কোন জিনিসের বাইরেটা অনেক পুরানো হয়, ভেতরটাও পুরানো হতে বাধ্য। ভেতরটা বাইরের চেয়ে নতুন মনে হলে বুঝতে হবে জিনিসটা বেশি পুরানো নয়। তারমানে প্রাগৈতিহাসিক কালের নয়। নকল। এটা অবশ্য আমার ধারণা।'

'আপনার ধারণাটাই তো এখন ঠিক হয়ে গেল দেখা যাচ্ছে,' রবিন বলল। বন্ধুদের দিকে তাকাল। 'তাহলে আর দেরি করছি কেন আমরা? চলো, মারটিনের সঙ্গে কথা বলি।'

ওদেরকে অবাক করে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মুরারি। 'চলো, আমিও যাচ্ছি।'

দল বেঁধে ফসিল হলের দিকে চলল চারজনে। একসঙ্গে ওদেরকে দেখে মারটিন তো অবাক। রবিন বলল, 'মিস্টার মারটিন, আপনার সঙ্গে আমাদের জরুরী কথা আছে। ভয় নেই, বেশি সময় নষ্ট করব না আপনার। একটা কাজ করে দিতে হবে আপনাকে।'

'আমাকে কাজ করে দিতে হবে?' আড়চোখে মুরারির দিকে তাকাতে লাগলেন তিনি।

'এখানকার কিছু জঞ্জাল সাফ করতে আপনার সাহায্য দরকার।' সব কথা খুলে বলল রবিন। মেডিনের ওখানে যাওয়া থেকে শুরু করে, বিলটার কথা পর্যন্ত। তারপর জিজ্ঞেস করল, ফারগুসনের সঙ্গে তিনি এ ব্যাপারে কথা বলতে রাজি আছেন কিনা।

হাসি ফুটল মারটিনের ঠোঁটে। 'করব না মানে? সন্দেহটা আমারও হয়েছিল।'

'এখন তো একসঙ্গে কাজ করতে হচ্ছে আমাদের। মিলমিশ ছাড়া হবে না।' মুরারিকে দেখাল রবিন, 'আপনাদের দু'জনের ঝগড়াটার কি হবে এখন?'

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলেন মারটিন আর মুরারি। স্কুলে পড়ুয়া ছেলে ঝগড়া করে আড়ি দিলে যে ভঙ্গি করে, দু'জনের মুখে সে-রকম ভঙ্গি। বিব্রত স্বরে জবাব দিলেন মারটিন, 'ও ম্যানেজ করে নেব।'

মুরারি বললেন, 'আমারও কোন সমস্যা হবে না।'

'চলুন তাহলে, যাওয়া যাক,' কিশোর বলল।

'এখনই?' মারটিন জিজ্ঞেস করলেন।

'মিস্টার ফারগুসন এখন অফিসেই আছেন। তাঁকে ধরার এটাই

সুযোগ। আপনি যান। আমরা এখানে অপেক্ষা করছি।'

পনেরো মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলেন মারটিন।

'কি খবর?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

প্রচুর ব্যবহৃত চেয়ারটায় বসে পড়লেন মারটিন। 'ফারগুসনকে আমি বললাম, বাইসনটা নকল বলে সন্দেহ হচ্ছে আমার। টুকরোগুলো দরকার, পরীক্ষা করানোর জন্যে। মনে মনে যে ঘাবড়ে গেছেন বোঝাই গেল, যদিও মুখে সেটা প্রকাশ করলেন না। জবাব দিতে গিয়ে কথা আটকে যেতে থাকল। শেষমেষ উঠে পায়চারি শুরু করলেন। আমাকে উদ্বিগ্ন হতে মানা করে দিলেন। তিনি নিজেই নাকি সেগুলো পরীক্ষা করতে নিয়ে যাবার কথা ভাবছেন।' হাসলেন তিনি। 'এখন কি করা?'

'আমার বিশ্বাস, টুকরোগুলোকে নষ্ট করে ফেলার চেষ্টা করবেন ফারগুসন,' কিশোর বলল।

'তাহলে তো বীমার টাকা পাব না,' রবিন বলল। 'বীমা কোম্পানিকে তিনি দেখাবেন না ওগুলো?'

'তা আর মনে হয় না। কারণ, এখন নিশ্চয় মনে পড়ে গেছে তাঁর, বীমা কোম্পানিও ওগুলো পরীক্ষা না করিয়ে তাঁকে টাকা দেবে না।'

'কি ভাবে নষ্ট করবেন বলে মনে হয় তোমার?' মুরারি জিজ্ঞেস করলেন।

'বুঝতে পারছি না,' নিচের ঠোঁট টান দিয়ে ধরে ছেড়ে দিল কিশোর। 'তবে অফিসের মধ্যে কিছু করার ঝুঁকি নেবেন বলে মনে হয় না। যা করার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইঙের বাইরে গিয়েই করবেন।'

'এবং নিশ্চয় সেটা আজকে রাতেই,' মুসা বলে উঠল।

'হ্যাঁ। মিউজিয়াম বন্ধ হওয়ার আগে কিছু করবেন না,' একমত হলেন মুরারি।

'কিন্তু তাঁকে ধরছি কি করে আমরা?' প্রশ্ন করলেন মারটিন।

ঘড়ি দেখল কিশোর। 'আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মিউজিয়াম ছুটি হয়ে যাবে। এখনই বেরিয়ে যাই আমরা। কিন্তু বেশি দূরে যাব না। পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঘুরে বনের কিনারে এসে লুকিয়ে বসে থাকব। গাছের আড়াল থেকে নজর রাখব মিউজিয়ামের দিকে।'

ভ্রূকুটি করলেন মুরারি। 'এ ভাবে কতখানি কি কাজ হবে বুঝতে পারছি না। তবে এ ছাড়া আর কোন উপায়ও দেখছি না। কি বলো তোমরা?'

রবিন আর মারটিনও তাঁর সঙ্গে একমত হলেন। এক এক করে মিউজিয়ামের সামনের গেট দিয়ে বেরিয়ে যেতে শুরু করল ওরা। কিছুদূর গিয়ে একটা সরু রাস্তা ধরে ফিরে এল বনের কিনারে। রাতের বেলা যে রাস্তাটা দিয়ে কিশোর আর মুসা এগিয়েছিল সেদিন, সেটা ধরে নিঃশব্দে এগোল এখন সবাই। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইঙের কাছাকাছি এসে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসল।

'যদি এখন মিউজিয়ামের ভেতর বসেই টুকরোগুলো নষ্ট করে ফেলেন?' রবিন বলল, 'কিছুই দেখতে পার না আমরা।'

'আমার মনে হয় করবেন না,' কিশোর বলল। 'সবাই বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। ঝুঁকি নিতে চাইবেন না।' সঙ্গে করে দূরবীন নিয়ে আসাতে কাজে লাগল এখন। চোখে লাগিয়ে পুরো বাড়িটায় একবার নজর বুলিয়ে আনল সে। পুরো দশটা মিনিট কোথাও কোন নড়াচড়া চোখে পড়ল না।

'অকারণেই বোধহয় বসে বসে সময় নষ্ট করছি আমরা,' মারটিন বললেন।

'দেখাই যাক না কি হয়,' রবিন বলল।

'দাঁড়াও দাঁড়াও, চুপ!' দূরবীনের মধ্যে দিয়ে দেখতে দেখতে বলল কিশোর, 'ফসিল উইঙের ভেতর থেকে বেরোচ্ছেন ফারগুসন। হাতে ব্যাগ। আমি শিওর, টুকরোগুলো ওতে আছে।'

ঝোপের ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করতে লাগল সবাই। দূরবীনটা এক এক করে সবার হাতেই ধরিয়ে দেয়া হলো, যাতে সবাইই ভালমত দেখতে পায়।

রবিন দেখল, ভাঙা ওঅর্কশপটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ফারগুসন। কনস্ট্রাকশনের শ্রমিকরা মস্ত একটা গর্ত খুঁড়ে রেখেছে ওখানে। নতুন আরেকটা বিল্ডিঙের ভিত গাঁথা হবে। সেই গর্তের মধ্যে ব্যাগের জিনিসগুলো ঢেলে দিলেন তিনি। ফিরে গেলেন আবার অফিসে। হাতে করে আরও ব্যাগ নিয়ে এলেন। গর্তে ফেললেন। এ ভাবে সবগুলো ব্যাগ এনে গর্তে ফেলার পর কয়েক ব্যাগ সিমেন্ট ঢাললেন কাছেই রাখা একটা সিমেন্ট গোলানোর বড় পাত্রে। হোস পাইপ দিয়ে তাতে পানি দিলেন। সুরকি ঢেলে মেশানো শুরু করলেন। গোলানো প্রায় হয়ে এসেছে, জিরানোর জন্যে থামলেন ফারগুসন, এ সময় রবিন বলে উঠল, 'যাওয়ার সময় হয়েছে। আর দেরি করলে সিমেন্ট দিয়ে ঢেকে ফেলবেন।'

সবার আগে উঠে দৌড় মারল মুসা। তার পেছনে রবিন আর কিশোর। বাকি দু'জন ওদের পেছনে।

এখনও সিমেন্ট গোলাচ্ছেন ফারগুসন। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছেন। নিজের কাজের দিকে মনোযোগ। অন্য কোনদিকে তাকাচ্ছেন না। গোধূলীর আবছা আলোয় দেখতেও পেলেন না পেছন থেকে যে তাঁর দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে পাঁচজন মানুষ।

একদম ঘাড়ের কাছে গিয়ে বলে উঠলেন মারটিন, 'প্রমাণ নষ্ট করে দিতে চাইছেন, তাই না?'

এতটাই চমকে গেলেন ফারগুসন, হাত থেকে খসে পড়ে গেল বেলচাটা। 'কে?' ফিরে তাকালেন তিনি। এক মুখ থেকে আরেক মুখে ঘুরে বেড়াতে থাকল তাঁর বিস্মিত দৃষ্টি। 'প্রমাণ? কিসের কথা বলছ তোমরা?'

হাত তুলে গর্তটা দেখাল কিশোর। 'ওই যে প্রমাণ, যেটা আপনি সিমেন্ট দিয়ে ঢেকে দিতে চাচ্ছেন।'

'তুমি···কি বলছ, কিছু বুঝতে পারছি না।' গর্তটার সামনে সরে এলেন ফারগুসন, যেন আড়াল করে ফেলতে চান সমস্ত কুকর্মকে।

'ডক্টর ফারগুসন,' বিষণ্ন কণ্ঠে রবিন বলল, 'বাইসনের ভাস্কর্যের টুকরোগুলো গর্তে ছুঁড়ে ফেলেছেন যে, সবই দেখেছি আমরা। সিমেন্ট গোলাচ্ছেন, তা-ও দেখেছি। বলতে পারেন, মিউজিয়ামের একজন কিউরেটর রাজমিস্ত্রীর কাজ করতে যাবে কেন?'

'আমি···অ, রাজমিস্ত্রী···' হেসে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করলেন ফারগুসন। বোকার মত দেখাল হাসিটা। 'অকারণে এখন এ সব সাধারণ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন মানে হয় না। বাড়ি চলে যাও তোমরা। কাল সকালে বরং এটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে।'

'তখন আর আলোচনা করার দরকার পড়বে না, মিস্টার ফারগুসন। তা ছাড়া এখন প্রমাণগুলোকে সিমেন্ট চাপা দিয়েও লাভ হবে না,' কিশোর বলল। 'মেডিনের পাঠানো বিলটার নকল আছে আমাদের কাছে। তারিখটাই বলে দেয় ওই সময় আপনি ছাড়া মিউজিয়ামে আর কেনার কেউ ছিল না।'

'ভাঙা একটা টুকরো নিয়ে গিয়ে ইতিমধ্যেই পরীক্ষাও করিয়ে ফেলেছি আমরা,' মুরারি বললেন। 'আমরা জানি, মূর্তিটা নকল ছিল। আসলটা কোথায়? চুরি করেছেন?'

দিশেহারা ভঙ্গিতে মুরারির দিক থেকে কিশোরের দিকে, তারপর রবিনের দিকে তাকালেন ফারগুসন। এক পা আগে বাড়লেন। আবার পিছিয়ে গেলেন। তাঁর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ফাঁদে আটকা পড়া জানোয়ার। আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড়াতে শুরু করলেন তিনি।

'কিশোর!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'পালাচ্ছে তো!'

পনেরো

ডিরেক্টরকে ধরার জন্যে ঝাঁপ দিল মুসা। সরে যাবার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু কপাল মন্দ, পা বেধে গেল মাটিতে পড়ে থাকা হোস পাইপে। মাথা নিচু করে ডাইভ দেয়ার মত করে উড়ে গিয়ে পড়লেন গর্তের মাঝে।

মাথা সহ দেহের সামনের অংশটা গর্তের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল তাঁর। কেবল পা দুটো বেরিয়ে আছে বাইরে।

দৌড়ে এল তিন গোয়েন্দা। তাঁর দুই পা চেপে ধরে তিনজনে মিলে টানতে শুরু করল।

গর্ত থেকে তুলে আনা হলো ফারগুসনকে। মুখ, মাথা কাদায়

মাখামাখি।

'ধোয়া দরকার,' বলেই গিয়ে ম্যাটিতে পড়ে থাকা হোসটা তুলে নিল রবিন। মুখটা ফারগুসনের দিকে তাক করে চাবি ঘুরিয়ে দিল।

নাকে মুখে ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা লাগতে চিৎকার করে উঠলেন ফারগুসন। কাশতে কাশতে উঠে বসলেন। পাইপের পানি আর মারটিনের বড় রুমাল দিয়ে ফারগুসনের মুখটা কোনমতে পরিষ্কার করে দিল রবিন, যাতে তিনি কথা বলতে পারেন।

'ঠিক হয়েছেন এখন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ঠিক আর থাকি কি করে!' কোনমতে কথাগুলো বের করে দিলেন ফারগুসন।

'চলুন, আপনার অফিসে যাই,' কিশোর বলল। 'ওখানেই কথা বলতে সুবিধে।'

উঠে দাঁড়ালেন ফারগুসন। ভেজা, দোমড়ানো কাপড়-চোপড় টেনেটুনে সিধে করার চেষ্টা করলেন। তারপর যতটা সম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখে টলতে টলতে রওনা হলেন নিজের অফিসের দিকে। বাকি সবাই অনুসরণ করল তাঁকে।

অফিসে ঢুকে নিজের চেয়ারে নেতিয়ে পড়লেন তিনি। গা থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরে পড়তে লাগল চতুর্দিকে।

'হ্যাঁ,' ভারী গলায় বললেন, 'গর্তের মধ্যে বাইসনের টুকরোগুলোই লুকাতে গিয়েছিলাম। তবে মিউজিয়ামের ক্ষতি করার কোন ইচ্ছে ছিল না আমার।' কাদা আর পানিতে ভিজে লাল হয়ে যাওয়া চোখ মেলে সবার দিকে তাকাতে লাগলেন তিনি। 'বিশ্বাস করো।'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিলেন ডিরেক্টর। 'মেডিনের কাছে বাইসনের মূর্তিটা দেখে লোভ সামলাতে পারিনি। নোরা নেই, মারটিনও ছিল না সে-সময়। অন্য কোন মিউজিয়াম নিয়ে যেতে পারে ভেবে ভালমত না দেখে তাড়াহুড়া করে কিনে ফেলেছিলাম। দামী একটা জিনিস, বাজার দরের চেয়ে অনেক কমে দিয়ে দিল। ভুলে গিয়েছিলাম অতিরিক্ত লাভের আশ্বাস কিংবা লোভ থাকে যেখানে, সেখানে ঘাপলা থাকতে বাধ্য। ক্যারি জিনিসটার প্রশংসা করে করে আমার মুণ্ডুটাই ঘুরিয়ে দিয়েছিল। কল্পনাই করিনি জিনিসটা নকল হতে পারে। কারণ তখনও জানতাম না দুই নম্বরী জিনিসের ব্যবসা করে মেডিন।'

'তারমানে কেনার সময় আপনি জানতেন না ওটা নকল ছিল,' কিশোর বলল।

'না,' ফারগুসন বললেন। 'মিউজিয়ামে আনার পর মনে হলো, তাই তো, দেখি না পরীক্ষা করে। আর করতে গিয়েই ধরাটা পড়ল। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তখন। টাকা-পয়সা সব দিয়ে দিয়েছি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'জিনিসটা নকল জানার পর ওটা নষ্ট করার

সিদ্ধান্ত নিলাম। ভাবলাম, এমন ভাবে করতে হবে কাজটা যাতে অ্যাক্সিডেন্ট মনে হয়। তাহলে টাকাটা আদায় করতে পারব বীমা কোম্পানির কাছ থেকে। এত বড় ঠকা খেয়ে মগজটা এমনই খারাপ হয়ে গিয়েছিল, বীমা কোম্পানিও যে টাকা দেয়ার আগে পরীক্ষা করে দেখতে পারে, এ কথাটাও ভুলে গিয়েছিলাম।'

'আর এসবে সহায়তা করার জন্যে বারনারকে দলে টানলেন,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ। এবং জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করলাম,' তিক্তকণ্ঠে বললেন ফারগুসন। 'যতবার জিনিসটা নষ্ট করার চেষ্টা করেছে, ততবার জটকট পাকিয়েছে। যা করতে বলেছি, কোনটাতেই সফল হতে পারেনি। বাড়াবাড়িও করেছে। ওকে শুধু মূর্তিটা নষ্ট করতে বলেছিলাম। মানুষের জীবনের ওপর হামলা করতে নয়।'

'গাড়ি দিয়ে ধাক্কা মেরে আমাদেরকে রাস্তা থেকে ফেলে দিতে চেয়েছিল লোকটা,' রাগত স্বরে বলল মুসা। 'আরেকটু হলেই খাদে পড়ে মরতাম সেদিন।'

দু' হাতে মাথা চেপে ধরলেন ফারগুসন। চোখের পাতা বোজা। 'বিশ্বাস করো। এ সব কোন কিছুই ওকে করতে বলিনি আমি। নিজে থেকেই করেছে সব।'

'নিশ্চয় সে ভেবেছিল এ সব করলে আপনি খুশি হবেন,' রবিন বলল। 'কিন্তু বাইসনটা নষ্ট করতে ওকে রাজি করালেন কি করে?'

'চাকরিতে নেয়ার সময় ওর রেফারেন্স চেক করার কথা ভাবিনি,' ফারগুসন বললেন। 'ব্যাপারটা তখন মোটেও জরুরী মনে হয়নি আমার কাছে। কিন্তু যখন চেক করতে গেলাম, জানলাম, আগের কাজগুলোর কথা মিথ্যে বলেছে সে। অবহেলা আর অযোগ্যতার কারণে বেশির ভাগ চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে ওকে। তাই যখন বাইসনটাকে নষ্ট করার প্রয়োজন পড়ল, বুঝলাম, আমাকে সাহায্য করতে ওকেই দরকার। চাপ দিয়ে, ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করে নিতে পারব।'

'কিন্তু পারেননি,' মারটিন বললেন।

'না, পারিনি। ওই বলদটা আমাকে বেকায়দাতেই ফেলেছে বরং বার বার,' ফারগুসন বললেন। 'যাই হোক, তোমার আর মুরারির শত্রুতাটাকেও কাজে লাগাতে চেয়েছি আমি। দোষটা তোমাদের ওপর চাপাতে চেয়েছিলাম। মূর্তিটা ভাঙলে যাতে সবাই ভাবে, একজন আরেকজনের ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে জিনিসটা নষ্ট করেছ।'

'এত সব ঝামেলায় না জড়িয়ে স্রেফ গিয়ে মেডিনকে বললেই পারতেন টাকাটা ফেরত দিতে,' রবিন বলল।

'চেষ্টা করেছি,' ফারগুসন জানালেন। 'মেডিনের ওখানে আমি নিজে যেতে চাইনি, কেউ দেখে ফেলার ভয়ে। মিউজিয়ামের ডিরেক্টর হয়ে একটা

জালিয়াতের ওখানে আমি ঘোরাঘুরি করছি, ব্যাপারটাকে লোকে ভাল চোখে দেখত না। তাই কয়েক বার করে বারনারকে পাঠিয়েছি। পাত্তাই দেয়নি ওকে মেডিন। টেলিফোনে তখন আমি যোগাযোগ করেছি। সে শুধু হেসেছে। শেষে টাকাটা উদ্ধারের একটা উপায়ই দেখতে পেয়েছি আমি, মূর্তিটাকে নষ্ট করে দিয়ে বীমা কোম্পানির কাছ থেকে আদায় করে নেয়া। জানি, সেটাও অন্যায়, কিন্তু মিউজিয়ামের ক্ষতিটা তো পোষানো যেত।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে রবিন জিজ্ঞেস করল, 'পোষাতে তো পারলেন না। এখন কি করবেন?'

'কিছুই করার নেই আর এখন,' ফারগুসন বললেন। 'আমার ক্যারিয়ার শেষ। জেলে যেতে হবে আমাকে।' করুণ ভঙ্গিতে পিঠ বাঁকা করে ডেস্কের ওপর ঝুঁকে রইলেন ডিরেক্টর।

ছোট্ট অফিসটায় পিন পতন নীরবতা। শেষে মারটিন বললেন, 'আমি বলি কি, চাকরিটা আপনি ছেড়ে দিন। ট্রাস্টির লোকেরা নতুন আরেকজন কিউরেটর খুঁজে নিতে পারবে। মূর্তিটা নিয়ে যা যা ঘটেছে, জানানোর দরকার নেই ওদের। অ্যাক্সিডেন্টে মূর্তি ভেঙেছে, এটাই ওদের জানা থাকুক। গোপনে আমরা মেডিনের কাছ থেকে টাকাটা আদায় করে নেব, যে ভাবেই পারি। কারণ, বিল সে একটা দিয়েছে। অত সহজে ফসকে যেতে পারবে না।' মুরারি আর তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন তিনি। 'কি বলো তোমরা?'

মাথা কাত করল কিশোর। 'হ্যাঁ, কিছু একটা করতেই হবে। এত বড় জালিয়াতকে ছেড়ে দেয়া যায় না।'

চেয়ারে হেলান দিলেন ফারগুসন। 'ঠিকই বলেছ। আসলেই একটা লম্বা বিশ্রাম দরকার এখন আমার।'

আবার খানিকক্ষণ নীরবতা। তারপর অস্বস্তি ভরা কণ্ঠে মারটিন বললেন, 'আমারও খানিকটা দোষ স্বীকার করার ব্যাপার আছে। সত্যিই আমি মুরারির ভারটিউয়্যাল রীয়্যালিটি ডিভাইসে গণ্ডগোল করে রেখেছিলাম। যাতে হেলমেট মাথায় পরলেই একটা শক খায় ও। কম্পিউটারে রিপ্রোগ্রামিং করে রেখেছিলাম যাতে অ্যাপাটোসরাসরটা আক্রমণ করে বসে। একটু মজা করা, আর ভয় দেখানো। করেছিলাম তোমার জন্যে, কিন্তু পুরোটাই গেল বেচারা মুসার ওপর দিয়ে। এর জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত।'

ছেলেমানুষি হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুরারির সারা মুখে। 'স্বীকার করতেই হচ্ছে কম্পিউটার প্রোগ্রামিঙে তুমি অসাধারণ।'

'অনেক ধন্যবাদ,' হাসিমুখে মাথা নুইয়ে বাউ করলেন মারটিন।

'আমি নিজেও নির্দোষ নই,' মুরারি বললেন। 'ফসিল ল্যাবে ডাইনোসরের মাথা বদলে দিয়েছিলাম আমিই। তোমাকে ভোগানোর আরও কিছু বুদ্ধি বের করে রেখেছিলাম। দুঃখের বিষয়, মিটমাটটা হয়ে গেল, সেগুলো আর প্রয়োগ করার সুযোগ পাব না কখনও।'

হেসে উঠলেন মারটিন।

দু'জনের ছেলেমানুষী কাণ্ডকারখানার কথাগুলো বেশ উপভোগ করতে লাগল তিন গোয়েন্দা।

হাসতে হাসতে মারটিন বললেন, 'মাথা বদলানো কঙ্কালটাকে দেখতে কিন্তু খারাপ লাগছিল না।'

হাসিমুখে রবিন বলল, 'এখন থেকে যত খুশি তর্কাতর্কি ঝগড়াঝাঁটি করুন আপনারা। কিন্তু দোহাই আপনাদের, এ সব কারসাজির মধ্যে যাবেন না। কথা দেবেন কি?'

'দিলাম, যাব না,' একসঙ্গে বলে উঠলেন দু'জনে।

*

সাত দিন পর। স্যাকভিলে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে ডিনারে বসেছেন মুরারি।

এখন অনেক স্বাভাবিক ভাবে কাজকর্ম হচ্ছে মিউজিয়ামে। ভারত থেকে ফিরেছেন নোরা ইভান। বোর্ড অভ ট্রাস্টি তাঁর হাতে মিউজিয়ামের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে।

মুরারি, মারটিন আর তিন গোয়েন্দা দল বেঁধে গিয়ে মেডিনের বাড়িতে চড়াও হয়েছিল। পুলিশের ভয় দেখিয়েছিল। টাকা ফেরত না দিয়ে শেষ পর্যন্ত পারেনি মেডিন।

অনেক ভদ্র হয়ে গেছেন দুই বিজ্ঞানী। কেউ কারও সঙ্গে লাগতে যাচ্ছেন না।

ফারগুসন যেদিন ধরা পড়লেন, তার পরদিন থেকেই লাপাত্তা হয়ে গেল বারনার। যাওয়ার আগে রবিনকে জানিয়ে গেছে কিশোর আর মুসাকে খাদে ফেলে মারার কোন ইচ্ছেই তার ছিল না। সামান্য একটু ভয় দেখাতে চেয়েছিল। কিন্তু ধাক্কাটা জোরে লেগে গিয়েছিল। যাই হোক, ওরা বেঁচে যাওয়াতে নাকি হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে সে।

মিস্টার ফারগুসনও পরদিন সকালেই চাকরি ছেড়ে চলে গেছেন। বাহামায় গেছেন বিশ্রাম নেবার জন্যে। সহসা আর ফেরার কোন ইচ্ছে নেই তাঁর।

'আমাদের জন্যে যা করেছ, তার জন্যে একটা ধন্যবাদ পাওনা হয়ে আছে তোমাদের দু'জনের,' মুসা আর কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন মুরারি।

'হ্যাঁ, সত্যি,' রবিন বলল। 'ওরা দু'জন না এলে রহস্যটার সমাধান এত তাড়াতাড়ি হত না। সব লেজেগোবরে করে দিয়ে মিউজিয়ামটাকেই ধ্বংস করে ফেলতেন ফারগুসন।'

'ওহ্হো, ভুলেই গিয়েছিলাম,' মুরারি বললেন। 'মারটিন তোমাদেরকে তার প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়েছে। আর এ জিনিসটা দিতে বলেছে।' পকেট থেকে ছোট একটা বাক্স বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন তিনি। 'খুলে দেখো।'

বাক্সের ডালাটা খুলল কিশোর। ভেতর থেকে বের করল খুদে একটা ট্রাইসেরাটপস। খেলনাটার নিচে বসানো একটা বোতাম টিপে দিলেন মুরারি। মৃদু স্বরে গর্জন করতে করতে চক্রাকারে ঘুরতে শুরু করল ডাইনোবটটা।

'খাইছে! আবার ডাইনোবট!' আঁতকে উঠল মুসা।

'এবার আর আমার খেলনা না,' হেসে বললেন মুরারি। 'মারটিনের।'

'যারই হোক, ডাইনোসরের পাল্লায় আর পড়তে যাচ্ছি না আমি! এগুলোকে বোঝা বড় মুশকিল!'

হাসতে লাগল সবাই।

-: শেষ :-

ভলিউম ৪৮

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা–
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম
তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি–
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০